বাংলাপিডিএফ.নেট

মাসুদ রানা

মৃত্যুফাঁদ
সীমা লঙ্ঘন

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

SUVOM

দুটি বই একত্রে

মাসুদ

শুভম

বাংলাপিডিএফ.নেট

মাসুদ রানা

[দুটি বই একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

মৃত্যুফাঁদ

লিফট চেয়ে বিপদে পড়ে গেল মাসুদ রানা। একটা লাশের বোঝা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়ল খুনী। খুনের রহস্য বের করতে গিয়ে আরও ফেঁসে গেল ও। চারদিক থেকে জাল গুটিয়ে আনছে পুলিস. ওদের দৃঢ় বিশ্বাস খুনটা রানাই করেছে। উদ্ধার পেতে শেলডন আইল্যান্ডে ছুটে গেল ও, সেখানে ওত পেতে আছে আরও বড় বিপদ।

সীমা লঙ্ঘন

সময় মাত্র দু'তিন দিন। নেতৃত্ব দেবে মাসুদ রানা, সঙ্গে থাকবে দু'জন বিসিআই এজেন্ট। ইসরায়েলে ঢুকে হিযবুল্লাহ গেরিলা আর মুসলিম ব্রাদার হুড সদস্যদের সাহায্য নিয়ে তিনটে সাবমেরিন ধ্বংস করে দিয়ে আসতে হবে। প্যারাশুট নিয়ে ইসরায়েলে নামার পর থেকেই শুরু হলো বিপদ। দলে বিশ্বাসঘাতক আছে, তা-ও একজন নয়। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ধাওয়া করল ওদের।
শেষ পর্যন্ত কি ঘটল, সে এক রোমহর্ষক কাহিনী।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ শুভম

মাসুদ রানা

মৃত্যুফাঁদ

সীমা লঙ্ঘন

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

সেবা
প্রকাশনী

একচল্লিশ টাকা

ISBN 984-16-7627-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

একত্রে প্রকাশ: ২০০৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
MRITTYUPHAND

SHEEMA LANGGHAN
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু
ভ
ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম্
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মৃত্যুফাঁদ ৫-১২১
সীমা লঙ্ঘন ১২২-২৪০

Rana- 276, 291

মৃত্যুফাঁদ ও সীমালঙ্ঘন

কাজী আনোয়ার হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-৯৯ *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ আক্রোশ

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

মৃত্যুফাঁদ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

এক

'দেখুন অবস্থা! আকার-গঠন ছাড়া এদের মানুষ বলে মনে হয় আপনার?' আক্ষেপের সুরে বলল বিশালদেহী নিগ্রো ট্রাক ড্রাইভার। ক্যাবের জানালা দিয়ে থোক করে একগাদা থুতু ছুঁড়ল। 'খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে আসা নোংরা শুয়োরের চেয়েও জঘন্য এদের চেহারা-সুরত। মা মেরির কৃপায় খাসলতও তেমনি। দগদগে ঘা'আলা কুষ্ঠ রোগীকে লিফট্ দিতে রাজি আছি আমি, কিন্তু এদের নয়।' নাক কোঁচকাল লোকটা, আরেক দফা থুতু বর্ষণ করল।

ক্যাবের চামড়া মোড়া পুরু ব্যাকে হেলান দিয়ে বসে আছে মাসুদ রানা, পিঠ কাঁপছে মহাশক্তিধর এঞ্জিনের ভারী গুম্ গুম্ আওয়াজের সাথে তাল মিলিয়ে। প্রশস্ত হাইওয়ের দু'দিকে নজর বোলাচ্ছে ও, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হিপ্পিদের দেখছে।

ধাবমান বিশাল কন্টেইনার ট্রাকের কয়েকশো গজ সামনে রয়েছে ওরা, প্রায় সবাই বুড়ো আঙুল বাঁকা করে নিজেদের পিছনদিক নির্দেশ করছে—লিফট চায়। ডাফল ব্যাগ, কার্ডবোর্ড কন্টেইনার, গিটারসহ হাবিজাবি আরও কি কি সব আছে সাথে। প্রতি মুহূর্তে আকার বড় হচ্ছে ওদের।

'আবর্জনা!' আবার বলে উঠল ড্রাইভার। দু'চোখ ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে করছে। 'এরা আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিক, ভাবলেও ভয় হয়। এখনই এক পুরিয়া হেরোইনের টাকার জন্যে বাপ-মা'র গলায় ছুরি বসাতে দ্বিধা করে না, আগামীতে কি করবে বোঝাই যায়।'

আরও খানিকটা এগোতে দল থেকে আলাদা হয়ে এগিয়ে এল তিনটি মেয়ে, সবার পরনে নোংরা হিপস্টার ও শার্ট। পনেরো থেকে আঠারোর বেশি হবে না কারও বয়স, দু'হাত মাথার ওপর তুলে নাড়ছে ড্রাইভারের উদ্দেশে, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করছে।

'খুদে বেশ্যা একেকটা!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল। পরেরবার মুখ খোলার আগে চট্ করে ওকে দেখে নিল এক পলক। 'এদের কথা ভেবেই আপনাকে সেধে লিফট দিয়েছি আমি, বুঝলেন? নইলে কি যে ঘটত আজ আপনার কপালে, তা...' থেমে গেল ড্রাইভার, নজর দিল ক্রমঅগ্রসরমান ঝামেলার দিকে।

সিগারেট বের করে তাকে একটা দিল রানা, নিজেও ধরাল। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগল আনমনে। পর্যটন মওসুম সবে শুরু হয়েছে, হাতে বিশেষ কাজ না থাকায় কয়েকদিনের ছুটিতে গাড়ি নিয়ে ভেরো বীচ যাবে বলে বেরিয়েছিল নিউ

ইয়র্ক থেকে। পথের মাঝে ফেঁসে গেল। ওক হিলে নষ্ট হয়ে গেল গাড়ি, হাইওয়েতে।

ভাগ্য মন্দের ভাল, কাছেই ছিল এক গ্যাস স্টেশন। গাড়ি ঠেলে সে পর্যন্ত পৌঁছল রানা অনেক কষ্টে। ওদের সার্ভিস মেকানিককে দিয়ে চেক করাল গাড়ি, কাজ হলো না। জানা গেল আটচল্লিশ ঘণ্টার আগে ঠিক হওয়ার চান্স নেই ওটার। পুরো এঞ্জিন খুলতে হবে। হতাশ হয়ে পড়ল ও, কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। সার্ভিস স্টেশনের কয়েকজনকে অনুরোধ করল নিজের গাড়ি করে ওকে কাছাকাছি কোনও টাউনে পৌঁছে দেয়ার, কেউ রাজি হলো না। অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকা সাধল, তবুও না।

দক্ষিণে, রানার যাত্রাপথের পাশেই রোজল্যান্ড শহরে তিনদিন পর হিপ্পিদের সম্মেলন শুরু হতে যাচ্ছে। তাতে যোগ দেয়ার জন্যে সারাদেশ থেকে দলে দলে হিপ্পিরা আসছে। ওদের ভয়ে নিতান্ত দায় না ঠেকলে একা কোন ড্রাইভারই হাইওয়েতে নামতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ এরমধ্যে অনেক অঘটন ঘটিয়ে ফেলেছে ওরা।

সুযোগ পেলেই গাড়ি থামিয়ে যাত্রীদের মারধর, লুটপাট করেছে, এমনকি অনেকের কাপড়-চোপড় পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। সাথে গাড়ির সহজে বহনযোগ্য পার্টস, টায়ার টিউবও। দু'দিন আগে ওদের হাতে বেধড়ক মার খেয়ে এক ট্রাক ড্রাইভার মরেই গেছে। বেচারীর গাড়ি হাইওয়েতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আক্রমণকারীরা ছিল পাঁচজন। অনেক চেষ্টা করেও পুলিস ওদের ধরতে পারেনি।

ওর পর থেকে দক্ষিণমুখী হাইওয়ে বিরান হয়ে পড়েছে। সারাদিনে দু'চারটা গাড়িও ওদিকে যায় কি না সন্দেহ। যারা যায়, নিতান্তই দায়ে পড়ে যায়। সবার এক আতঙ্ক, যদি বাই চান্স পথে নষ্ট হয়ে যায় গাড়ি, তখন কি হবে? আসল ভয় দিনে, রাতটা মোটামুটি নিরাপদ। তখন হাইওয়েতে থাকে না হিপ্পিরা, এখানে-সেখানে গাঁজা-হেরোইন আর নোংরামির আসর বসায়, নয়তো ঘুম দেয়। এক আধটা গাড়ি নামে তখন পথে।

রাত ছাড়া নড়ার উপায় নেই, কাজেই বসে থাকা ছাড়া কিছুই করার ছিল না মাসুদ রানার। অনেক কষ্টে এক ঘণ্টা পার করল, হঠাৎ এসে হাজির এই কন্টেইনার ট্রাক। দক্ষিণে যাবে ওটা, অরেঞ্জভিলে। নিগ্রো ড্রাইভার জেফারসনের না গিয়ে উপায় নেই। অরল্যান্ডো থেকে প্রতি শনি ও বৃহস্পতিবার কমলার চালান নিয়ে ওখানে যেতে হয় তাকে। এক চালান মিস হলে বাৎসরিক চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বীর যেমন অভাব নেই, তেমনি অরেঞ্জভিলের জুস তৈরির কারখানার কাজও বন্ধ থাকবে না তার অপেক্ষায়।

রানার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে জেফারসন নিজে সেধে লিফট দিতে চাইল। পাম শোর পর্যন্ত পৌঁছে দেবে সে, তারপর রানাকে অন্য ব্যবস্থা করে নিতে হবে, কারণ ওখান থেকে অন্য পথে যেতে হবে জেফারসনকে। গ্যাস ভরা শেষ হতে লোকটার সাথে উঠে বসল ও, রওনা হয়ে পড়ল। এগারোটার মত বাজে তখন।

জেফারসন বেশ আলাপী, হাসিখুশি। অল্প সময়ের মধ্যে জমিয়ে ফেলেছে ওর সাথে। রানা যদিও কথা তেমন বলছে না, শুনে যাচ্ছে, মাঝেমধ্যে এক আধটা মন্তব্য

করছে।

'খেয়াল রাখবেন,' মেয়েগুলোর ওপর কড়া নজর রেখে বলে চলেছে ড্রাইভার। 'পাম শোরে পৌঁছে হাইওয়ে ছেড়ে সরে যাবেন। ব্যাক রোড ধরে মাইল চারেক হেঁটে গেলে ছোট এক ফার্মিং টাউন পাবেন। হোটেল আছে একটা, ওখানে দিন পার করবেন।'

'নিশ্চই,' বলল রানা। 'পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ আপনাকে।'

'আর যদি এইসব জানোয়ারের সামনে পড়েই যান, দয়া করে বাহাদুরি দেখাতে যাবেন না, সোজা খিঁচে দৌড় লাগাবেন। ওরা বেশিদূর ছুটতে পারবে না, দম নেই। হেরোইন আর গাঁজা মিলে ওদের সমস্ত প্রাণশক্তি খেয়ে ফেলেছে।'

মুচকে হাসল ও। 'আচ্ছা।'

'ভুলেও ওদের আন্ডার এস্টিমেট করবেন না। ওরা যা চায়, তা শেষ পর্যন্ত অর্জন করেই ছাড়ে। বিশেষ করে কোন নিঃসঙ্গ পথচারীর বেলায়। হয়তো খুব ইচ্ছে হবে, আর্মির ট্রেনিঙ আছে, মনের সুখে পিটিয়ে...'

চট্ করে ঘুরে তাকাল রানা। 'কি করে বুঝলেন আমার আর্মির ট্রেনিঙ আছে?'

'আপনার চেহারা দেখে।' হাসতে গিয়েও সামনের দৃশ্য দেখে হাসল না লোকটা। গতি বাড়িয়ে খুব দ্রুত পাশ কাটাল মেয়েগুলোকে, তারপর ওদের সঙ্গীদের। ক্যাবের জানালা দিয়ে মুহূর্তের জন্যে এক মেয়ের নোংরা দাঁত দেখতে পেল রানা, গা গুলিয়ে উঠল।

কন্টেইনারের ধাতব দেহে পর পর কয়েকটা ধুম ধাম আওয়াজ উঠল। ঢিল মারছে ক্ষিপ্ত হিপ্পিরা।

নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে আবার মুখ খুলল জেফারসন। 'আমিও আর্মিতে ছিলাম এক সময়। কোরিয়ায় যুদ্ধ করেছি। কিন্তু এখন বয়স হয়েছে, সিংহ আছি বটে এখনও, তবে খোঁড়া। ওদের মধ্যে পড়লে আপনার অবস্থাও তাই হবে, তর্জন-গর্জন করা ছাড়া উপায় থাকবে না। আমি পথে নেমেছি পেটের দায়ে। কয়েকদিন ধরেই চলছে এদের যাত্রা, আরও চলবে, তাই পথে নামার আগে এখন রোজ অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করি। ঈশ্বর, যিশু, মা মেরি, সবাইকে বলি আমার ওপর নজর রাখতে, পথে ট্রাক বিগড়ে এদের হাতে যাতে বেঘোরে মারা না পড়ি, সেদিকে খেয়াল রাখতে। একে আমার ছেলে-মেয়ে নেই, তারওপর বউ বাতের রোগী, প্রায় অন্ধ। চোখে তেমন দেখে না। আমি মরলে ও বেচারীও মরবে না খেয়ে।'

এ ধরনের কথার পিঠে কি বলা যায় ভেবে পেল না রানা, তাই চুপ করে থাকল। মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছে। সামনে তাকিয়ে ফিতের মত চওড়া, কালো হাইওয়ের সাঁই সাঁই করে ছুটে এসে ট্রাকের তলায় গায়েব হয়ে যাওয়া দেখছে। খানিক পর পর সিগারেটে মৃদু টান দিচ্ছে।

'যত ওস্তাদই হোন আপনি, একযোগে আট-নয়জন ধরে বসলে কোনমতেই কুলিয়ে উঠতে পারবেন না,' বলল লোকটা। 'গত সপ্তায় আমার এক বন্ধু এদের হাতে পড়েছিল। সে-ও কমলা সাপ্লাই করে। অরেঞ্জভিলের কয়েক মাইল আগে ট্রাকের অ্যাক্সেল ভেঙে গেল, ব্যস, আর যাবে কোথায়!' আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সে। 'একটা পা আর বুকের তিনটে রিব ভেঙে গেছে ওর। সাথে টাকা-

পয়সা যা ছিল, তা তো গেছেই, আধ টন কমলাও শেষ। শুধু মুখেই কয়েকশো বুটের লাথি খেয়েছে বেচারী, চেহারা চেনা দায়।'

চট করে গলা খাদে নেমে গেল জেফারসনের। 'এই আরেকদল!'

রানাও একই সাথে দেখল ওদের। পাঁচজন। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা, এলোমেলো চুল, মুখে দাড়ি, সব বিচ্ছিরি রকম নোংরা, তেলতেলে। পরনে মলিন হিপস্টার ও ময়লা সুতী কোট, দেখলে মনে হয় গায়ে ওঠার পর থেকে ডিটারজেন্ট দূরে থাক, পানির স্পর্শও জোটেনি ওগুলোর ভাগ্যে। হাইওয়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে লিফট চাইছে দলটা।

যখন বোঝা গেল ট্রাক থামছে না, একজন আচমকা এক লাফে রাস্তার ওপর উঠে এল। পনেরো ষোলোর বেশি হবে না বয়স, থুতনিতে সবে দাড়ির রেখা ফুটেছে। কল্পনায় কড়া ব্রেক কষল রানা। মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল হৃদস্পন্দন, মনে হলো এখনই ফেন্ডারে বাড়ি খেয়ে উড়ে যাবে ছেলেটা। কিন্তু জেফারসন একেবারে শেষ মুহূর্তে দক্ষ হাতে প্রকাণ্ড গাড়িটা ঘুরিয়ে অফ সাইডে নিয়ে এল। মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে ছেলেটার নাগাল পেল না ফেন্ডার।

তার রাগে লাল, সরু মুখটা মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল ওরা পাশ কাটাবার সময়। অকথ্য ভাষায় জেফারসনের গুষ্টি উদ্ধার করছে ছেলেটা, রাগের চোটে নেচে কুঁদে একাকার করছে।

'দেখলেন অবস্থা?' ক্যাবের বাইরের লম্বা রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে বলল লোকটা। 'হেরোইনের নেশায় কেমন আসমানে চড়ে আছে? উল্টো দিক থেকে যদি একটা গাড়ি আসত এখন, কি অবস্থা হত?'

'এদের ঠেকাতে পুলিস কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না?' বলল রানা, সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে।

'হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কি? আমেরিকা তো মুক্ত দেশ,' মুখ বিকৃত করল সে। 'পথচারীকে বাধা দেয়ার কোন ক্ষমতা নেই পুলিসের। অবশ্য স্কোয়াড কার দেখলে এরাও সবাই একেকজন সেইন্ট জন, পল বনে যায়।'

পথে এক বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করল ওরা দু'জন। জেফারসনের প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও বিলটা রানাই দিল। তারপর আবার চলা। চারটার একটু আগে জায়গামত ট্রাক থামাল ড্রাইভার। হাইওয়ের ওপাশের এক ধুলোমোড়া সরু রাস্তা দেখিয়ে বলল, 'ওটা ধরে কিছুটা এগোলে সেকেন্ডারি রোড। সোজা উত্তরে চার মাইল গেলে সেই ফার্মিং শহর, কেনসভিল পৌঁছে যাবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার জেফারসন,' খুব আন্তরিকতার সাথে লোকটার প্রকাণ্ড থাবা ঝাঁকিয়ে দিল ও। 'আপনার উপকারের কথা ভুলব না।'

সাথের একমাত্র লাগেজ, ট্রাভেল ব্যাগটা এক হাতে ধরে ক্যাব থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। সুটকেস গাড়ির বুটে রয়ে গেছে, হাঁটতে হবে শুনে আনেনি।

'সো লঙ, ডিয়ার,' পিছন থেকে হাঁক ছাড়ল নিগ্রো লোকটা। 'হ্যাভ সান অ্যান্ড ফান।'

রাস্তা পার হলো ও, ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল। কালোর মধ্যে মুক্তোর মত সাদা দাঁত ঝিকিয়ে উঠল জেফারসনের, গিয়ার এনগেজ করল সে, সশব্দে একরাশ

গ্যাস রিলিজ করে চলে গেল কন্টেইনার ট্রাক। জনমানবের চিহ্নহীন খাঁ খাঁ প্রান্তরে একদম একা হয়ে গেল রানা। ট্রাক অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত কেন যেন নড়তে ইচ্ছে হলো না, দাঁড়িয়েই থাকল জায়গায়।

অবশেষে ঘুরল। দক্ষিণের দিগন্তে মিলিয়ে গেছে তখন জেফারসন। ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁটা ধরল রানা। হেলে পড়লেও বেশ উত্তাপ ছড়াচ্ছে এখনও সূর্য। লম্বা লম্বা পা ফেলে অর্ধেক পথ পেরিয়ে এল ও, এরমধ্যে গাড়ি দূরের কথা, মানুষের ছায়া পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

পথের পাশের বড় এক ইউক্যালিপটাস গাছের ছায়ায় বসে খানিক জিরিয়ে নিল। সিগারেট শেষ করে উঠতে যাবে, এমন সময় গাড়ির আওয়াজ শুনে মুখ তুলল রানা। একটা স্কোয়াড কার, কেনসভিলের দিক থেকে আসছে। ধীরগতিতে আসছিল ওটা, ওর ওপর চোখ পড়তে গতি বাড়িয়ে দিল চালক। ঠিক ওর পাঁচ হাতের মধ্যে এসে মৃদু এক দোল খেয়ে থেমে পড়ল।

প্রকাণ্ডদেহী দুই পুলিস বসা ভেতরে, একজন সাদা অন্যজন কালো। অবাক চোখে কয়েক মুহূর্ত ওকে দেখল লোক দুটো, তারপর একযোগে দুই দরজা দিয়ে পিছলে বেরিয়ে এল। দু'জনেই প্রায় সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ। সাদাজন সিনিয়র, বয়স্ক। মুখটা আস্ত এক তরমুজের মত বড়। মাংস আর চর্বিতে বোঝাই। অন্যজন অল্পবয়সী। অভ্যেসবশে দু'জনেরই ডান হাত হোলস্টারের দিকে এগোল।

'কে আপনি?' প্রায় হুঙ্কার ছেড়ে উঠল সিনিয়র লোকটা। 'এখানে কি করছেন?'

ধীরেসুস্থে দাঁড়াল ও। ব্যাগ ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। 'একটু বিশ্রাম নিতে বসেছিলাম।'

'কোথায় যেতে চান?'

'কেনসভিল।'

চোখ নামিয়ে ওর দামী স্যুটটা দেখল সে, দ্বিধা ফুটল চেহারায়। 'কিন্তু হেঁটে কেন?'

বলল ও সংক্ষেপে। চুক চুক ধরনের আফসোস করল দ্বিতীয়জন। প্রথমজন বলল, 'আপনি জানেন এই ডিস্ট্রিক্ট জুড়ে কি চলছে গত কয়েকদিন ধরে?'

'জানি, অফিসার,' মাথা দোলাল ও।

'আসার পথে হিপ্পি চোখে পড়েনি আমাদের,' বলে উঠল অন্যজন। 'আপনিও দেখা যাচ্ছে এ পর্যন্ত নিরাপদেই আসতে পেরেছেন। কিন্তু বাকি পথ যেতে গিয়ে যদি ওদের কবলে পড়েন, কি ঘটবে অনুমান করতে পারেন?'

'আমার?'

খেঁকিয়ে উঠল সাদা, 'নয়তো কি আমাদের?'

কড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল রানা। দৃঢ় আস্থার সাথে বলল, 'কিছুই ঘটবে না আমার, নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'তাই?' আরও খেপে উঠল লোকটা, লাল মুখ আরও লাল হয়ে উঠল। 'নিজেকে কি মনে করেন আপনি? দেখি, আপনার পেপার্স দেখি!'

কোটের ভেতরের পকেট থেকে আইডি কার্ড বের করে দিল ও, আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে লাগল। ওদিকে জিনিসটা দেখামাত্র

বিরক্তি উবে গিয়ে সমীহ ফুটল অফিসারের চেহারায়। চকিতে এক পলক ওকে দেখে নিয়ে আবার কার্ড পরীক্ষায় মন দিল সে।

'আই সী!' ওটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি তাহলে অস্ত্র বহন করছেন?'

'সব সময় করি,' বলল ও।

'ওয়েল,' মাথা ঝাঁকাল অফিসার। চেষ্টাকৃত দেঁতো হাসি দিল। 'ভাল। ওদের সাথে দেখা হয়ে গেলে জিনিসটা দেখাবেন, কাজে লাগবে।' রানার উদ্দেশে নড করে গাড়িতে ফিরে এল সে। ধুলো উড়িয়ে হাইওয়ের দিকে চলে গেল স্কোয়াড কার।

রানাও পা চালাল।

কেনসভিলের বারো ফুট চওড়া মেইন স্ট্রীটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে শহরের একমাত্র বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। মাথায় জ্বলছে 'গুড ফুড' লেখা বড়, লাল রঙের এক নিয়নসাইন। আয়তকার বাক্সের মত দেখতে ক্ল্যাপবোর্ডের তৈরি বিল্ডিং, সামনের চওড়া বারান্দায়, মূল দরজার দু'পাশে ডজনখানেক চেয়ার পাতা পুরো আঁধার হয়নি তখনও। বারান্দায় উঠে পড়ল রানা কাঠের ধাপ টপকে। বন্ধ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

বিশটা টেবিল সুন্দর করে সাজানো আছে ভেতরে, প্রতিটিতে চারজন করে বসার ব্যবস্থা। ডানদিকের শেষ প্রান্তে দীর্ঘ বার দেখল ও, তার পিছনে দেয়ালজোড়া আয়না চক্ চক্ করছে।

বারের ওপাশে দাঁড়িয়ে গ্লাস মুছছিল এক মেয়ে, দরজায় শব্দ হতে মুখ তুলে তাকাল। কাজ থামিয়ে মিষ্টি এক টুকরো হাসি উপহার দিয়ে বলল, 'ওয়েলকাম টু কেনসভিল। কি দেব, ড্রিঙ্ক চাই নিশ্চই?'

তার হাসি ফিরিয়ে দিল ও, ব্যাগটা লালের ওপর সাদা স্ট্রাইপড্ কাপড়ে ঢাকা এক টেবিলে রেখে বারের দিকে এগোল। 'ঠিক ধরেছ তুমি, বীয়ার চাই, ঠাণ্ডা। গলা শুকিয়ে একদম কাঠ হয়ে আছে।'

'নিশ্চই,' ব্যস্ত হয়ে উঠল মেয়েটি।

বিশ-একুশ হবে ওর বয়স, রানা অনুমান করল। পাঁচ ফুট ছয়। চমৎকার, মিষ্টি চেহারা । নীল চোখ। মাঝপিঠ পর্যন্ত লম্বা, কুচকুচে কালো চুল, ভরাট দেহ।

একটা উঁচু বার টুলে বসে পড়ল ও। ঠাণ্ডা ঘামে ভেজা একটা বীয়ারের ক্যান মেয়েটি ওর সামনে রাখতেই খপ্ করে ধরল সেটা, মুখের সামনে তুলে তার চোখে চোখ রেখে বলল, 'তোমার চাঁদপনা মুখ, নীল চোখের দ্যুতি আর অসাধারণ মিষ্টি হাসির সম্মানে।' দীর্ঘ চুমুক দিল।

বেশ বিস্মিত হলো যুবতী, খুশিও হলো। এত সুন্দর করে কেউ কখনও তার রূপের প্রশংসা করেনি।

'ধন্যবাদ,' ব্লাশ করল সে। 'আমি লুসি জিওভানি।'

'আমি মাসুদ রানা,' আরেক চুমুক দিল ও। 'ইটালিয়ান?'

'হ্যাঁ।'

'আমার তৃষিত বুক ঠাণ্ডা করার জন্যে ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, লুসি,' প্রায়

শূন্য ক্যান দোলাল। 'আরেকটা, প্লীজ।'

খদ্দের বেশ মজার মানুষ বুঝতে পেরে মৃদু শব্দ করে হাসল মেয়েটি, রেফ্রিজারেটরের দিকে এগোল। 'ভীষণ খিদে পেয়েছে,' বলল রানা। 'পৌঁছতে খুব বেশি দেরি করে ফেলিনি তো?'

'একদম না। স্প্যাগেটি চলবে তো, সাথে বাগানের তাজা মটরশুঁটি, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইড আর চিকেন?' দ্বিতীয় ক্যান নিয়ে ফিরে এল লুসি।

জিভে পানি এসে গেল ওর। 'কি বলছ, এত সৌভাগ্য আমার! প্লীজ, তাড়াতাড়ি করো!'

বারের এক মাথার হ্যাচওয়ে দিয়ে ওপাশের কিচেনের দিকে ফিরে হাঁক ছাড়ল সে, 'বাবা, তোমার স্পেশাল ডিনার, একজনের জন্যে! যত জলদি পারো!'

হ্যাচওয়েতে একটা চর্বিবহুল, গোল মুখ উদয় হলো, পুরু ঠোঁটে সার্চলাইটের মত চওড়া হাসি। 'দশ মিনিট,' ইটালিয়ান অ্যাকসেন্টে বলল লোকটা। 'পেঁয়াজ চলবে, মিস্টার?'

'সব চলবে,' পেটে হাত বোলাল ও। 'ধন্যবাদ।'

দ্বিতীয় ক্যান শেষ করে ওয়াশ বেসিনে ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে বারের কাছের এক টেবিলে বসে পড়ল। কাউন্টারে কনুই রেখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লুসি। মুভি স্টারের মত চেহারা যুবকের, ভাবছে মুগ্ধ হয়ে। কী চমৎকার কথা বলার স্টাইল, কী সুন্দর ভাষা। পরনের নিখুঁত ছাঁটের স্যুটে সাঙ্ঘাতিক মানিয়েছে ওকে। 'অনেক দূর থেকে আসছ?'

'নিউ ইয়র্ক।' নিজের চারদিকে নজর বোলাল রানা। 'খুব সুন্দর সাজিয়েছ তোমরা রেস্টুরেন্টটা।'

'ধন্যবাদ।'

'থাকার ব্যবস্থা আছে তো?'

'হ্যাঁ। ভাড়া তিন ডলার, বাবার স্পেশাল ব্রেকফাস্টসহ।'

মেয়েটিকে আরেকবার ভাল করে দেখল ও। 'তোমার বাবাই করেন রাঁধার কাজ?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল লুসি। নজর সেঁটে আছে আগন্তুকের মুখে। 'বিশ বছর ধরে একই কাজ করে আসছে সে।'

'এখানেই?'

'হ্যাঁ। আমার জন্মও এখানে।'

আধ ঘণ্টা পর, খাওয়া শেষ করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলল রানা। 'জীবনের সেরা চিকেন রোস্ট খেলাম আজ,' বারের ওপাশে দাঁড়ানো মোটা ইটালিয়ানের উদ্দেশে বলল। 'সত্যি!'

'ধন্যবাদ, মিস্টার,' আবার সার্চলাইট জ্বলে উঠল লোকটার মুখে। লুসিও হাসল।

সিগারেট বের করার জন্যে পকেটে হাত ভরল ও, ঠিক তখনই একজোড়া ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, এদিকেই আসছে। বাপ-বেটীর সাথে দ্রুত চোখাচোখি হলো, আলতো করে শূন্য হাত বের করে নিল রানা। বন্ধ দরজার

দিকে তাকিয়ে থাকল। আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছে, মানুষটা যে-ই হোক, সর্বশক্তিতে ছুটে আসছে। অজানা আশঙ্কায় লুসি ও তার বাবার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে দেখল রানা।

সামনের ধাপে এত জোরে দুম দুম আওয়াজ হলো যে পুরো বিল্ডিঙ কেঁপে উঠল। পরমুহূর্তে দড়াম করে বিস্ফোরিত হলো সামনের দরজা, ছিটকে ভেতরে ঢুকল এক যুবক। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল তার, তবে হিপ্পিদের মত নোংরা, উষ্কখুষ্ক নয়, বেশ পরিচ্ছন্ন। ডান কানের ওপরের চুল ভেজা যুবকের, রক্তে একাকার। বাঁ গালের বড় এক কাটা থেকেও দর দর করে রক্ত ঝরছে। পরনের কাপড় এখানে-ওখানে ছেঁড়া। হাতে গিটার, কাঁধে ডাফল ব্যাগ। ভেতরে পা রেখেই সন্ত্রস্ত চোখে ঘন ঘন এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল যুবক। হাঁপাচ্ছে ফোঁস ফোঁস। 'আমাকে···আমাকে বাঁচাও, প্লীজ!' সশব্দে ঢোক গিলল সে। চোখে টলটলে পানি।

'ওরা···আমাকে মেরে ফেলবে ধরতে পারলে! গিটার নিয়ে যাবে!'

'কারা?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা।

'হিপ্পি!' আতঙ্কিত চোখে ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে যুবক, চোখে জান্তব আতঙ্ক। 'প্লী-ই-জ!'

দূর থেকে কয়েক জোড়া পায়ের দৌড়ে আসার আওয়াজ শুনতে পেল ওরা সবাই। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিল যুবক।

'ওরা ক'জন?' জানতে চাইল রানা।

'পাঁচজন! আমাকে ধরতে···'

'ভয় নেই,' আগের চেয়েও শান্ত গলায় বলল ও। 'কাউন্টারের পিছনে লুকিয়ে পড়ো।'

এই বিপদের সময়ও ওকে এত স্থির, নির্ভীক দেখে যারপর নেই বিস্মিত হলো লুসি ও তার বাবা। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। যুবকের সেসব লক্ষ করার সময় নেই, ছুটে গিয়ে একলাফে বারের ওপর চড়ে বসল সে, পরক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেল ওপাশে।

লুসির দিকে তাকিয়ে অভয়ের হাসি দিল রানা। 'ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, ওদের কোন প্রশ্নের জবাব দিতে যেয়ো না।'

চাবি দেয়া পুতুলের মত মাথা দোলাল দু'জনই। কারও চেহারায় রঙের আভাস মাত্র নেই। ফ্যালফেলে চোখে রানাকে চেয়ার নিয়ে সামান্য পিছিয়ে বসতে দেখল।

'সমস্যা যদি দেখা দেয়,' আবার বলল ও। 'আমি সামলাব, রিল্যাক্স।'

বাইরে পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। দৌড়ের তেমন গতি নেই ওদের। মনে হয় শিকার কোথায় ঢুকেছে দেখতে পেয়েছে, তাই ব্যস্ততা কম।

ঝাড়া তিন মিনিট পর সামনের ধাপে ওদের সাড়া পাওয়া গেল, বারান্দা অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে পড়ল পাঁচজন। তারমধ্যে একটি মেয়ে। ভেতরে এসে একটু দূরে দূরে দাঁড়াল ওরা। ষোলো থেকে বিশের মধ্যে বয়স। মার্কা মারা নোংরা খবিস্ একেকটা। ওদের গায়ের মিলিত দুর্গন্ধ নাকে যেতে পেটের সব বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো রানার।

দু'হাত টেবিলে লম্বা করে মেলে বসে আছে ও, এক এক করে চোখ বোলাচ্ছে

সবার ওপর। মেয়েটার দিকে তাকাল সবশেষে। ষোলোর মত বয়স ওর, ছোটখাট, হালকা-পাতলা গড়ন। আশ্চর্যরকম নির্লজ্জ আচরণ। ছেলেগুলোর চাইতে মেয়েটা বহুগুণ নোংরা, সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও।

'এখানেই ঢুকেছে ও, নিক,' মন্তব্য করল এক যুবক দলের সবচেয়ে বয়স্কটির দিকে তাকিয়ে। 'আমি দেখেছি।'

ওপরে-নিচে মাথা দোলাল নিক, বোঝা গেল সে-ই দলের নেতা। বারের ওপাশের দু'জনকে দেখল সে কঠিন চোখে, তারপর আনমনে নোংরা দাড়ি চুলকাল। ওদের দেখেও মেয়েটির বা বয়স্ক লোকটার মধ্যে কোন ভাবান্তর ঘটল না দেখে কিছুটা অবাক হয়েছে বোঝা গেল। এমনটা হওয়ার কথা নয়। ওরা যেখানেই যায়, সেখানেই মানুষের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে, অথচ এখানে সেরকম কোন লক্ষণ নেই। ঘুরে রানার দিকে তাকাল নিক, দু'পা এগোল।

'গিটার হাতে কেউ ঢুকেছে এখানে?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল।

জবাব না দিয়ে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল ও অপলক। অন্যগুলো যে যার জায়গায় স্থির, নেশাগ্রস্তের চকচকে চোখ সবার। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রানার কঠিন চাউনি নিককে অস্বস্তিতে ফেলে দিল। চোখের পাতা কেঁপে গেল তার, দেহের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে সরিয়ে নিল।

'কালা নাকি তুমি, ডামি?' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'শুনতে পাওনি কি বলছি আমি?'

'পেয়েছি,' শীতল কণ্ঠে বলল রানা। 'তোমাদের গায়ের দুর্গন্ধও পাচ্ছি। বেরিয়ে যাও, ভেতরটা নরক বানিয়ে ফেলেছ সবাই মিলে।'

চরম বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল নিকের চোখ, এক পা পিছিয়ে গেল। 'কি!' হুঙ্কার ছাড়ল সে, 'কি বললে?' প্রচণ্ড রাগে চেহারা কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে।

'বলেছি বাড়ি যাও, যার যার মাকে গিয়ে বলো তোমাদের সাবান-সোডা দিয়ে ভাল করে কেচে দিতে। জানোয়ারের দল!'

'হারামজাদা!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল নিক, নোংরা দু'হাত মুঠো পাকিয়ে ফেলেছে। 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি…'

'এক পা এগোলে বিপদে পড়বে,' বাধা দিয়ে বলে উঠল রানা। চেয়ার আরও খানিকটা পিছিয়ে বসল। 'মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব সব ক'টার।'

থাবা দিয়ে কাছের টেবিলটা ধরল যুবক, রাগে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে কুকুরের মত, নাকের ফুটো ঘন ঘন স্ফীত হচ্ছে। 'ধরো শালাকে!' চিৎকার করে উঠল সে। 'শেষ করে দাও!'

টেবিল দু'হাতে মাথার ওপর তুলেই এক আছাড়ে ভেঙে ফেলল সে, ওটার একটা ভাঙা পা ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল ব্যস্ত হয়ে। চট্ করে উঠে পড়ল রানা, চিতার মত নিঃশব্দে, চোখের পলকে তার তিন হাতের মধ্যে পৌঁছে গেল। নিক তখনও পায়া টানাটানি করছে, আজরাইল যে কখন চেয়ার ছেড়েছে খেয়ালই করেনি। যখন করল, কিছুই করার থাকল না।

দড়াম করে হেভিওয়েট পাঞ্চ ঝাড়ল রানা তার নাকের ওপর, মাথাটা এত জোরে পিছনদিকে ঝাঁকি খেল নিকের যে ঘাড়ের হাড় ফোটার জোর মড়াৎ শব্দ সবাই পরিষ্কার শুনতে পেল। অসহ্য যন্ত্রণায় গুঙিয়ে গুঙিয়ে উঠল সে, দু'পা পিছিয়ে

পায়া ছেড়ে নাক ধরতে গেল, কিন্তু সময় দিল না রানা। আবার হাত চালাল বিদ্যুৎ গতিতে, আঙুলগুলো সটান সোজা রেখে হাতের কিনারা দিয়ে ভয়ঙ্কর এক চপ মেরে বসল তার ডান কব্জির চার ইঞ্চি ওপরে।

'মট' করে শুকনো কাঠ ভাঙার আওয়াজ উঠল, হাড় ভেঙে গেছে। ঘর ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল নিক, ভাঙা হাত অন্য হাতে মুঠো করে ধরে পড়ে গেল হুড়মুড় করে। নাকমুখ ভেসে যাচ্ছে রক্তে। সেদিকে তাকাল না রানা, পিছনে একটা আওয়াজ শুনে চর্কির মত ঘুরল। ওর ব্যস্ততার সুযোগে ঘুরে পিছনে চলে এসেছে আরেকটা, মাথার ওপরে চেয়ার তুলে ওর মাথায় আঘাত করতে যাচ্ছে। চট্ করে একপাশে সরে গেল ও, বাঁ পায়ের জুতোর মজবুত ডগা দিয়ে ঘুরিয়ে ধাঁই করে মারল তার হাঁটুর বাটিতে। ঠিক জায়গাতেই পড়ল লাথি।

'আউ!' করে উঠল যুবক, চেয়ার ছেড়ে হাঁটু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দুই হাতে জায়গাটা চেপে ধরে জবাই করা মুরগির মত তড়পাচ্ছে, চেহারা বিকৃত হয়ে আছে অসহ্য যন্ত্রণায়।

সোজা হলো রানা, ডলে হাতের ধুলো ঝাড়ল। সন্তুষ্ট। লাথি মারার সময় পায়ে যে জোর ঝাঁকি লেগেছে, তাতেই বুঝে গেছে হাঁটুর বাটি জায়গা ছেড়ে সরে গেছে ওর। চোখ তুলে অন্যদের দেখল রানা। 'বেরিয়ে যাও, এক্ষুণি!'

এতক্ষণ জড় পদার্থের মত দাঁড়িয়ে ছিল ওরা, অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে ছিল দুই সঙ্গীর দিকে। নির্দেশটা কানে যেতে সচকিত হলো, রানার চোখে চোখ রেখে কয়েক পা পিছাল, তারপর ঘুরেই দে দৌড়। কাছে এসে রক্তাক্ত নিকের কলার ধরল রানা, দরজার দিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। বারান্দায় নিয়ে দাঁড় করাল তাকে, নিতম্বে মাঝারি ওজনের এক লাথি মেরে রাস্তায় পাঠিয়ে দিল। পরেরটাকেও একইভাবে বিদায় সম্বর্ধনা জানাল।

দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিয়ে যাও এ দুটোকে। আর যদি কখনও চেহারা দেখেছি তোমাদের কারও, তাহলে...' ইচ্ছে করেই হুমকিটা অসমাপ্ত রাখল ও। ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরল।

পিছন থেকে নোংরা এক গাল দিল মেয়েটা, থুতু ছুঁড়ল ওকে লক্ষ্য করে। থেমে পড়ল রানা, ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল। আঁতকে উঠে একছুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল মেয়েটা।

ভেতরে চলে এল ও। বারের ওপাশে তখন রক্তাক্ত যুবককে নিয়ে ব্যস্ত বাপ-মেয়ে। অজ্ঞান হয়ে গেছে সে।

'মনে হয় ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছে,' তার ক্ষতগুলোর কোনটাই মারাত্মক নয় দেখে মন্তব্য করল রানা।

'আমি যাচ্ছি ডাক্তার আনতে,' অ্যাপ্রন খুলে রেখে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো রেস্টুরেন্ট মালিক।

'দাঁড়ান!' পিছন থেকে রানা ডেকে উঠল। 'জ্ঞান মনে হয় ফিরছে, চোখের পাতা কাঁপছে ছেলেটার।'

এক ঘণ্টা পর।

মোটামুটি সুস্থ এখন যুবক। লুসির বাবা, লাযারোর তৈরি গরম সুপ খাচ্ছে নীরবে। অন্যমনস্ক। মুখের প্রায় সবখানে কালসিটে পড়ে গেছে। ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গেছে মুখ।

মাথার পাশে ও গালে দুটো ক্ষত ছিল তার, পরেরটা একটু গভীর, তবে তেমন নয়। রানা আর লুসি মিলে জায়গা দুটো পরিষ্কার করে তুলো-মলম ও সার্জিক্যাল টেপ দিয়ে প্লাস্টার করে দিয়েছে।

কথা বলছে না ছেলেটা নিজে থেকে, কী যেন ভাবছে। এর মধ্যেও গিটার কাছ ছাড়া করেনি মুহূর্তের জন্যেও। নিজের চেয়ারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ওটাকে।

'ওদের পাল্লায় কি করে পড়লে?' এক সময় প্রশ্ন করল রানা। যুবকের মুখোমুখি বসে আছে ও আর লুসি।

'থাকো কোথায় তুমি, রিকি?' বলল মেয়েটি।

চোখ তুলে ওদের দেখল সে। 'আমার নাম জানলে কি করে?' প্রশ্নটা করল লুসির উদ্দেশে।

'গিটারে লাগানো স্টিকারে দেখেছি।'

'ও।' রানার দিকে তাকাল সে। 'সেইন্ট লুসি থেকে আসছিলাম। কাছেই জায়গাটা। সারাপথ কোন অসুবিধে হয়নি, কিন্তু কেনসভিল ঢোকার মুখে হঠাৎ…' থেমে গেল রিকি। আনমনা হয়ে পড়ল ফের।

'যাবে কোথায়, মানে, থাকো কোথায়?' লুসি জানতে চাইল।

'পাম বীচ।' এক চামচ সুপ মুখে তুলল সে। 'ওখানে আমাদের…ইয়ে, এক সামার রেস্টে চাকরি করি। গিটারিস্ট।'

'এতদূর! এদিকে কেন এসেছিলে?' বলল রানা।

'আমার এক পরিচিত লোককে খুঁজতে। সেইন্ট লুসি থাকে সে জানতাম, পেলাম না। ভেবেছিলাম এদিক দিয়ে শর্ট কাট্ রাস্তা ধরে মোটরওয়ে ওয়ানে উঠব, লিফট নিয়ে ফিরে যাব পাম বীচে।' খানিক চুপ করে থাকল সে। 'কিন্তু…এখন পথে নামতে সাহস হচ্ছে না। এদিকে যে কাজে আসা, তাও হলো না। ফিরতে দেরি হলে…'

'কি আর করবে,' সান্ত্বনার সুরে লুসি বলল। 'তোমার যা অবস্থা, আজ এমনিতেও পথে নামা ঠিক হবে না।'

'বুঝতে পারছি। কিন্তু কার্লো যদি রাগ করে?' অনেকটা নিজেকেই প্রশ্ন করল রিকি।

লুসি নড়েচড়ে বসল। 'সে কে? রাগ করবে কেন?'

'লোকটা যে কখন, কেন রাগ করে-খুশি হয়, আমি নিজেই কি জানি?' নিচু স্বরে বলল যুবক, কিছু শুনতে পেল ওরা, কিছু পেল না।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দু'জনে। ছেলেটার কথাবার্তা যেন কেমন কেমন, মনে হয় ভেতরে কোন রহস্য আছে।

দুই

অনেক রাতে গিটারের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। পাশের রুমে আছে রিকি, ও বাজাচ্ছে।

ঘড়ি দেখল রানা—সোয়া একটা। আশ্চর্য! এখনও জেগে আছে ছেলেটা? রুমে যাওয়ার আগে একটা করে পেইন কিলার ও ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিয়েছে ওকে লুসি, তারপরও…!

কান পাতল ও। গিটারের সাথে গুন্ গুন্ করে গান ধরেছে রিকি! ভারি মিষ্টি গলা ওর, তবে বিষাদ মাখানো। গানটাও তেমনি।

সন্ধের সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হলো ওর। রিকির ঘন ঘন আনমনা হয়ে পড়া, কথা বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলা, চেপে যাওয়া, গভীর রাতে এমন এক গানের সুর তোলা, এসবের মধ্যে নিশ্চই কোন রহস্য আছে। কি হতে পারে তা? পরক্ষণে বিরক্ত হয়ে উঠল নিজের ওপর, কি দরকার ওর এতসবে? দুনিয়ায় কার মধ্যে কি রহস্য-বেদনা আছে, সবই জানতে হবে ওকে? ঘুরে শুলো ও, ঘুমাবার চেষ্টা করল। কাজ হলো না। কান আর মন পড়ে আছে পাশের রুমে, আশ্চর্য দরদ দিয়ে গেয়ে চলেছে রিকি চাপা গলায়।

মাঝের পাতলা পার্টিশন ভেদ করে সব কথা কানে আসছে রানার। উঠে যে নিষেধ করবে, তাতেও মন সাড়া দিল না। প্রায় তিনটা পর্যন্ত একনাগাড়ে বাজাল যুবক, তারপর অনেকক্ষণ আর সাড়া নেই। বোধহয় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, ভাবল ও। ভালই হলো।

সকাল ন'টায় ঘুম ভাঙল রানার। আড়মোড় ভেঙে বিছানা ছাড়ল। বাথরুম সেরে রুম সংলগ্ন পিছনের সরু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। হোটেলের গজ পঞ্চাশেক পিছনেই নদী দেখে অবাক হয়ে গেল ও। তেমন চওড়া নয়, তবে স্রোত দেখে বোঝা যায় বেশ গভীর, পানিও টলটলে, পরিষ্কার।

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না ও। অনেকদিন হলো খোলা নদীতে সাঁতার কাটার সুযোগ জোটেনি। আজ যখন মিলেই গেল, ছাড়া বোকামি হবে। ব্যাগ থেকে ঝটপট বেদিং ট্রাঙ্ক বের করে পরে ফেলল ও, বড় এক তোয়ালে কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল রুম ছেড়ে। উদ্দেশ্য জানতে পেরে স্রোত সম্পর্কে বারবার সতর্ক করল ওকে লুসি, কানেই তুলল না রানা

আধঘণ্টা ধরে সাঁতার কাটল মনের আশ মিটিয়ে। বলতে গেলে পুরোটা সময়ই স্রোতের উল্টোদিকে সাঁতরাল ও, হোটেলে ফিরল রাক্ষুসে খিদে নিয়ে। কাপড় বদল করতে ওপরে যাওয়ার সময় নাস্তা তৈরি করার জন্যে লুসির উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল। সিঁড়িতে রিকির সাথে দেখা হতে হাসল ও। 'অবস্থা কেমন এখন?'

'ভাল,' রিকিও হাসল। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে রানার সুগঠিত, পেশীবহুল দেহের দিকে। খেয়াল করল না ও।

চারজনের নাস্তা একাই সাবাড় করল রানা, তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল। শরীর একেবারে ঝরঝরে, তরতাজা হয়ে গেছে সাঁতরে, মনটাও ফুরফুরে লাগছে। ভাবছে, লুসি বা লাযারো হয়তো এতক্ষণে ওর সমস্যার কোন সুরাহা করে ফেলেছে। রাতে রুমে যাওয়ার আগে দু'জনকেই অনুরোধ করেছে রানা, এখানে যাদের গাড়ি আছে, তাদের সবাইকে বলে দেখতে কেউ ওকে কাছের কোন বড় শহরে পৌঁছে দিতে রাজি হয় কি না। কার রেন্টাল কোম্পানির অফিস আছে, এমন যে কোন শহর হলেই চলবে। টাকা যা চাইবে, তাই সই।

এ মুহূর্তে বেশ কিছু খদ্দের আছে রেস্টুরেন্টে, কফি পান করছে, গল্প করছে। সামনে দুটো গাড়িও আছে, ছোট ভ্যান। কিন্তু ওর আশা পূরণ হলো না। বারোটার দিকে ফাইন্যাল জানিয়ে দিল লুসি, কেউ যেতে রাজি নয়। কাজেই আবার হেঁটেই এগোবার সিদ্ধান্ত নিল ও। রিকির সাথে কথা বলে ঠিক করল দু'জন একসাথে যাবে।

মোটরওয়ে ওয়ানে যাওয়ার সহজ রাস্তা চেনে রিকি, ওর সাথে গেলে সুবিধেই হবে। ওখানে গিয়ে লিফট নেয়ার চেষ্টা করবে। তবে দিনে নয়, সন্ধের পর রওনা হবে দু'জনে। একে গরম কম থাকবে তখন, তারওপর হিপ্পিদের মুখোমুখি হয়ে পড়ার আশঙ্কাও থাকবে না। হয়ে পড়লেও বিশেষ কিছু আসবে-যাবে না, তবু, কি দরকার ঝামেলায় যাওয়ার? তাছাড়া দিনে পৌঁছলে যে হাইওয়েতে গাড়ি পাওয়া যাবে, তারই বা ঠিক কি?

দুপুরে খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়ার আয়োজন করল রানা, রাতে কতক্ষণ হাঁটতে হবে কে জানে! কিন্তু এল না ঘুম। অনর্থক গড়াগড়ি করার কোন মানে হয় না, তারচেয়ে বরং রিকিকে ডেকে গল্প করা যাক ভেবে উঠে পড়ল। দেখা যাক, ভেতরের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায় কি না। ওকে ডাকবে বলে দরজা খুলে বিস্মিত হলো রানা।

ছেলেটা ওর দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে গিটার হাতে। চেহারায় রাজ্যের দ্বিধা। মনে হলো নক করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওকে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।
'কি হয়েছে, রিকি?'

'অ্যাঁ? না, কিছু না। এমনিই...'

'ভেতরে আসবে?' নরম সুরে প্রশ্ন করল রানা।

চট্‌ করে চোখ তুলেই নামিয়ে নিল যুবক।

'এসো।'

'অ্যাঁ?'

'ভেতরে এসো, গল্প করি দু'জনে।'

তক্ষুণি রাজি হয়ে গেল রিকি, এত দ্রুত ঢুকে পড়ল যেন ওর মত পাল্টে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

ঘরের একমাত্র চেয়ারে তাকে বসতে বলল রানা। নিজে বসল খাটের কোনায়। সিগারেট ধরাবার ফাঁকে খেয়াল করল, অপলক চোখে ওকে দেখছে ছেলেটা, পরিষ্কার বোঝা যায় কি যেন বলতে চায়, কিন্তু দ্বিধা ঝেড়ে উঠতে পারছে না।

'তুমি খুব চমৎকার গিটার বাজাও, রিকি,' একগাল ধোঁয়া ছেড়ে হাসল রানা। 'গলাও খুব মিষ্টি। শুনেছি কাল রাতে।'

'ধন্যবাদ,' আরেকদিকে তাকিয়ে বলল যুবক। 'বাবার কাছে গিটার বাজানো শিখেছি ছোটবেলায়। গলা পেয়েছি মা'র তরফ থেকে। অদ্ভুত সুন্দর গলা ছিল মা'র।' কথা বলার সুযোগ পেয়ে অনেকটা সহজ হয়ে উঠল সে। 'আপনিও খুব ভাল সাঁতার জানেন। ঠিক আপনার মত এক ওস্তাদ সুইমারের সাথে পরিচয় ছিল, গতবারের আগের অলিম্পিকের সিলভার মেডালিস্ট এসেছিলাম তার খোঁজেই।'

'কিন্তু পাওনি,' বলল রানা।

'হ্যাঁ। দু'বছর আগে নিউ ইয়র্ক চলে গেছে লোকটা।'

'তাকে কি জন্যে খুঁজছ?'

'আমাদের চীফ বাউন্সার…' চট্ করে ব্রেক কষল রিকি। 'মানে, কার্লো খুঁজছে।'

'কার্লো?'

'আমি যে সামার রেস্টে আছি, তার মালিক আর কি!'

ছেলেটাকে ভাল করে দেখল ও আবার কাল একটু বেশিই দেখাচ্ছিল বয়স, এখন মনে হচ্ছে আঠারোর বেশি হবে না অথচ চেহারায় তারুণ্যের দীপ্তি বলে কিছুর চিহ্নই নেই, কেমন যেন বুড়োটে ভাব। অসময়ে কাঁধে বেশি ভারী বোঝা চেপে বসলে এমনটা ঘটে।

'একটু আগে বললে কার্লো তোমাদের চীফ বাউন্সার, এখন বলছ মালিক আর কি,' নরম সুরে রানা বলল। 'আসলে কোনটা সত্যি?'

নজর নামিয়ে নিল যুবক। আনমনে গিটারের চাবি খুঁটতে লাগল নখ দিয়ে, মুখ খোলার লক্ষণ নেই।

'কাল রাতেও তার সম্পর্কে তোমাকে দুয়েকটা মন্তব্য করতে শুনেছি, ব্যাপার কি, বলো তো? কার্লো কে?'

বেশ কিছু সময় পর মুখ তুলল ছেলেটা। হাসল, কিন্তু তাতে প্রাণের কোন ছোঁয়া দেখল না ও। 'কার্লো?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ, কে সে?' সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল রানা।

'একদিন আমাদের রেস্টের কর্মচারী ছিল,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল রিকি উদাস কণ্ঠে। 'ভাগ্যের ফেরে আজ ওটার মালিক সে, আমি তার কর্মচারী।'

'ওই রেস্ট তোমাদের ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার বাবা…?'

'নেই। কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।'

'সরি, রিকি,' বলল রানা।

'ঠিক আছে। সে সময় আমি ছোট ছিলাম, দশ কি বারো বছরের। সব মনেও নেই।'

'আর তোমার মা?'

'সে-ও নেই। কার্লোর হাতে মরেছে। মরে বেঁচেছে,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল

ছেলেটা।

পরের প্রশ্ন মুখ দিয়ে বের করতে অনেক সময় লাগল রানার। 'আর কেউ নেই তোমার? ভাই-বোন?'

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল রিকি। হাসল। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা ওর হাসিতে কৌতুক ঝরছে দেখে। 'কেউ নেই। বাবার দেয়া এই গিটার আর গানের গলা ছাড়া কিচ্ছু নেই।'

'সব বলবে আমাকে?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল সে। 'সেই জন্যেই তো এসেছি।' কিছু সময় পর নিজে থেকে বলতে শুরু করল, 'বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল কার্লো। মায়ামির এক্স হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন। একবার ডোপ টেস্টের ফল পজেটিভ প্রমাণ হওয়ায় বের করে দিয়েছিল ওকে অ্যাসোসিয়েশন। সে সময়ে অ্যাডিক্টদের প্রচণ্ড ঘৃণা করত সমাজ। কোথাও কোন কাজ জোটাতে না পেরে শেষে বাবার কাছে এল সে সাহায্যের আশায়। রেস্টের বদনাম হওয়ার ভয় ছিল, তবু তাকে ফিরিয়ে দিতে পারেনি বাবা, চীফ বাউন্সারের চাকরিতে নিয়ে নিল। বাউন্সার হচ্ছে বার-রেস্টুরেন্টে বেতন দিয়ে পোষা মাসলম্যান, মাতাল-দাঙ্গাবাজ খদ্দের দমন করতে নিয়োগ দেয়া হয় এদের।'

'জানি,' মৃদু মাথা ঝাঁকাল রানা।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রিকি। 'খুব ভাল মানুষ ছিল বাবা, সোজা-সরল মানুষ। কার্লোকে চাকরি দিয়ে যে খাল কেটে কুমির ডেকে আনছে, চিন্তাই করেনি। তার সেই ভুল তার মৃত্যুর পর কাল হয়ে দাঁড়াল আমাদের জন্যে, তার মাসুল দিতে মাকে মরতে হলো।'

'কিভাবে?' আরেকটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। আনমনে তাকিয়ে থাকল ওর ফোলা, কালসিটে পড়া মুখের দিকে।

'বাবা মারা যাওয়ার দু'মাসের মধ্যে মাকে বিয়ে করে কার্লো। ওর আগের বউ এক মেয়ে রেখে মারা গেছে তার বছর তিনেক আগে। শুনেছি মহিলাকে রোজ মাতাল অবস্থায় গরুর মত মারধর করত লোকটা, মা'র সাথেও একই আচরণ করত। মারের চোটে একেকদিন অজ্ঞান হয়ে যেত মা, দূরে দাঁড়িয়ে দেখতাম আমি, কাছে যাওয়ার সাহস পাইনি কোনদিন। বাধা দেয়া বা প্রতিবাদ করার কথা তো কল্পনাই করতাম না। ওকে দেখলেই আতঙ্কে বুক ধড়ফড় করত আমার। এখনও করে। আজও পর্যন্ত কার্লোর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস অর্জন করতে পারিনি।'

'তোমার মা কেন তার অত্যাচার সয়ে গেল?'

'আমাদের উপায় ছিল না। নিজেদেরই বাংলোয় বন্দী করে রাখত আমাদের কার্লো। গেটে চব্বিশ ঘণ্টা গার্ড থাকত পাহারায়, বাংলোর টেলিফোনের লাইন কেটে দেয়া হয়েছিল যাতে আমরা বাইরের সাথে যোগাযোগ না রাখতে পারি,' থেমে আপনমনে মাথা দোলাল যুবক। 'কোন উপায় ছিল না। মাকে জবরদস্তি বিয়ে করে আগেই আমাদের সব পথ বন্ধ করে রেখেছিল লোকটা। এই জন্যে লেখাপড়াও হয়নি আমার।'

'জবরদস্তি বিয়ে মানে?' কপালে ভাঁজ পড়ল রানার।

'রেস্টের জন্যে একটা মোটরবোট কিনতে গিয়ে টাকায় টান পড়ায় কার্লোর কাছ থেকে বাবা পাঁচ হাজার ডলার ধার করেছিল, পরে সে টাকা বাবা শোধ করে দিয়েছে, তার লিখিত ডকুমেন্টও ছিল, অথচ যেই বাবা মারা গেল, অমনি অস্বীকার করে বসল সে। বলল, বাবা নাকি টাকা দিতে পারেনি। তাই কার্লোর নামে লিখে দিয়ে গেছে রেস্টের মালিকানা। তার কাছে নাকি প্রমাণও আছে সেসবের।

'মা মেনে নেয়নি। বাবা যে টাকা শোধ করেছে, মা ভাল করেই জানত সে কথা, তার প্রমাণ আমাদের বাসার সেফেই ছিল। কার্লো সেটা চুরি করেছে তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহায্যে। লোকটা মেক্সিকান, খুব ওস্তাদ পিটারম্যান। এমন কোন সেফ নেই যার তালা সে খুলতে পারত না। বাবার অ্যাক্সিডেন্টের সময় লোকটা পাম বীচেই ছিল, প্রায়ই রেস্টে আসত, গুজগুজ করত কার্লো তার সাথে।'

'তারপর?'

'ডকুমেন্টটা খোয়া যাওয়ার কথা মারা যাওয়ার আগে বাবা নিজেই মাকে জানিয়েছিল, কার্লোকে সন্দেহ করেছিল, কিন্তু চোখ লজ্জার কারণে বলতে পারেনি কিছু। সময় পেলে একটা ব্যবস্থা নিশ্চই করত বাবা, কিন্তু হলো না। বাবা মারা গেল, সব ওলট পালট হয়ে গেল। কার্লোর ধারণা ছিল মা এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানত না, কিন্তু যখন শুনল জানে, বিপদ ঘটিয়ে বসতে পারে, তখনই মুখ বন্ধ করার জন্যে জবরদস্তি বিয়ে করল মাকে।

'তারপর…একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে শুনি মারা গেছে মা। সবাই বলল, আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি, আজও করি না। আগের রাতে মাকে খুব মেরেছে কার্লো, আমি জানি। নিশ্চই বেকায়দা লেগে গিয়েছিল, নইলে আর কোন কারণ দেখি না আমি তার হঠাৎ মারা যাওয়ার। বাপমরা একমাত্র নাবালক ছেলেকে বাঘের মুখে রেখে আত্মহত্যা করার মত মা ছিল না আমার মা। আমি জানি,' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল রিকি।

অসহ্য নীরবতা নেমে এল ঘরের মধ্যে। অবাক বিস্ময়ে যুবকের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। এতবড় এক অভাগা ও, ভাবাই যায় না।

শ্রাগ করল সে। 'কয়েক বছর হয়ে গেছে। এখন সে সব ভুলে গেছি। কি হবে কষ্ট পুষে রেখে? প্রতিকার তো করতে পারব না। আমার কথা কেউ বিশ্বাসও করবে না, আর যদি করেও, কার্লোর মত ভয়ঙ্কর, জাত ক্রিমিন্যালের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কথা কখনও স্বপ্নেও ভাববে না। তাই…। এতসব কাউকে বলিনি কোনদিন, আপনাকেই প্রথম বললাম,' মুখ তুলে অপ্রতিভের মত হাসল। 'কেন জানি না। কাল রাতের ঘটনা লুসির মুখে শুনেছি আমি। আপনি না থাকলে যে কি হত! মরা বাপের একমাত্র স্মৃতি হয়তো হাতছাড়াই হয়ে যেত। এটা দিয়েই পেট চালাই, বেহাত হয়ে গেলে…'

'সেই সাঁতারুকে কেন খুঁজছিলে তুমি?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল রানা। 'কি দরকার তাকে তোমার?'

'আমার না, কার্লোর দরকার তাকে।'

'কেন?'

'বিশেষ এক কাজে কিছুদিন থেকে একজন ভাল সুইমার খুঁজছে সে, কাজটা কি

জানি না। তবে শুনেছি অনেক টাকা দেবে সে উপযুক্ত লোক পেলে।' চোখে সকালের সেই অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটল রিকির, কি এক প্রত্যাশা নিয়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। 'এই লোক আমার চেনা শুনেই কার্লো ঠেলে পাঠিয়ে দিল, বলল, যে করে হোক তাকে নিয়ে যেতে হবে আমাকে।'

'পেলে তো না, এখন কি করবে?'

'কি আর করব!'

'লোকটাকে কার্লো চেনে?' প্রশ্ন করল রানা।

'নাহ্!'

কিছু ভাবল ও। চোখ কুঁচকে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে, মনে হচ্ছে কিছু একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করছে। ওর বিবেক, অসহায়ের প্রতি সহজাত মমতা-ভালবাসা; বিচারবোধ ওকে ঠেলছে সামনের দিকে। মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা জাগল না, কাজেই সিদ্ধান্ত নিতেও দেরি হলো না।

ঘুরল রানা। রিকির চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি যদি যাই তোমার সাথে, কেমন হয়?'

প্রশ্নটার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে কিছু সময় লাগল ছেলেটার। বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল। তবু আরও নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইল ও। 'মানে!'

'আমি ছুটিতে বেরিয়েছিলাম ভেরো বীচে কিছুদিন থেকে আসব ভেবে। কিন্তু এখন ভাবছি তোমার সাথে পাম বীচেই যাব। তোমাদের রেস্টে থেকে আসব। মোটামুটি সাঁতার আমিও জানি, আমাকে দিয়ে কার্লোর কাজ হতেও পারে, কি বলো?'

নিজের অজান্তে মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'আমার মনে হয় হবে। আমি দেখেছি আপনার সাঁতার। যার খোঁজে এসেছি, তার থেকে আপনি কোন অংশে কম যান না, কিন্তু…' থেমে গেল দ্বিধায় পড়ে।

'কিন্তু কি?' রানা প্রশ্ন করল।

'না, মানে, আপনার মত পয়সাওয়ালা মানুষ কেন কার্লোর চাকরি করবে তাই ভাবছি।'

হেসে উঠল ও। 'আমি পয়সাওয়ালা কে বলল তোমাকে?'

'আপনার গাড়ি আছে শুনেছি, অথচ…'

'গাড়ি আছে শুনেই বড়লোক ভেবে বসেছ? ওটা অনেক পুরানো, দাদার আমলের। খুব সস্তায় কিনেছিলাম, বুঝলে? ঝক্কর মার্কা। নইলে কি আর পথের মধ্যে নষ্ট হয়?'

মেনে নিল রিকি। 'আপনি সত্যি যাবেন?'

'নিশ্চই!' অবাক হওয়ার ভান করল ও। 'কেন যাব না? বেড়ানোর কাজও হবে, উল্টে কিছু রোজগারের সম্ভাবনাও যখন আছে, এমন সুযোগ কেন ছাড়ব?'

দ্বিধার মেঘ কেটে, ঝলমল করে উঠল যুবকের চেহারা। 'আমি…আমি তাহলে কার্লোকে জানিয়ে দি'?' উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ল সে।

'কি?'

'এই যে, আরেকজন সুইমার পেয়েছি, তাকে নিয়ে আসছি আমি!'

'জানাবার কি দরকার?' প্রশ্ন করল রানা।

'ইয়ে,' পলকে চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল যুবকের। 'মানে, একদিন দেরি হওয়ার অপরাধ ঢাকার একটা ছুতো দেখানো যেত কার্লোকে।'

কতখানি মানসিক চাপের মধ্যে আছে রিকি, কার্লোর সামান্য সুনজর অর্জনের জন্যে কত হিসেব করে চলতে হয়, ভাবতে গিয়ে অবাক হলো রানা। 'বেশ, জানাও। বলো, আজ রাতেই রওনা করব আমরা।'

তড়াক করে উঠে পড়ল সে। নির্মল হাসিতে চেহারা উদ্ভাসিত। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার! অনেক উপকার হলো আমার। ফিরে গিয়ে কি বলে উদ্ধার পাব ভেবে পাচ্ছিলাম না...'

'দাঁড়াও!' ছেলেটা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে পিছন থেকে বলে উঠল ও। 'কার্লোকে কি বলতে হবে, শুনে নাও আগে। বলবে...,' একটু ভাবল রানা। 'বলো, আমিও মেডেল পাওয়া সাঁতারু, ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন।'

'অ্যাঁ!!!' চোখ কপালে উঠল যুবকের। 'সত্যি!'

অনেক কষ্টে হাসি দমন করল ও। ওপরে-নিচে মাথা দোলাল। গম্ভীর।

'কবে, মানে, কোন্ বছরের?'

'এত কথা মনে রাখতে পারবে না তুমি, ভুলে যাবে। খবরটা শুধু জানাও, সন-তারিখ পরে আমি নিজেই কার্লোকে জানাব।'

'আচ্ছা!' দুদ্দাড় করে ছুটল রিকি।

একটু পর নিচের নির্জন বার থেকে ওর গলা ভেসে এল, টেলিফোনে কথা বলছে। 'হ্যালো! জনি? আমি রিকি, কেনসভিল থেকে।...কার্লোকে দাও। ...বাইরে? কোথায় গেছে?... কবে? ...ও। অ্যাঁ? কন্ট্যাক্ট নাম্বার? হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও। খুব জরুরী। ...দাঁড়াও, লিখে নি'।'

খানিক চুপচাপ। 'ঠিক আছে, আমি যোগাযোগ করছি।...হ্যাঁ, পেয়েছি। তাকে নিয়েই রওনা হচ্ছি আজ। কাল ভোরে পৌছতে পারব আশা করি। সী ইয়া, ম্যান!'

একটুপর আবার তার গলা শোনা গেল। কার্লোর সাথে কথা বলছে। বেশ উত্তেজিত। কথা শেষ হতে ওপরে উঠে এল সে। ফোলা মুখে চওড়া হাসি। 'আপনার চাকরি পাকা করে এলাম।'

'আচ্ছা!' বলল রানা।

সন্ধে হয়ে আসছে। যাত্রার জন্যে তৈরি রানা ও রিকি। হাঁটতে অসুবিধে হবে, তাই আধপেট করে ডিনার খেয়ে নিল। তারপর কফি। বিলের সাথে গতরাতের ভাঙা টেবিলের দাম দিতে গিয়ে বিপাকে পড়ল রানা, কিছুতেই নিতে রাজি নয় লুসি বা লাযারো। বোঝা গেল এ ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল দু'জনে।

'তুমি না থাকলে কাল পুরো রেস্টুরেন্টই ভেঙে চুরমার করে দিত ওরা,' যুক্তি দেখাল লুসি। 'তার বিনিময়ে একটা টেবিল কিছুই নয়, ও টাকা দিতে হবে না তোমাকে।'

ওর যুক্তি আরও অকাট্য। 'তোমরা ভুলে যাচ্ছ গালাগাল করে নিককে ওটা ভাঙতে আমিই উৎসাহ জুগিয়েছিলাম,' বলল রানা। 'তারও আগে তোমাদের কথা দিয়েছিলাম, কোন ঝামেলা হলে আমি সামলাব। কিন্তু আমি তা পারিনি। কাজেই

টাকা নিতেই হবে তোমাদের।'

ওর আপোসহীন চেহারার দিকে খানিক তাকিয়ে থাকল লাযারো, ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসল 'আচ্ছা, দাও,' হাত পাতল।

একটু পর বেরিয়ে পড়ল ওরা দু'জন। আকাশে ঝলমলে চাঁদ দেখে খুশি হয়ে উঠল রিকি। 'ভালই হলো,' বলল সে। 'হাঁটতে সুবিধে হবে আমাদের।'

তিন

প্রায় তিন ঘণ্টা হতে চলল একনাগাড়ে হাঁটছে ওরা।

এরমধ্যে বহুগুণ জোরালো হয়েছে চাঁদের আলো, ধুলোয় মোড়া সেকেন্ডারি রোড সাদা দেখাচ্ছে, ওদের খাটো খাটো, গাঢ় কালো ছায়া গড়িয়ে গড়িয়ে এগোচ্ছে তার ওপর দিয়ে। পথের দু'পাশে ম্যানগ্রোভের পুরু ঝোপ চোখের সামনে কালো এক পর্দা তুলে রেখেছে। বাতাস স্থির।

নীরবে হাঁটছে দু'জনে—রানা আগে, রিকি পিছনে। যে যার চিন্তায় ডুবে আছে।

'আরেকটু গেলেই হাইওয়ে,' চাঁদের আলোয় হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলল রিকি। 'সাড়ে দশটা বাজে।'

'তোমার আঘাত দুটোর কি অবস্থা?' জানতে চাইল রানা।

'একটু একটু আছে ব্যথা, তবে অসুবিধে হচ্ছে না।' শব্দ করে হাসল সে। 'আমার তো অল্পের ওপর দিয়ে গেছে, নিক আর তার সঙ্গীর কি অবস্থা, তাই ভাবছি।' প্রশংসার দৃষ্টিতে রানাকে দেখল। 'সত্যি, প্রচণ্ড শক্তি আপনার গায়ে। যে ভাবে প্রথমটার হাত ভেঙে দিয়েছেন শুনলাম, ভাবাই যায় না। আপনি ইচ্ছে করেই ভেঙেছেন ওর হাত?'

ঠোঁট টিপে হাসল ও 'এই চিন্তা কখন মাথায় ঢুকল?'

'আজই।' ডাফল ব্যাগ এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে নিল যুবক। 'লুসির মুখে ঘটনা শুনে সেরকমই মনে হলো। ওরও তাই ধারণা।'

'ঠিক, আমি নিকের হাত ভাঙার জন্যেই মারটা মেরেছি। ওটা হচ্ছে ফাইটে জয়ী হওয়ার মূল টেকনিক। যখন তুমি বুঝবে যে আত্মরক্ষার জন্যে শত্রুকে তোমার আঘাত করতেই হবে, তখন ওরকম কিছুই করতে হবে, যাতে শত্রু অকেজো হয়ে যায়। এটাই ফাইট রুল। সে সময় তাকে খোঁচা মারতে যাওয়া বোকামি। কাল যদি তাই করতাম, কপালে অনেক খারাবি ছিল আমাদের সবার।'

'ঠিক বলেছেন।' একটু বিরতি। 'আপনাকে কি বলে ডাকব? চ্যাম্প ডাকতে পারি?'

মুচকে হাসল রানা। 'শিওর!'

দশ মিনিট পর হাইওয়েতে উঠল ওরা পথের পাশে ব্যাগ, গিটার রেখে নিজের মেক্সিকান বুট খুলে ফেলল রিকি গরমে সেদ্ধ হয়ে গেছে পা। রানাও বসল ওর পাশে, পায়ের আড়ষ্টতা কাটাতে পায়ের ব্যায়াম শুরু করে দিল। হাইওয়েতে

কোনদিকেই গাড়ির কোন চিহ্ন নেই।

'সাড়ে দশটার দিকে ইন্টারডিস্ট্রিক্ট ট্রাকের দেখা পাওয়া যাবে,' বলল রিকি। 'পাম বীচের দিকে যাবে ওরা।'

'সাড়ে দশটায়ই কেন?'

'হিপ্পিদের কারণে গত কয়েকদিন ধরে এই নিয়ম চলছে। সে জন্যেই তো এদিকে এলাম।'

রানা চুপ করে থাকল।

ওর কথাই ঠিক, সাড়ে দশটার একটু পর দূরে, পাহাড়ী পথে প্রথম হেডলাইট দেখা দিল। তাড়াতাড়ি জুতো পরে উঠে দাঁড়াল সে, বুড়ো আঙুল বাঁকা করে সঙ্কেত দিল। থামল তো না-ই বরং গতি আরও বাড়িয়ে দিয়ে ভূমিকম্প তুলে ছুটে চলে গেল ট্রাকটা।

পনেরো মিনিটের মধ্যে পরপর চারটা ট্রাক একই কাণ্ড ঘটাতে ভুলটা বুঝতে পারল রানা, আসলে রিকির ঘাড় পর্যন্ত দীর্ঘ চুলই এর কারণ। লোকগুলো নিশ্চই ওকে হিপ্পি ধরে নিয়েছে।

'বোঝা গেল তোমাকে দিয়ে হবে না,' বলল ও। কারণটাও ব্যাখ্যা করল। 'এবার আমি সিগন্যাল দিয়ে দেখি কি হয়।'

পরেরটার হেডলাইটের তুলনামূলক ক্ষীণ আলো ও মাঝের ব্যবধান দেখে বুঝল রানা ওটা ট্রাক নয়, আর কিছু। কাছে আসতে চাঁদের আলোয় দেখা গেল ওর অনুমানই ঠিক। গাড়িটা কার—মাসটাঙ। পিছনে একটা ডবল-বার্থ ক্যারাভ্যান জোড়া আছে। ওটার দাঁড়াবার সম্ভাবনা নেই। তবু, সব দরজাই একেকটা সম্ভাবনার দরজা, আপ্তবাক্যটা স্মরণ করে হাইওয়ের অনেকটা ভেতরে চলে এল ও, লক্ষ রাখল হেডলাইটের আলোয় চালক যেন পরিষ্কার দেখতে পায় ওকে।

খেয়াল করেনি রিকিও কখন এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। ভয় হলো রানার দাঁড়াবে না কার, চলে যাচ্ছে। পরক্ষণে ভুল ভাঙল টারমাকে টায়ারের ঘষা খাওয়ার আওয়াজ শুনে— থেমেছে! ওদের ছেড়ে দশ গজমত এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মাসটাঙ, ফিতে ধরে ব্যাগ সামলে দ্রুত এগোল রানা। ড্রাইভারের জানালা দিয়ে উঁকি দিল।

ড্যাশবোর্ডের সবুজ আলোয় তার চেহারা দেখে রীতিমত থতমত খেয়ে গেল ও। একটা মেয়ে! যদিও চোখে দেয়া বড় এক অ্যান্টি-ড্যাযল, গাঢ় হলুদ গগলসের জন্যে তার চেহারা দেখার উপায় নেই। চুল ও নাকের নিচের অংশও বড় এক সাদা স্কার্ফে ঢাকা। স্কার্ফের নিচের অংশ কালো ওপেন নেক শার্টের কলারের নিচে গোঁজা। একটা চুলও দেখা যাচ্ছে না। গগলসের ওপাশের চোখ জোড়া ওকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে বুঝতে পেরে অস্বস্তিতে পড়ে গেল রানা। আজব কাণ্ড! এতরাতে হাইওয়েতে একা এক মেয়ে, তাও এই বেশে, ভাবাই যায় না

'মায়ামির দিকে যাচ্ছেন?' সামলে নিয়ে বলল ও। 'লিফট পেলে খুব উপকৃত হতাম।'

'চালাতে পারেন?' প্রশ্ন করল মেয়েটি চাপা, খসখসে গলায়। টান আছে তার ইংরেজি উচ্চারণে। কিন্তু কোথাকার, ধরতে ব্যর্থ হলো ও।

'নিশ্চই!'

'লাইসেন্স সঙ্গে আছে?'

'আছে।'

স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি। 'পেতে পারেন লিফট, তবে গাড়ি আপনাকেই চালাতে হবে।'

'নিশ্চই! তাতে আমার আপত্তি নেই।'

রিকিকে দেখল মেয়েটি। 'ও আপনার সঙ্গী?'

'হ্যাঁ।'

'হিপ্পি?'

'না না, ও হিপ্পি নয়।' ওর গালের প্লাস্টার ইঙ্গিত করল রানা। 'ওদের হাতে পড়ে বরং...'

'যাবেন কোথায় আপনারা?' রিকির ওপর চোখ রেখে প্রশ্ন করল সে।

'পাম বীচ।'

একটু ভাবল মেয়েটি। 'আমি অবশ্য মায়ামি যাব। ওকে,' নেমে পড়ল। 'একটানা আঠারো ঘণ্টা গাড়ি চালাচ্ছি আমি, ঘুমের অভাবে ঝাপসা হয়ে গেছে নজর। একটু চোখ বুজতে না পারলে...' মুখ ঘুরিয়ে ক্যারাভ্যান ইঙ্গিত করল। 'সময়মত ওটা মায়ামি পৌঁছে দিতে না পারলে অনেক লোকসান হয়ে যাবে।'

'অনেক লাভজনক ব্যবসা?' বলে উঠল রিকি।

'সে সব জানে আমার মালিক। আমি স্রেফ ড্রাইভার।'

'ও।'

'উঠে পড়ুন,' রানাকে ড্রাইভিং সীট দেখাল মেয়েটি। 'আমি ক্যারাভ্যানে ঘুমুতে চললাম। দয়া করে পাম বীচের আগে ঘুম ভাঙাবেন না আমার।' আড়ষ্ট পায়ে পিছনদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে, ক্যারাভ্যানের দরজা খোলা-বন্ধ হওয়ার আওয়াজ উঠল। ভেতরের বোল্ট লাগিয়ে দেয়া হলো।

এমন অসময় একা একটি মেয়ের নির্জন হাইওয়েতে উদয় হওয়া, তার চেহারা-সুরত, কাহিনী, সবই কেমন অবিশ্বাস্য মনে হলো রানার। সন্দেহজনক। কোন সাহসে গাড়ি থামাল মেয়েটি? কত কিছুই তো ঘটে যেতে পারত ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ল ও চালকের আসনে। রিকিও উঠল। চেহারা দেখে মনে হলো বিষযটা ওকেও ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। চোখাচোখি হতে অনেকটা 'কি জানি, বাপু' ধরনের ভঙ্গি করল সে ঠোঁট উল্টে, নিঃশব্দে শ্রাগ করে।

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। ব্যাপারটা ভুলে যেতে চাইল, কিন্তু পারল না। চিন্তাগুলো কিছুতেই মুক্তি দিতে রাজি নয়, কেবলই খোঁচাখুঁচি করছে। অনেকক্ষণ নীরবে এগোল ওরা।

'একটা কথা বলি, চ্যাম্প?'

রিকির দিকে তাকাল ও। 'কি?'

'আমি অবশ্য শিওর নই,' দ্বিধার সাথে, বেশ ইতস্তত করে বলল ছেলেটা। 'কিন্তু...'

'থামলে কেন? কথাটা কি?'

'মেয়েটার গলা চেনা মনে হয়েছে আমার।'

'কি!'

'না, বললাম তো শিওর নই আমি। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন চিনি। কে হতে পারে?' নিজেকেই প্রশ্ন করল ও। নাকের গোড়া চুলকাল। 'নাকি ভুল শুনেছি? তাই হবে নিশ্চই। এ মেয়ে চেনা হবে কি করে আমার?'

'মেয়েটা যে-ই হোক, খুবই দুঃসাহসী,' মন্তব্য করল রানা।

'তা বটে। ভাগ্য ভাল এ এসেছিল, নইলে হয়তো সারারাত পথে দাঁড়িয়ে কঁ্যাচকলা দেখাতে হত।'

মুচকে হাসল ও। বিষয়টা ভুলে রাস্তায় মন দেয়ার চেষ্টা করল। গতি বাড়িয়ে পঞ্চাশে তুলে আনল। মেয়েটির মধ্যে যদি কোন রহস্য থেকেও থাকে, তাতে ওদের কিছু আসবে যাবে না। কিন্তু যতই ও চাইছে এসব আর ভাববে না, ততই বাড়ছে অস্বস্তি।

'রিকি?' ডাকল রানা

'বলুন!'

'গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট খুলে দেখো তো, গাড়ির কাগজপত্র কিছু রেখেছে কিনা মেয়েটা ভেতরে!'

'কেন?'

'প্রশ্ন কোরো না, যা বলি করো।'

ওর গলার স্বরে অস্বাভাবিক কিছু আছে টের পেয়ে অবাক হলো যুবক কম্পার্টমেন্ট হাতড়ে একটা প্লাস্টিক ফোল্ডার বের করল তাড়াতাড়ি। ভেতরের কাগজপত্র বের করে ম্যাপ লাইট জ্বেলে চোখ বোলাতে লাগল। দেখা শেষ হতে হেলান দিয়ে বসল সে।

'কার গাড়ি?' প্রশ্ন করল রানা। 'মালিক কে?'

'হারয্ রেন্টাল কোম্পানির গাড়ি এটা। ভেরো বীচ থেকে জোয়েল ব্লাচ নামে কে একজন ভাড়া করেছে।'

'লোকটার ঠিকানা?'

'১২৪৪, স্প্রিঙফিল্ড রোড, ক্লিভল্যান্ড।'

'ভাড়া দেয়ার সময়কার মাইলেজ লেখা আছে না?'

মাথা দোলাল রিকি। বিস্ময় একটু একটু বাড়ছে ওর। 'আছে। ১৫৫০ মাইলের সামান্য বেশি।'

চট্ করে ড্যাশবোর্ডের মাইলেজ কাউন্টারের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা। ১৭৯০ লেখা ওখানে। দ্রুত হিসেব কষল ও, বোঝা গেল, জোয়েল ব্লাচ ভাড়া নেয়ার পর মাত্র ২৪০ মাইল চলেছে মাসটাঙ। মেয়েটির একটানা আঠারো ঘণ্টা চলার বিষয়টা তাহলে মিথ্যে, ভাবল ও, এখানেও রহস্য?

'কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল যুবক।

বলল মাসুদ রানা।

'তাতে কি?'

'তাতে এই, পিছনের মেয়েটি জোয়েল ব্লাচ নয়। ওর আঠারো ঘণ্টা চলার ব্যাপারটা ডাহা মিথ্যে। গাড়িটা খুব সম্ভব ও চুরি করেছে

'এই যাহ্! তাহলে?'
'কি তাহলে?' অনেকটা হালকা বোধ করল রানা।
'এখন কি করব আমরা?'
'কি আবার, যা করছি তাই!'
'কিন্তু যদি চুরির ঘটনা রিপোর্ট হয়ে থাকে, হাইওয়ে পেট্রল যদি তাড়া করে আমাদের?'
'মনে হয় না হয়েছে। তাহলে এতপথ আসতে পারত না মেয়েটা।' আর যদি হয়েই থাকে, ভাবল রানা, যদি পুলিস দাঁড় করিয়েই বসে, নিজেকে ঝামেলামুক্ত করা কোন সমস্যাই হবে না ওর। রিকিকেও ছাড়িয়ে নিতে পারবে। আর যদি তা না ঘটে, তাহলে তো কথাই নেই। জায়গামত পৌঁছে মেয়েটির হাতে গাড়ি সঁপে দিয়ে চলে যাবে নিজেদের পথে।
'না হয়ে থাকলেই বাঁচি,' বলল রিকি। 'খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খেয়ে নিলে হত।'
'এখানে খাবার কোথায় পাচ্ছ তুমি?'
হাসল সে। 'আপনি যখন বিল দিয়ে ব্যাগ আনতে ওপরে গিয়েছিলেন, বুড়ো লাযারো তখন জোর করে দুটো প্যাকেট গুঁজে দিয়েছে আমার ব্যাগে। আপনাকে জানাইনি নিষেধ ছিল বলে।'
'তাহলে আর দেরি কিসের? শুরু করে দাও।' একটা প্যাকেট রিকি ওর দিকে বাড়িয়ে ধরেছে দেখে মাথা দোলাল রানা। 'আমার খিদে পায়নি। তুমি লেগে পড়ো।'
খড়মড় করে ব্রাউন পেপারের প্যাকেট খুলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রিকি। খানিক পর এক গাল খাবারের ফাঁক দিয়ে কোনমতে বলল, 'লোকটা সত্যি রাঁধতে জানে!' অনেকক্ষণ আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না ওর। নীরবে মুখ চালাচ্ছে।
রানা ওদিকে গতি বাড়িয়ে দিয়েছে মাসটাঙের, স্পীডোমিটারের কাঁটা পঁয়ষট্টির ওপর কাঁপছে তিরতির করে। উইঙ মিররে একেবারে হঠাৎ একজোড়া হেড়লাইটের আলো দেখে বিস্মিত হলো ও। কোত্থেকে এল গাড়িটা ভেবে পেল না। আকাশ থেকে পড়ল নাকি? হলপ করে বলতে পারে রানা, একটু আগেও ছিল না ওটা।
হাইওয়ে পেট্রল? ভাবল ও, পথের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল? ওকে গতিসীমার ওপরে ছুটতে দেখে…চট করে গ্যাস পেডালের ওপরের চাপে ঢিল দিল রানা। ষাটে নামিয়ে আনল গতি, ষাটই এই হাইওয়ের সর্বোচ্চ গতি। খেয়াল করল, ও গতি কম করার পরও দুটো গাড়ির মাঝের ব্যবধান কমল না। অনুমান আধমাইল পিছনে ছিল পিছনেরটা, এখনও তাই আছে।
তাহলে পুলিস নয়, নিশ্চিত হলো। হলে তেড়ে আসত, থামার নির্দেশ জানাত সাইরেন বাজিয়ে। গাড়ির গতি পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা রিকির নজর এড়াল না। ঘুরে তাকাল সে মুখ নাড়া বন্ধ করে। 'কি হলো, চ্যাম্প? স্পীড কমালেন কেন?'
'পিছনে গাড়ি।'
নিজের দিকের উইঙ মিররে চোখ রাখল যুবক। রানা তাকাল ওরটার দিকে. এখনও একই আছে দূরত্ব।

'পুলিস হলে নিশ্চই সিগন্যাল দিত এতক্ষণে,' রিকি বলল। 'ওটা আর কেউ হবে। পাবলিক ভেহিকেল।'

'আমারও তাই মনে হয়,' মন্তব্য করল ও।

'আপনি খেয়ে নিন। আমি ড্রাইভ করি কিছুক্ষণ।'

মাথা দোলাল ও। 'খিদে নেই। তবে এক কাপ গরম কফি পাওয়া গেলে না করতাম না।'

'আর পনেরো-বিশ মিনিট পর একটা অল নাইট স্ন্যাক বার পড়বে পথে, চমৎকার কফি বানায় ওরা। মেয়েটাও হয়তো খেতে চাইবে।'

'পাম বীচের আগে ঘুম ভাঙাতে নিষেধ করেছে ও, শোনোনি?' আরেকবার পিছনটা দেখে নিল রানা, আছে গাড়িটা—দূরত্ব আগের মতই।

'মেয়েটার কথা ভাবতে গিয়ে নিনার কথা মনে পড়ে গেল,' বলল রিকি। এখনও মুখ চলছে ওর।

'নিনা কে?'

'কার্লোর আগের ঘরের এক মেয়ে আছে বলেছিলাম না? সেই মেয়ে। বাপের চোখের মণি। মেয়েকে এত ভালবাসে কার্লো, এতই ভালবাসে, মনে হয় নিজের প্রাণটাও বুঝি যে কোন মুহূর্তে নিজ হাতে ওর জন্যে বের করে দিতে পারে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কি করে নিনা?'

'কিছু না। খায়-দায়, ঘুমায়, দু'হাতে টাকা ওড়ায়। ওর বেলায় কোন নিষেধ নেই, মুখ ফুটে চাইলেই হলো। যা চায়, দিয়ে দেয় বাপ। মেয়েটার রূপও তেমনি। এত সুন্দরী মেয়ে দ্বিতীয়টি আমি দেখিনি। আগুনের মত।'

'কেমন ব্যবসা হয় রেস্টের?' জানতে চাইল ও।

'ব্যবসা?' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রিকি। 'সারা ফ্লোরিডায় এত জমজমাট ব্যবসা আর কোন সামার রেস্ট করে না।'

'নিনা তাহলে কার্লোর খুবই প্রিয়?'

'নিশ্চই! তিন বছর আগে দুই মাস্তান নিনার সামান্য ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করেছিল। কার্লো একাই পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দিল ওদের, দু'জনকেই হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে মাসখানেক। পঞ্চাশের মত বয়স কার্লোর, কিন্তু এখনও সিংহের শক্তি গায়ে। কাউকে পরোয়া করে না লোকটা।'

'হুঁম!' আনমনে বলল রানা।

আরও মিনিট পাঁচেক পর সামনে বড় এক নিয়নসাইন দেখতে পেল ও। গাঢ় লাল ও হলুদ আলোয় লেখা: স্ন্যাক্স। টোয়েন্টি ফোর আওয়ার সার্ভিস।

'এই সেই দোকান,' বলল রিকি।

আয়নায় চোখ রেখে পিছনে তাকাল রানা। নেই গাড়িটা। যেমন হঠাৎ উদয় হয়েছিল, তেমনি করেই গায়েব হয়ে গেছে। গাড়ির গতি কমাল ও, চিন্তিত। আলো ঝলমলে স্ন্যাকসের সামনে গোটা চারেক ট্রাক আর ধুলোয় মোড়া কয়েকটা কার দাঁড়িয়ে আছে এক সারিতে। ওগুলোর পিছনে মাসটাঙ দাঁড় করাল। রাস্তায় নেমে

চোখ কুঁচকে পিছনে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। না, নেই গাড়িটা। নিশ্চই কোন ব্যাক রোড ধরে আর কোনদিকে চলে গেছে। মনে মনে হাসল ও, অনর্থক ওটাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিল এতক্ষণ।

ঝুঁকে রিকিকে বের হতে বলল, দু'জনে মিলে একসাথে পা বাড়াল কাফের দিকে। ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে কয়েকজন খদ্দের, খাচ্ছে, পান করছে। সবার চেহারায় দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি। চোখ লাল। প্রায় সবাই মুখ তুলে তাকাল ওদের দিকে।

ঢুলু ঢুলু নিগ্রো বারম্যানকে কফির কথা বলে কাউন্টারের কাছের এক টেবিলে বসে পড়ল ওরা তখনই বাইরে একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। স্বাভাবিক কৌতূহলবশে ঘুরে তাকাল রানা। একটা সাদা মার্সিডিজ এস্এল ওয়ান এইটির ওপর চোখ পড়ল, ওদের পিছনদিক থেকে এসে মাসটাঙের ওপাশে মুহূর্তের জন্যে থামল ওটা মনে হলো। এক মুহূর্তমাত্র, তারপরই শক্তিশালী এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন তুলে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করল।

সন্দেহ করার মত কোন কারণ ঘটেনি, তবু কে যেন ভেতর থেকে ঠেলে তুলে দিল রানাকে। দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে কাফের খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল ও, মার্সিডিজের নাম্বার প্লেট আর স্লাউচ হ্যাট পরা চওড়া কাঁধের চালককে দেখতে পেল পলকের জন্যে। গাড়ির ভেতরে অন্ধকার বলে লোকটার চেহারা দেখার কোন উপায় ছিল না। নাম্বার প্লেটটাও পড়া গেল না।

এই গাড়িটাই কি এতক্ষণ ওদের পিছন পিছন আসছিল? ভাবল ও, লঙরুটের সমস্ত গাড়িই এরকম অল নাইট কাফে পেলে থামে, সেটাই স্বাভাবিক। ওই গাড়িটা কেন থামল না? থামতে গিয়েও কেন চলে গেল?

অস্বস্তি বোধ করল রানা। তাড়াতাড়ি কফি শেষ করে রাস্তায় ফিরে এল। সামনে তাকিয়ে মার্সিডিজের টেইললাইট দেখার চেষ্টা করল। নেই। থাকার কথাও নয়, এতক্ষণে বহুদূরে চলে গেছে ওটা। দরজা খুলে এক পা ভেতরে দিয়ে কি ভেবে থেমে পড়ল ও, ভুরু কুঁচকে উঠল আপনাআপনি। এক সাথে কয়েকটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়।

একটা গাড়ি অনেকক্ষণ থেকে পিছু লেগে ছিল ওদের, কেন? সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মাঝের ব্যবধান ইচ্ছে করেই কমায়নি ওটা, অতিক্রম করেনি ওদের, কেন? এখানে পৌঁছার সামান্য আগে আচমকা গায়েব হয়ে গেল ওটা, পরিবর্তে আরেকটা গাড়ি উদয় হলো এখানে। দুটো গাড়ি, না একটাই? এই গাড়িটার পাশেই কেন থেমেছিল ওটা? নিয়ম অনুযায়ী পিছনে কেন দাঁড়াল না?

এতগুলো কেন-র সাথে মাসটাঙের রহস্যময় চালক মেয়েটির চিন্তা যোগ হয়ে ব্যাপারটাকে রীতিমত ঘোলাটে করে তুলল।

কি ভেবে ক্যাব থেকে পা বের করে নিল ও। 'কি হলো?' ভেতর থেকে বলে উঠল রিকি। 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'এক মিনিট, আসছি।' ক্যারাভ্যানের পিছনে চলে এল রানা, বন্ধ দরজার দিকে তাকাল চোখ কুঁচকে। পরক্ষণে ছোটখাট একটা লাফ দিয়ে উঠল কলজে। কোথায় বন্ধ! দরজা তো খোলা! সামান্য ফাঁক হয়ে আছে।

দ্রুত নিজের চারদিকে এক পলক নজর বুলিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল ও, কেউ নেই আশেপাশে। দরজার হাতল ধরে আস্তে করে টান দিল। নিঃশব্দে খুলে এল পাল্লা। ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কান পেতে কয়েক মুহূর্ত মেয়েটার শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শোনার চেষ্টা করল ও। নেই। আরেকবার চারদিকে চকিত নজর বুলিয়ে পকেট থেকে দামী সিগারেট লাইটারটা বের করে জ্বালল, অন্য হাতে সিগারেট, যেন ওটা ধরাবে বলেই লাইটার জ্বেলেছে।

একটু ঝুঁকে সে আলোয় চট্ করে ক্যারাভ্যানের ভেতরটা দেখে নিল রানা। তারপর ওটা নিভিয়ে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে থাকল জায়গায়। ভেতরের এইমাত্র দেখা দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসছে ওর।

মেয়েটা নেই!

দুই বার্থের একটা শূন্য। অন্যটায় এক পুরুষ মানুষ শুয়ে আছে, তার বিস্ফারিত দু'চোখ ক্যারাভ্যানের সিলিঙে নিবদ্ধ, হাঁ করা মুখের ফাঁক দিয়ে দাঁত বেরিয়ে আছে।

মানুষটা যেই হোক, মৃত। কোন সন্দেহ নেই।

সাবধানে আরেকবার ভেতরটা দেখে নিল ও পুরো নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। একই আছে দৃশ্যটা, তবে এবার নতুন একটা ব্যাপার চোখে পড়েছে রানার—মানুষটা যথেষ্ট বয়স্ক। চোখমুখের চামড়া কোঁচকানো, সারা গালে কয়েকদিন শেভ না করা দাড়ি গিজগিজ করছে।

কানের কাছেই রিকির গলা শুনে চমকে গেল ও। 'এখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন?'

'কিছু না,' জোর করে গলার স্বর সংযত রাখল রানা। 'চলো।'

'ক্যারাভ্যানের দরজা খোলা মনে হচ্ছে?'

'ও কিছু নয়, এসো,' তাড়া লাগাল ও। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে।' দরজা ঠেলে দিয়ে বাইরের লোহার হুড়কো লাগিয়ে দিল।

কয়েক সেকেন্ড পর স্টার্ট নিল মাসটাঙ, লাইন থেকে বেরিয়ে এসে সগর্জনে ছুটল। উত্তেজিত অবস্থায় প্রথমে সত্তরে গতি তুলে ফেলেছিল রানা, অবশ্য একটু পর ভুল বুঝতে পেরে স্বাভাবিকে নামিয়ে আনল। ঘড়ি দেখল, প্রায় তিনটে।

'পাম বীচ পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে?' প্রশ্ন করল ও।

'এই গতিতে চললে ঘণ্টা দেড়েক।'

'কিন্তু এটায় চড়ে অতদূর যেতে পারছি না আমরা, রিকি।'

ওর দিকে ঘুরল যুবক। 'কেন?'

'ঝামেলা ঘটে গেছে,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'মানে?'

বুড়ো আঙুল বাঁকা করে ঘাড়ের ওপর দিয়ে ক্যারাভ্যান দেখাল ও। 'ওটার মধ্যে একটা লাশ আছে।'

'অ্যাঁ!!!' ভীষণভাবে চমকে উঠল রিকি, ক্যাবের নিচু ছাদে মাথা ঠুকে গেল ওর। 'কি বললেন, মারা গেছে? মেয়েটা…

'মেয়েটা নয়, আর কেউ। এক বুড়ো। মেয়েটা ওই লাশ আমাদের ঘাড়ে

গছিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছে, আমরা যখন কফি খাচ্ছি, তখন।'

হাঁ হয়ে গেল রিকি। পলক পড়ছে না চোখে। 'কি বলছেন?'

'ঠিকই বলছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'সন্দেহ হতে ভেতরটা দেখতে গিয়ে দেখি এই কাণ্ড।'

'মেয়েটা··· কোঁৎ করে বড় এক ঢোক গিলল রিকি। 'মেয়েটা কখন গেল? কিভাবে গেল?'

'সাদা গাড়িটায় চড়ে। এখন মনে হচ্ছে আমরা পথে থামব, এই সুযোগের অপেক্ষায়ই ওটা তখন থেকে পিছু লেগে ছিল আমাদের।'

কথা বলার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেল রিকির, দেখতে দেখতে মুখ শুকিয়ে এতটুকুন হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেল সে। বহু দূরাগত, ফিসফিসে গলায় প্রশ্ন করল, 'এখন কি হবে?'

'রাখো, ভাবতে দাও। সামনে কোথাও আরেকবার দাঁড়াতে হবে, ভালমত চেক করতে হবে ক্যারাভ্যান।' চেনা নেই, জানা নেই, কোথাকার কোন্ এক মেয়ে ওদের ঘাড়ে লাশের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে পালাবে কেন? ভাবল ও। ওরা দু'জন ফাঁসলে তার কি লাভ? নাকি যোগাযোগটা কাকতালীয়? ঘটনাচক্রে জড়িয়ে গেছে ওরা দুর্ভাগ্যবশত?

নিজেকে বাঁচাতে অন্যের ঘাড়ে লাশ চাপিয়ে দিয়ে সটকে পড়ার প্ল্যান করেই পথে নেমেছিল রহস্যময় মেয়েটা? তার কি দরকার ছিল? নির্জন কোন জায়গায় ওটাকে মাটি চাপা দিয়ে রাখলেই তো ঝামেলা চুকে যেত। মার্সিডিজটার কথা ভাবতে গিয়ে বুঝল প্রথম সন্দেহটাই ঠিক। হতে পারে রানা ও রিকি কাকতালীয়ভাবে ফেঁসে গেছে, কিন্তু মেয়েটা প্ল্যান করেই এসেছিল। কোন সন্দেহ নেই তাতে। পিছনের গাড়িটাই তার সাক্ষী।

কিন্তু পিছনের মানুষটা কে? জোয়েল ব্লাচ না তো?

ঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে তিনটা। পথের পাশে উঁচু এক ঢিবির আড়ালে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল ও। ব্যাগ থেকে নিজের এমার্জেন্সি পেন্সিল টর্চটা বের করে ক্যারাভ্যানে এসে উঠল। রিকিও পিছন পিছন এল। ভয়ে, আশঙ্কায় একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেছে ছেলেটা। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে মৃতের মুখের দিকে। ওকে ভেতরের কিছু স্পর্শ না করার জন্যে সতর্ক করল রানা।

তারপর সময় নিয়ে দেহটা পরীক্ষা করতে লেগে গেল। ষাটের মত বয়স হবে মানুষটার। দুর্বল স্বাস্থ্য। এক পায়ে জুতো মোজা নেই, হাঁটু পর্যন্ত পোড়া পা-টা। প্রায় কয়লা হয়ে আছে। নির্যাতন করে মারা হয়েছে লোকটাকে। কেন? পরিচয় জানার আশায় তার সবগুলো পকেট হাতড়ে দেখল রানা, নেই কিছু। কাগজের একটা টুকরোও নেই। কোটের লেবেলে খদ্দেরের নাম লেখা থাকতে পারে ভেবে উল্টেপাল্টে দেখল, সেটাও নেই। লেবেল টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

মৃতের আর কোথাও আঘাত করা হয়েছে কি না যত্নের সাথে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল এবার রানা। পা থেকে দেখতে দেখতে ওপরে উঠতে থাকল। নেই। মাথায়? তার চুলের মধ্যে সাবধানে আঙুল চালিয়ে দিল, এখানে-ওখানে

বোলাতে গিয়ে তালুর ওপর এসে স্থির হয়ে গেল। শক্ত, লম্বা কি যেন একটা ঠেকেছে—চামড়ার নিচে।

চামড়া? ঝুঁকে ভাল করে নজর বোলাতে গিয়ে বুঝল লোকটার চুল নকল। মাথায় ওটা পরচুলা। আবার তালুতে হাত বোলাল ও। আছে জিনিসটা। কি হতে পারে? কপালের দিকের একগোছা চুল দু'আঙুলে ধরে আলতো করে টান দিল রানা, মৃদু চড়চড় আওয়াজ তুলে আলগা হয়ে গেল পরচুলার সামনের অর্ধেক।

জিনিসটা দেখতে পেল ও আলোয় চিক্ চিক্ করছে। একটা চাবি। পরচুলার ভেতরের দিকে স্কচ টেপ দিয়ে জুড়ে রাখা আছে।

'কি!' অস্ফুটে বলে উঠল রিকি।

উত্তর দিল না রানা। টর্চ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে অন্য হাতটাও কাজে লাগাল, টেপ তুলে খুব যত্নের সাথে বের করে আনল চকচকে স্টীলের চাবিটা। গোল একটা রিঙের সাথে ঝুলছে। চাবির শ্যাফটে এম্বস করা আছে কিছু। পড়ল ও: পাম বীচ এয়ারপোর্ট। লকার ৩৮৮।

চাউনি সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। এই জিনিসটাই খুঁজছিল এর কাছে খুনী? এটার জন্যেই মৃত্যু হয়েছে বৃদ্ধের? কি আছে ৩৮৮ নম্বর লকারে?

পরচুলা জায়গামত বসিয়ে চাবিটা পকেটে পুরল মাসুদ রানা। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে।

চার

ক্যারাভ্যান থেকে নেমে এল ওরা। রানা বাইরে থেকে হুড়কো লাগিয়ে দিল, তারপর দরজা ও হুড়কোর যেখানে যেখানে স্পর্শ করেছে, জায়গাগুলো রুমাল দিয়ে খুব যত্নের সাথে ডলে ডলে মুছল। যখন মনে হলো কাজটা ঠিকমত হয়েছে, থামল ও। তফাতে দাঁড়িয়ে ফ্যাকাসে মুখে ওর কাজ দেখল রিকি। বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করছে ওর।

'এখন কি হবে?' কাঁপা, আতঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করল সে।

'সাহস রাখো,' বলল রানা। 'কিছুই হবে না।'

'কিন্তু যখন পুলিস এসে...'

হাত তুলে বাধা দিল ও। 'সে সব আমাকে ভাবতে দাও। আমি তোমার সঙ্গে আছি, ঘাবড়িয়ো না।'

'এইবার ফেঁসেছি জন্মের মত,' বিড়বিড় করে বলল রিকি। 'আর রক্ষে নেই। যদি পুলিস টের পায়...'

ওর কাঁধে হাত রাখল রানা। 'বলেছি তো সাহস রাখো। এই গাড়ির সাথে আমরা কোনভাবে জড়িত আছি, পুলিস যাতে তা টের না পায় সেই ব্যবস্থাই করছি আমি। চলো, গাড়িতে বোসো।'

রিকিকে বসিয়ে ওর দিকের বাইরের ডোর হ্যান্ডেল, জানালার নিচের প্রান্ত ও

র আশপাশটাও একই রকম যত্নের সাথে মুছল রানা, নিজের আসনে বসে ড্যাশবোর্ডের পুরোটা কয়েকবার করে মুছল। তারপর রিকির ভেতরের ডোর হ্যান্ডেল। 'ভাল করে ভেবে বলো, ভেতরের আর কোন্ কোন্ জায়গায় হাত দিয়েছ তুমি,' ওকে বলল রানা।

'শুধু গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট খুলেছিলাম কাগজপত্র বের করার জন্যে। আর কোথাও না।'

'আরেকবার ভেবে দেখো।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। 'আর কোথাও না।'

'শিওর?'

'শিওর।'

গ্লোভ কম্পার্টমেন্টের ফোল্ডারটা বের করে ভেতরের কাগজগুলো ডলে ডলে মুছল রানা, তারপর ফোল্ডার। কম্পার্টমেন্টের ভেতরটাও মুছল অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে। আঙুলের মাথায় রুমাল পেঁচিয়ে বন্ধ করে দিল ওটা, আরেকবার মুছল ডালা। এরপর নিজের দিকের দুই ডোর হ্যান্ডেলে লেগে থাকা ছাপ নিশ্চিহ্ন করার কাজে মন দিল।

বাকি রইল কেবল স্টিয়ারিঙ হুইল আর গিয়ার স্টিক। ও দুটো পরে করলেও চলবে। সিগারেট ধরিয়ে রিকির দিকে মন দিল রানা। 'তখন বলেছ মেয়েটার গলা তোমার চেনা লেগেছে। একটু গভীরভাবে ভেবে দেখো তো কার মত মনে হয়েছে!'

'আমি শিওর নই,' বিভ্রান্ত চোখে তাকাল রিকি। 'মানে...'

'শিওর একেবারে হতেই হবে বলছি না, বলছি চেষ্টা করো।'

কয়েক মুহূর্ত চোখ মুদে বসে থাকল রিকি। মাথা নড়ছে—মনে মনে নিজের সাথে কথা বলছে। 'সরি,' চোখ মেলল ও। 'এই মনে হচ্ছে নিনার মত, অনেকটা। এই মনে হচ্ছে তা নয়, ভুল শুনেছি।'

'ঠিক আছে। এবার শোনো...'

মূল সাগরকে স্যান্ড ব্যাঙ্ক দিয়ে ঘিরে তৈরি খুদে উপসাগরের তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে পাম বীচ সামার রেস্ট। একেবারে আদর্শ জায়গা। বালির ভেড়িবাঁধের ওপাশে খোলা আটলান্টিক। রেস্টের চারদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র পাম, সাইপ্রেস আর স্পাইডার অর্কিড। চমৎকার ছায়াঘেরা পরিবেশ।

কাঠের তৈরি লম্বা, একতলা বিল্ডিঙ রেস্ট। অর্ধেকটা কাঁচঘেরা, এয়ারকন্ডিশন্ড, বাকি অর্ধেক খোলামেলা। রেস্টের এক মাথায়, বীচের সামান্য দূরে, বালিতে থাক কেটে উপসাগরের টলটলে পানিতে নামার ব্যবস্থা আছে।

বীচে আলাদা বার আছে। বড় বড় সান আমব্রেলা ও ম্যাট্রেস আছে, সব দূরে দূরে পাতা, কারও প্রাইভেসী যাতে বিঘ্নিত না হয়, সে জন্যে এ ব্যবস্থা।

চারদিকে নজর বুলিয়ে বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। সবকিছুতেই আভিজাত্য আর বিলাসের ছড়াছড়ি। রিকির বাবার পছন্দ ছিল, স্বীকার না করে পারল না ও। একই সাথে আফসোসও হলো এটার মালিকানা থেকে কত অন্যায়ভাবে তার ছেলেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ভেবে। ঘড়ি দেখল ও—আটটা।

'কার্লো বোধহয় নেই,' বলল রিকি। 'ভোরে উঠেই বাজারে চলে যায়, ফেরে দশটার দিকে।'

লম্বা পথ হেঁটে আসায় ক্লান্ত, ধুলোবালিতে একাকার রিকির শুকনো মুখের দিকে তাকাল রানা। 'যা বলেছি খেয়াল থাকে যেন। ইনোসেন্ট ভাব করবে, মুখ ফসকেও যেন একটা বেফাঁস কথা বের না হয়।'

'হবে না,' চাপা গলায় বলল সে।

সামনের লম্বা, খোলা বারান্দার তাল কাঠের ছাউনির নিচে এসে দাঁড়াল ওরা। আশেপাশে কাউকে নজরে পড়ল না। 'মানুষজন কোথায় সব?' বলল রানা।

'গেস্টরা এ মুহূর্তে নেই কেউ, কাল-পরশুর মধ্যে আসতে শুরু করবে। স্টাফরা আছে, আসুন। রেস্টুরেন্টে যাই আগে।'

ঘুরে ওকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল রানা, এই সময় বারান্দায় এসে দাঁড়াল ছোটখাট, বয়স্ক এক নিগ্রো। অ্যাপ্রন পরে আছে। 'হ্যালো, রিকি!' মুখে হাসি ফুটিয়ে এগিয়ে এল সে। 'কখন এলে? এ কি! মুখে কি হয়েছে?'

'ও কিছু নয়,' তার বাড়ানো হাত ধরে ঝাঁকাল ও। 'সামান্য চোট লেগেছে। কার্লো ফিরেছে?'

'হ্যাঁ, কালই ফিরেছে।' ঘুরে রানাকে দেখল লোকটা। ও-ও দেখছে। বুঝে নিয়েছে এই লোকই জনি।

'এঁর কথাই কাল ফোনে বলেছিলাম, জনি,' রিকি বলল। 'মিস্টার মাসুদ রানা। সুইমিঙে ইউরোপীয়ান চ্যাম্প।'

লোকটার সাথে সবে হাত মিলিয়েছে রানা, এমন সময় একটা বুইক এস্টেট ওয়াগন এসে দাঁড়াল বারান্দার আরেক মাথায়। আরোহী একজনই, প্রায় সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ এক গরিলা। সারা গায়ে কালো লোম। চাঁদের মত গোল মুখ। দেখেই বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তি ধরে মানুষটা। কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ। ক্যাব থেকে নেমে দড়াম করে দরজা লাগাল সে, থপ্ থপ্ পা ফেলে এগিয়ে এল ওদের দিকে। দূর থেকে চোখ কোঁচকাল রিকিকে দেখে, মনে হলো যেন বিরক্ত কোন কারণে। 'কার্লো!' চাপা গলায় রানাকে বলল জনি।

ওদের সামনে এসে থেমে পড়ল লোকটা। পালা করে রিকি ও রানাকে দেখতে লাগল। 'এত দেরি হলো যে পৌঁছতে?' রিকির উদ্দেশে প্রশ্ন করল সে। চেহারা নাখোশ।

'এক ট্রাকে লিফট নিয়েছিলাম,' মিনমিন করে বলল যুবক। 'পথে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল।'

আরও কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কার্লো, মনে হলো ভাবছে কিছু। 'তারপর?'

'নেমে আরেকটায় উঠলাম, টাউনের দশ মাইল আগে টায়ার বার্স্ট করে ফেঁসে গেল ওটাও। হেঁটে এসেছি বাকি পথ।'

কার্লোকে রানার মুখোমুখি হতে দেখে এক পা এগোল ও। পরিচয় করিয়ে দিল। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল গরিলা ওর চোখে চোখ রেখে। রানাও তাকিয়ে থাকল একভাবে। শুকনো দৃষ্টিতে পরস্পরকে মাপল যেন ওরা।

হঠাৎ করে মৃদু হাসি ফুটল কার্লোর মুখে। 'সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন, অ্যাঁ! ইউরোপ? কোন সালের?'

'বিরানব্বই।'

'গুড! গুড! আমি আপনার মতই একজনকে খুঁজছিলাম।' নিজের মস্ত থাবায় ওর ডান হাত মুঠো করে ধরল লোকটা। 'রেগুলার প্র্যাকটিস করেন তো? স্পীড...'

'খুব ওস্তাদ সুইমার,' বাধা দিয়ে বলে উঠল রিকি। 'কাল নিজ চোখে দেখেছি আমি ওঁর সাঁতার।'

শীতল চোখে দেখল ওকে কার্লো। গম্ভীর। 'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি। কথার মাঝে কথা বলা পছন্দ করি না আমি, তুমি জানো।'

চেহারা কালো হয়ে গেল যুবকের। 'সরি।'

'ইউ নো,' রানার দিকে ফিরল গরিলা। সুইচ টিপে হাসি অন করে দিয়েছে। 'আমার এখানে পয়সাওয়ালাদের ছেলেমেয়েরা আসে, লেগুনে সাঁতার শিখতে চায়। কিন্তু লাইফগার্ড নেই বলে ওদের সুযোগ দিতে পারছি না, লাভজনক একটা সাইড ব্যবসা উপযুক্ত ট্রেনারের অভাবে চালু করতে পারছি না। আপনি যদি কাজটা করতে পারেন, সপ্তায় দুশো ডলার দেব আমি। থাকা-খাওয়া ফ্রী। চলবে এতে?'

'আমি বেরিয়েছি ঘুরে বেড়াতে,' রানা শ্রাগ করল। 'তার ফাঁকে যদি কিছু রোজগার হয়, মন্দ কি?'

'থাকেন কোথায়?'

'নির্দিষ্ট কোথাও নয়। ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াই, যখন যে কাজ পছন্দ হয়, লেগে যাই।'

'তার মানে কোন বন্ধন নেই?'

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল ও। 'নেই।'

'এর সাথে পরিচয় কি করে?' ইঙ্গিতে রিকিকে দেখাল কার্লো।

সংক্ষেপে বলল রানা, সত্যি ঘটনাই বলল। ঘুরে রিকির গালের-মাথার প্লাস্টার দেখল কার্লো, ভাবখানা যেন এই প্রথম দেখল। বিন্দুমাত্র ভাবান্তর ঘটল না চেহারায়। কোন মন্তব্যও করল না। 'তাহলে কাজের কথা পাকা?' রানাকে প্রশ্ন করল সে।

'পাকা

'গুড,' হাসল কার্লো। নতুন করে আরেক দফা রানার আপাদমস্তক চোখ বোলাল। 'রিকি, আজ থেকে ইনি তোমার পাশের রূমে থাকবেন, রূমটা গুছিয়ে দাও। দু'চারদিন বিশ্রাম করুন, মিস্টার রানা। ঘুরে-ফিরে বেড়ান, কেমন?'

'বেশ।'

হাত বাড়িয়ে ওর বাইসেপ চেপে ধরল কার্লো। চেহারায় প্রশংসা ফুটল। 'বাহ!' অনেকটা নিজেকেই বলল সে। 'দারুণ!' কবজি দেখল। 'বক্সিঙে কেমন?'

'মোটামুটি,' বলল রানা।

'দেখে তো মনে হয় বেশ ভাল! আমি বক্সিঙে এক্স মায়ামি চ্যাম্প।'

'শুনেছি।'

'কার্লো বোধহয় নেই,' বলল রিকি। 'ভোরে উঠেই বাজারে চলে যায়, ফেরে দশটার দিকে।'

লম্বা পথ হেঁটে আসায় ক্লান্ত, ধুলোবালিতে একাকার রিকির শুকনো মুখের দিকে তাকাল রানা। 'যা বলেছি খেয়াল থাকে যেন। ইনোসেন্ট ভাব করবে, মুখ ফসকেও যেন একটা বেফাঁস কথা বের না হয়।'

'হবে না,' চাপা গলায় বলল সে।

সামনের লম্বা, খোলা বারান্দার তাল কাঠের ছাউনির নিচে এসে দাঁড়াল ওরা। আশেপাশে কাউকে নজরে পড়ল না। 'মানুষজন কোথায় সব?' বলল রানা।

'গেস্টরা এ মুহূর্তে নেই কেউ, কাল-পরশুর মধ্যে আসতে শুরু করবে। স্টাফরা আছে, আসুন। রেস্টুরেন্টে যাই আগে।'

ঘুরে ওকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল রানা, এই সময় বারান্দায় এসে দাঁড়াল ছোটখাট, বয়স্ক এক নিগ্রো। অ্যাপ্রন পরে আছে। 'হ্যালো, রিকি!' মুখে হাসি ফুটিয়ে এগিয়ে এল সে। 'কখন এলে? এ কি! মুখে কি হয়েছে?'

'ও কিছু নয়,' তার বাড়ানো হাত ধরে ঝাঁকাল ও। 'সামান্য চোট লেগেছে। কার্লো ফিরেছে?'

'হ্যাঁ, কালই ফিরেছে।' ঘুরে রানাকে দেখল লোকটা। ও-ও দেখছে। বুঝে নিয়েছে এই লোকই জনি।

'এঁর কথাই কাল ফোনে বলেছিলাম, জনি,' রিকি বলল। 'মিস্টার মাসুদ রানা। সুইমিঙে ইউরোপীয়ান চ্যাম্প।'

লোকটার সাথে সবে হাত মিলিয়েছে রানা, এমন সময় একটা বুইক এস্টেট ওয়াগন এসে দাঁড়াল বারান্দার আরেক মাথায়। আরোহী একজনই, প্রায় সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ এক গরিলা। সারা গায়ে কালো লোম। চাঁদের মত গোল মুখ। দেখেই বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তি ধরে মানুষটা। কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ। ক্যাব থেকে নেমে দড়াম করে দরজা লাগাল সে, থপ্ থপ্ পা ফেলে এগিয়ে এল ওদের দিকে। দূর থেকে চোখ কোঁচকাল রিকিকে দেখে, মনে হলো যেন বিরক্ত কোন কারণে। 'কার্লো!' চাপা গলায় রানাকে বলল জনি।

ওদের সামনে এসে থেমে পড়ল লোকটা। পালা করে রিকি ও রানাকে দেখতে লাগল। 'এত দেরি হলো যে পৌঁছতে?' রিকির উদ্দেশে প্রশ্ন করল সে। চেহারা নাখোশ।

'এক ট্রাকে লিফট নিয়েছিলাম,' মিনমিন করে বলল যুবক। 'পথে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল।'

আরও কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কার্লো, মনে হলো ভাবছে কিছু। 'তারপর?'

'নেমে আরেকটায় উঠলাম, টাউনের দশ মাইল আগে টায়ার বার্স্ট করে ফেঁসে গেল ওটাও। হেঁটে এসেছি বাকি পথ।'

কার্লোকে রানার মুখোমুখি হতে দেখে এক পা এগোল ও। পরিচয় করিয়ে দিল। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল গরিলা ওর চোখে চোখ রেখে। রানাও তাকিয়ে থাকল একভাবে। শুকনো দৃষ্টিতে পরস্পরকে মাপল যেন ওরা।

হঠাৎ করে মৃদু হাসি ফুটল কার্লোর মুখে। 'সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন, অ্যাঁ! ইউরোপ? কোন সালের?'

'বিরানব্বই।'

'গুড! গুড! আমি আপনার মতই একজনকে খুঁজছিলাম।' নিজের মস্ত থাবায় ওর ডান হাত মুঠো করে ধরল লোকটা। 'রেগুলার প্র্যাকটিস করেন তো? স্পীড...'

'খুব ওস্তাদ সুইমার,' বাধা দিয়ে বলে উঠল রিকি। 'কাল নিজ চোখে দেখেছি আমি ওঁর সাঁতার।'

শীতল চোখে দেখল ওকে কার্লো। গম্ভীর। 'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি। কথার মাঝে কথা বলা পছন্দ করি না আমি, তুমি জানো।'

চেহারা কালো হয়ে গেল যুবকের। 'সরি।'

'ইউ নো,' রানার দিকে ফিরল গরিলা। সুইচ টিপে হাসি অন করে দিয়েছে। 'আমার এখানে পয়সাওয়ালাদের ছেলেমেয়েরা আসে, লেগুনে সাঁতার শিখতে চায়। কিন্তু লাইফগার্ড নেই বলে ওদের সুযোগ দিতে পারছি না, লাভজনক একটা সাইড ব্যবসা উপযুক্ত ট্রেনারের অভাবে চালু করতে পারছি না। আপনি যদি কাজটা করতে পারেন, সপ্তায় দুশো ডলার দেব আমি। থাকা-খাওয়া ফ্রী। চলবে এতে?'

'আমি বেরিয়েছি ঘুরে বেড়াতে,' রানা শ্রাগ করল। 'তার ফাঁকে যদি কিছু রোজগার হয়, মন্দ কি?'

'থাকেন কোথায়?'

'নির্দিষ্ট কোথাও নয়। ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াই, যখন যে কাজ পছন্দ হয়, লেগে যাই।'

'তার মানে কোন বন্ধন নেই?'

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল ও। 'নেই।'

'এর সাথে পরিচয় কি করে?' ইঙ্গিতে রিকিকে দেখাল কার্লো।

সংক্ষেপে বলল রানা, সত্যি ঘটনাই বলল। ঘুরে রিকির গালের-মাথার প্লাস্টার দেখল কার্লো, ভাবখানা যেন এই প্রথম দেখল। বিন্দুমাত্র ভাবান্তর ঘটল না চেহারায়। কোন মন্তব্যও করল না। 'তাহলে কাজের কথা পাকা?' রানাকে প্রশ্ন করল সে।

'পাকা।'

'গুড,' হাসল কার্লো। নতুন করে আরেক দফা রানার আপাদমস্তক চোখ বোলাল। 'রিকি, আজ থেকে ইনি তোমার পাশের রূমে থাকবেন, রূমটা গুছিয়ে দাও। দু'চারদিন বিশ্রাম করুন, মিস্টার রানা। ঘুরে-ফিরে বেড়ান, কেমন?'

'বেশ।'

হাত বাড়িয়ে ওর বাইসেপ চেপে ধরল কার্লো। চেহারায় প্রশংসা ফুটল। 'বাহ!' অনেকটা নিজেকেই বলল সে। 'দারুণ!' কব্জি দেখল। 'বক্সিঙে কেমন?'

'মোটামুটি,' বলল রানা।

'দেখে তো মনে হয় বেশ ভাল! আমি বক্সিঙে এক্স মায়ামি চ্যাম্প।'

'শুনেছি।'

কথাটা পুরো শেষ করতে পারল না ও, ঘুসিটা আসছে দেখে চট্ করে সরে গেল। রানার বুক সই করে মেরেছিল কার্লো—খাটো, খুবই দ্রুত এবং ভয়ঙ্কর মার। কিন্তু ও সময়মত সরে যেতে বাঁ বুকের রিব আর বাহুর ভেতরের অংশে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেল ঘুসিটা, ফলে সামনে খানিকটা ঝুঁকে এল কার্লো। সুযোগটা কাজে লাগাল রানা, বাঁ হাতে একটা শর্ট-আর্ম জ্যাব ঝেড়ে দিল লোকটার প্রকাণ্ড চোয়ালে। এত জোরে ঝাঁকি খেলো হাত যে মনে হলো বুঝি সেফের পুরু দেয়ালে মেরে বসেছে ও ভুলে।

তবে যা চেয়েছিল, সে কাজ হয়েছে। আঘাতের ধাক্কায় দু'পা পিছিয়ে গেল গরিলা, পিট্পিট্ করে তাকাতে লাগল। 'স্মার্ট বয়,' সামলে নিয়ে বলল সে। 'দ্যাটস ভেরি স্মার্ট।'

এগিয়ে এসে ওর বাহুতে হাত বোলাল। 'সত্যি, দারুণ জ্যাব!'

কিন্তু প্রশংসায় ভবি ভুলবার নয়। লোকটার মতলব সুবিধের নয় ঠিকই বুঝেছিল রানা, তাই সময়মত মাথা এক ঝটকায় সরিয়ে নিতে পারল তার পাঞ্চের পথ থেকে। ওটার গতি দেখে বুঝল, লাগলে নিঃসন্দেহে খবর হয়ে যেত। জবাব পৌঁছে দিতে দেরি হলো না রানার, কার্লোর বুকের ওপর মারল ও দড়াম করে। এবারও দু'পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো লোকটা। ওদিকে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে রিকি। চোখ কপালে তুলে কার্লোকে দেখছে। দম বন্ধ। জনিরও একই অবস্থা। দু'চোখে রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে রানাকে দেখছে লোকটা।

'ভেরি ভেরি স্মার্ট বয়,' দাঁত কেলিয়ে হাসল কার্লো।

'আমি দুঃখিত, মিস্টার কার্লো,' বলল রানা।

'দুঃখিত কেন?' এগিয়ে এল সে। 'ওসব ফর্ম্যালিটির কোন প্রয়োজন নেই। আপনার ফাস্ট মুভমেন্ট দেখে আমি সত্যি খুশি। তবে এও সত্যি, সময় মত যদি মুখ সরিয়ে না নিতেন আপনি, অন্তত এক সপ্তা অজ্ঞান হয়ে থাকতেন।'

'সত্যি?' সিরিয়াস হয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'তাহলে দয়া করে আমার দিকে আর পাঞ্চ ছুঁড়বেন না, মিস্টার কার্লো। নার্ভাস হয়ে পড়তে পারি আমি, হয়তো পরেরবার ঘুসির গতি কমাতে পারব না।'

'আচ্ছা!' হাসি বেঁকে গেল গরিলার 'আপনি তাহলে ঘুসির গতি কমিয়ে দিয়েছিলেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ' অতিরিক্ত জোরে আঘাত করতে চাইনি আমি

তার এবারের পাঞ্চ আ রেকটু হলে প্রায় পেড়েই ফেলেছিল রানাকে। গালে ঘষা খেয়ে উঠে গিয়ে মাথ পাশে আঘাত করল ঘুসিটা, অনেক কষ্টে নিজেকে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে ঠেকাল ও। কিন্তু কার্লো ব্যর্থ হলো। পাল্টা ঘুসিটা এবার গায়ের জোরেই মেরেছে রানা ঝাল মেটাতে। ঠিক লোকটার কানের নিচে।

কয়েক হাত উড়ে গিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল গরিলা, পড়েই থাকল ডাঙায় উঠে পড়া তিমির মত। চোখ খোলা, অথচ কিছু দেখছে না। শিথিল দু'হাত পড়ে আছে দেহের পাশে।

'জুডাস!' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল জনি। 'এ কাকে নিয়ে এসেছ, রিকি? পাগল নাকি লোকটা?' কড়া চোখে রানাকে দেখল সে। দ্রুত কার্লোর দিকে এগোল।

'কি করলেন?' ফিস্‌ফিস্ করে বলল রিকি। দু'চোখ কোটর ছেড়ে এখনই ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন ওর।

ছেলেটাকে আশ্বস্ত করতে চাইল রানা। 'ঘাবড়াবার মত কিছু ঘটেনি। এখনই ঠিক হয়ে যাবে কার্লো।'

কয়েক মুহূর্ত পর লোকটার দৃষ্টিতে প্রাণ ফিরে এসেছে দেখে এগোল ও। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল গরিলা, খানিকপর চোখ রগড়ে দৃষ্টি পরিষ্কার করল। ধীরে ধীরে মুখে হাসি ফুটল তার—নিষ্প্রাণ হাসি। হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে তুলল রানা। দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকাল সে কিছুক্ষণ জোরে জোরে। 'এত শক্ত পাঞ্চ জীবনে এই প্রথম খেলাম,' গাল ডলতে লাগল। 'ওকে, মিস্টার রানা। আর নয়। এখন থেকে আমরা দু'জন বন্ধু। বেতন কত বলেছি তখন, দুশো? শেষ পাঞ্চটার সম্মানে আরও পঞ্চাশ বাড়িয়ে দিলাম। আড়াইশো, ওকে?'

শ্রাগ করল ও।

'রিকি! এঁকে এঁর রুমে নিয়ে যাও।' ঘুরে দাঁড়াল কার্লো, সামান্য টলোমলো পায়ে গাড়ির দিকে এগোল। 'আমি বাজার থেকে আসছি।' তার বুইক এস্টেট ওয়াগন রওনা না হওয়া পর্যন্ত নীরবে দাঁড়িয়ে রইল অন্য তিনজন।

ওটা চোখের আড়ালে চলে যেতে রানার দিকে ফিরল রিকি। চেহারা এমন হয়েছে যেন প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। 'চলুন, আপনাকে রুমে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'চলো।' ওকে অনুসরণ করে চলল রানা।

কিচেন থেকে নাস্তা খেয়ে নিজের রুমে ফিরে এল রানা। মূল রেস্ট বিল্ডিঙের পিছনে ছোট এক কাঠের বিল্ডিঙ, এক সারিতে চারটা একই ধরনের রুম তাতে। সুন্দর করে ছাঁটা এক মানুষ সমান উঁচু লতাপাতা দিয়ে রেস্ট থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে ওটাকে। স্টাফ কোয়ার্টার। বীচের দিকের কর্নার রুমটা ওর।

একটা বিছানা, দুটো চেয়ার, একটা ছোট টেবিল, একটা ক্লজিট এবং একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার, এই হচ্ছে রুমের আসবাব। ঘরটা ছায়ায় বলে বেশ ঠাণ্ডা পরিবেশ মাথার দিকে সরু একটা দরজা, এ ছাড়া পুরো দেয়ালজোড়া বড় জানালা, খুললে চমৎকার বাতাস ঢোকে। দরজাটা বাথরুমের।

একটা চেয়ার জানালার কাছে টেনে এনে বসল রানা। সিগারেট ধরিয়ে আনমনে টানতে লাগল। ফুরফুরে দখিনা বাতাসে চোখ বুজে আসতে চাইছে, একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু মাথায় এক বোঝা চিন্তা, কাজেই ঘুম আসবে না, জানে ও।

পাম বীচের দশ মাইল আগে মাসটাঙ ছেড়ে এসেছে রানা রাতের অন্ধকারে। ক্যারাভ্যান রেখে এসেছে আরও পাঁচ মাইল আগে। মৃত লোকটার দেহ ওখানেই বালির নিচে পুঁতে রেখে এসেছে। এমনভাবে সব করেছে, যাতে কোনটাই উদ্ধার করতে বিশেষ বেগ পেতে না হয় পুলিসকে। লাশ, ক্যারাভ্যান, কার, সব সহজেই ট্রেস করতে পারে। সেট আপটার সাথে ওরা কাকতালীয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছে, নাকি ভেতরে আর কিছু আছে, জানে না রানা। জানার উপায়ও ছিল না।

মন বলেছে, ওগুলো নিয়ে শহরের বেশি কাছে যাওয়া উচিত হবে না। তাতে

বিপদে পড়ার আশঙ্কা আছে, তাই ছেড়ে এসেছে। বাকি পথ অনেকটা ঘুরে সেকেন্ডারি রোড ধরে হেঁটে পৌঁছেছে ওরা শহরে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে রানা জানে, এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে তার থেকে যত দ্রুত সম্ভব দূরে সরে যাওয়া উচিত। তাতে ফল ভাল ছাড়া মন্দ হয় না। এই অতিরিক্ত সতর্কতার জন্যে অতীতে অনেকবার, অনেক বড় ঝামেলা থেকে নিজেকে নিরাপদ করতে পেরেছে ও।

শুভ-অশুভ নির্ধারণে রানার ষষ্ঠ ইন্দ্রীয়ের ক্ষমতা অতুলনীয়। রীতিমত শ্রদ্ধা করে ও ক্ষমতাটাকে। তার নির্দেশ বিনা দ্বিধায় মেনে চলে। কাল রাতে যখন সাদা মার্সিডিজটার রহস্যময় আচরণ চোখে পড়েছে, খুঁজতে গিয়ে রহস্যময় মেয়েটিকে পায়নি, তখনই ভেতরে বিপদ সঙ্কেত বাজিয়ে দিয়েছে ওর অতিন্দ্রীয় ক্ষমতা, সতর্ক হতে বলেছে। হয়েছে রানা।

নিজেদের ঝামেলামুক্ত রাখতে সহজাত বিচার-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সরে পড়েছে গাড়ি ছেড়ে। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে পুলিস ওগুলো উদ্ধার করতে কত সময় নেয়, এবং ঝোলা থেকে অপ্রত্যাশিত কিছু বের হয় কি না। পাম বীচে ও একেবারেই আগন্তুক, কারও সাথে চেনা-জানা নেই। ঝামেলা কিছু ঘটে গেলে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে ঠিকই ও, কিন্তু তাতেও ঝামেলা কম হবে না। তাই কোনরকম ঝুঁকি নেয়নি। যে পথ সহজ, নিরাপদ, সেটাই বেছে নিতে হয়েছে ওকে ইচ্ছে না থাকলেও।

রানা একশো ভাগ নিশ্চিত, পিছনে কোন সূত্র রেখে আসেনি ও। মৃতদেহ, গাড়ি উদ্ধার হলেও ওদের চিন্তার কিছু নেই। বরং দূরে বসে নিশ্চিন্তে পুলিসী তদন্তের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে পারবে।

সামনে একটা গাড়ির আওয়াজ উঠতে ধ্যানভঙ্গ হলো ওর। বেরিয়ে এল রূম ছেড়ে, আরেক কাপ কফি খেতে হবে। রেস্টের বারান্দায় পা রেখে থমকে দাঁড়াল রানা। একটা টকটকে লাল টু সীটার বিএমডব্লিউ দাঁড়িয়ে আছে কার পার্কে, ওটার আওয়াজই শুনেছে। ড্রাইভিং সীট থেকে নামছে এক ডানাকাটা পরী। আস্ত একটা সেক্স বম্ব।

উনিশ-কুড়ির মত হবে মেয়েটির বয়স, উচ্চতা মাঝারি, তবে স্লিম দেহ ও দীর্ঘ, সুগোল পা দুটোর জন্যে একটু বেশি লম্বা দেখায়। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা, কুচকুচে কালো চুল, সামনেরদিকটা মাঝকপাল বরাবর নিখুঁত সোজা করে ছাঁটা। দেহে, চেহারায় বুনো যৌবন তার। অদ্ভুত সুন্দরী। এমন পরমাসুন্দরী, বুনো যৌবনা যুবতী এর আগে আর চোখে পড়েছে কি না ভেবে পেল না রানা। চোখাচোখি হলো দু'জনের। ওর বুকের মধ্যে ছলকে উঠল উষ্ণ রক্ত। এ নিশ্চই নিনা, বুঝল রানা।

ওটা মেয়ে নয়, ভাবল, ওপরের আবরণবিহীন লক্ষ ভোল্টের নগ্ন বৈদ্যুতিক তার। অমোঘ নিয়তির মত টানছে যেন ওকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে জড়পদার্থ বনে গেল, সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকল রানা।

মেয়েটা ওর দিকে বঙ্কিম কটাক্ষের তীর ছুঁড়ল, তারপর গাড়ির দরজা বন্ধ করল সশব্দে। বারান্দায় এসে উঠল, কাঠের ফ্লোরে হাই হীলের খুট খাট্ আওয়াজ এবং দেহের বিশেষ অঙ্গে আটলান্টিকের ঢেউ তুলে ওর সামনে দিয়ে চলে গেল। রেস্টের

কাচঘেরা অংশের শেষ মাথার এক রুমে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। তবে তার আগে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখে নিল।

ধ্যান ভাঙতে সময় লাগল ওর। কিচেনের দিকে হাঁটা ধরল। ঢোকার মুখেই রিকির সাথে দেখা। শুকনো মুখে ওকে পর্যবেক্ষণ করছে ছেলেটা। বারের ওপাশ থেকে নিগ্রো বারম্যান জনিও তাকিয়ে আছে। চাউনিতে অসন্তুষ্টি। দু'জনে যে এতক্ষণ ওকে নিয়েই আলোচনা করছিল, বুঝতে দেরি হলো না রানার।

'কি হয়েছে, রিকি?'

'ওর দিকে...' থেমে গেল যুবক।

'ওর দিকে কি?' মুচকে হাসল ও।

'নিনার দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকা ঠিক হয়নি আপনার।'

'কেন বলো তো!'

'কার্লো পছন্দ করে না।'

'খুব খারাপ কথা,' কপট গাম্ভীর্যের সাথে বলল ও। 'মেয়ে সেয়ানা হয়েছে তার বোঝা উচিত।'

'না, মানে ও যদি বাপের কাছে নালিশ করে, আমি ঝামেলায় পড়ে যেতে পারি।'

'ভেব না, ও তা করবে না।'

হাসির ভঙ্গি করল ছেলেটা। 'না করলে তো ভালই।'

কফি খেতে খেতে ঠিক করল রানা, প্রথম সুযোগেই এয়ারপোর্টে যেতে হবে। ৩৮৮ নম্বর লকারে কি আছে জানতে হবে। এখান থেকে এয়ারপোর্টের দূরত্ব জেনে নিয়েছে ও রিকির কাছ থেকে, বিশ মাইল।

বেরিয়ে এসে বীচের দিকে এগোল রানা। একটা বড় পাম গাছের ছায়ায় বসল। এখান থেকে ওর কেবিন দশ-বারো গজ দূরে। ডানে তাকাতে একটা ঝকঝকে মোটর বোট চোখে পড়ল। একটা ছোট কাঠের জেটির সাথে বাঁধা। মাঝারি আকারের বোট ওটা, দেখেই বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তিধর এঞ্জিনে চলে। ওটাই সেই বোট? ভাবল রানা। যেটা কিনতে গিয়ে টাকায় টান পড়ে রিকির বাবার?

আরও ডানে কয়েকটা রঙচঙে পেডাল বোট দেখতে পেল ও, বালির ওপর উপুড় করে রাখা আছে। এখনও হয়তো পানিতে নামানো হয়নি, নতুন। উঠে গিয়ে বোটগুলো দেখল রানা। ঠিকই ভেবেছে, সব কটা নতুন। দশটার একটু পর পিছনের ক্যারিয়ার প্রায় বোঝাই বাজার নিয়ে ফিরল কার্লো। দুই কমবয়সী নিগ্রো ওয়েটার ছুটে গেল ওগুলো নামাতে।

রানাকে জেটির কাছে দেখে হাত নেড়ে হাসল গরিলা, এগিয়ে এল। 'কি করছেন একা একা?'

'ভাবছি ওখানে একটা হাই ডাইভিঙ বোর্ড তৈরি করলে কেমন হয়,' হাত তুলে রেস্ট আর জেটির মাঝামাঝি লেগুন দেখাল ও।

'তাই?' খুশির ঝিলিক ফুটল লোকটার মুখে। 'পারবেন তৈরি করতে?'

'তা পারব।' নাকের পাশটা চুলকাল ও। 'জায়গাটাও আদর্শ। ওই যে কোরাল ফাউন্ডেশন, ওর ওপর তৈরি করলে চমৎকার হবে। টিম্বার, কিছু

নারকেলের ম্যাটিঙ, লোহার রেইল কয়েকটা, আর কিছু সিমেন্ট হলেই কাজ শুরু করে দিতে পারি আমি। যদি আইডিয়া পছন্দ হয় আপনার, কয়েকটা ফ্লাডলাইটও সেট করা যাবে, রাতেও যাতে কাস্টমারদের জন্যে শোর ব্যবস্থা করা যায়।'

ওর পাশে বসে পড়ল কার্লো। 'শো?' দু'চোখ রীতিমত জ্বলজ্বল করছে তার, এতই খুশি হয়েছে।

'হ্যাঁ। ফ্যান্সি ডাইভিঙ, ট্রিক ডাইভিঙ, এইসব আর কি! অবশ্য ওসবের প্র্যাকটিস নেই কিছুদিন থেকে। তবে সমস্যা হবে না। পারব।'

'ভারি কাজের মানুষ তো আপনি!' এক মাইল চওড়া হাসি ফুটল তার মুখে। 'চমৎকার আইডিয়া! ওকে, কালই আমার সাথে টাউনে যাবেন আপনি। যা যা প্রয়োজন কিনে নিয়ে আসবেন, কেমন?'

'গেলেই হয়তো সব রেডি পাওয়া যাবে না।'

'নো প্রবলেম। টাউনের সমস্ত ব্যবসায়ী আমার পরিচিত, অর্ডার দিয়ে এলে সব রেডি রাখবে ওরা।'

'ওকে, মিস্টার কার্লো।'

কলার মত মোটা, দীর্ঘ তর্জনী ওর নাকের সামনে তুলল গরিলা। 'এখন থেকে আমার নামের আগে আর মিস্টার বলবে না। আমি পছন্দ করি না। সবাই কার্লো বলে ডাকে আমাকে, তুমিও আজ থেকে তাই ডাকবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বেশ।'

'আমিও বলব না,' মৃদু ঘুসি মারল সে ওর বাহুতে।

'বোলো না।'

'আমি যাই। লাঞ্চ রেডি করতে হবে। বারোটায় কিচেনে চলে এসো,' দু'পা গিয়ে থেমে দাঁড়াল। 'আর যখনই কফি বা ড্রিঙ্ক প্রয়োজন হবে, চাইতে দ্বিধা করবে না।'

'আচ্ছা।'

'আর হ্যাঁ, আমার মেয়ের সাথে আলাপ হয়েছে তোমার?'

'না। তবে দেখা হয়েছে,' বলল ও।

'ঠিক আছে। লাঞ্চের সময় পরিচয় করিয়ে দেব।'

কিচেনে পৌঁছল রানা বারোটা দশে। ততক্ষণে খেতে বসে গেছে সবাই। কার্লো, নিনা, রিকি, জনি ও আরেক বৃদ্ধ, ম্যানুয়েল। চীফ ওয়েটার, এ-ও নিগ্রো। 'এসো, এসো!' সাদর অভ্যর্থনা জানাল গরিলা। 'দেরি হলো যে! এখনই এত খাটুনি করার প্রয়োজন কি ছিল? বোসো।'

মুখ ঘুরিয়ে মেয়ের দিকে তাকাল লোকটা, সে তখন এক কিং সাইজ গলদা চিংড়ি মুখে পুরতে ব্যস্ত। 'নিনা, এ হচ্ছে আমাদের নতুন লাইফগার্ড, মাসুদ রানা।'

মাথা দোলাল কেবল নিনা, তেমন পাত্তা দিল না। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল, যাওয়ার আগে আড়চোখে দেখে নিল ওকে এক পলক। 'কিছু মনে কোরো না, রানা,' বলল কার্লো। 'মেয়েটা একটু একগুঁয়ে ধরনের হয়েছে, মেজাজ মর্জি বোঝা দায় ওর। মা মরা মেয়ে, বড় হয়েছে একা, বুঝলে না? একটু ত্যাড়া।'

'আমি কিছু মনে করিনি, কার্লো,' হাসির ভঙ্গি করল রানা।

অবাক চোখে ওদের দেখল রিকি, দু'জনে এত ঘনিষ্ঠ কখন হলো, কখন থেকে কেবল নাম ধরে পরস্পরকে সম্বোধন শুরু করেছে, তাই ভাবছে হয়তো।

'করা উচিতও নয়, ও ছেলেমানুষ,' বলল গরিলা।

ওপরে-নিচে মাথা দোলাল ও।

পাঁচ

কার্লোর কেনাকাটার পর্ব শেষ হতে দশটা বেজে গেল। ক্যারিয়ারে মালপত্র সব গুছিয়ে এক ব্যস্ত রেস্টুরেন্টে ঢুকল ওরা কফি খেতে। 'এখান থেকে বেরিয়ে আমি রেস্টে ফিরে যাব,' বলল মেক্সিকান। 'তুমি যাবে ডাইভিঙ বোর্ডের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অর্ডার দিতে।'

'ওকে,' বলল রানা।

'কি কি লাগবে লিখে এনেছ?'

মাথায় দুটো টোকা দিল ও। 'এখানে লেখা আছে সব।'

'কোন্ কোন্ দোকানে যেতে হবে...'

'আমি খুঁজে নেব।'

'বেশ। কাজ সেরে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরবে।'

রানার মুখে হাসি ফুটল। 'তুমি দেখছি আমাকে বাচ্চাদের মত উপদেশ দিতে শুরু করে দিলে।'

কার্লোও হাসল। 'তুমি এখানে নতুন বলে একটু সতর্ক করা আর কি! নাকি আগেও এসেছ?'

'নাহ্, এই প্রথম।'

রেস্টুরেন্টটা বড়, ভিড়ও তেমনি। ভেতরে বেশ কয়েকজন খদ্দেরের সাথে কার্লোকে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করতে দেখে বোঝা গেল বেশ পরিচিতি আছে তার শহরে। ওয়েটার কফি দিয়ে যেতে যে যার কফিতে চুমুক দিল বার কাউন্টারে হেলান দিয়ে। চমৎকার স্বাদ এদের কফির। তৃতীয় চুমুক দিতে যাচ্ছিল রানা, কেউ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টের পেয়ে থেমে মুখ তুলল। মানুষটা লম্বা, হালকা-পাতলা গড়নের। নীল চোখের দৃষ্টি কঠিন। দেখেই রানা বুঝল বিশেষ পেশার মানুষ এ লোক। চোখের পাতা কেঁপে গেল ওর।

'কি হে, কার্লো!' ভরাট গলায় বলল আগন্তুক, ডান হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। 'ব্যবসা কেমন চলছে?'

সাগ্রহে হাতটা ধরল গরিলা। 'এবারের সীজন এখনও শুরু হয়নি, মিস্টার কোয়েল। আশা করছি আগামী শনিবার থেকে শুরু হবে। কফি?'

'না, ধন্যবাদ,' বলে রানার দিকে তাকাল সে। 'এ কে?'

'ওহ্, আমার নতুন লাইফগার্ড, মাসুদ রানা। রানা, ইনি ডিটেকটিভ ডান কোয়েল, সিটি স্কোয়াড। ভেরি স্মার্ট বয়।'

হাসি নয়, হাসির আভাস ফুটল অফিসারের মুখে। অন্তর্ভেদী চোখে রানাকে দেখছে সে। 'লাইফগার্ড? সাঁতার জানেন? কার্লোর আগের যে লাইফগার্ড ছিল, সে ব্যাটা প্যাডেল চালাতেই জানত না।'

'আমার সাথে পানিতে নামলে আপনি নিরাপদ থাকবেন,' বলল রানা। 'প্রয়োজন পড়লে আপনাকে আমি উদ্ধার করতে পারব।'

'আপনি জানেন না, মাসুদ রানা সাঁতারে ইউরোপীয়ান চ্যাম্প, নাইন্টি টু,' ওর কথা শেষ হওয়া মাত্র জুড়ে দিল কার্লো।

'রিয়েলি!' কিঞ্চিৎ বিস্ময় ফুটল ডিটেকটিভের মুখে।

'অফ কোর্স!' প্রকাণ্ড মাথাটা দোলাল সে। 'আগামী সপ্তায় একদিন মিসেসকে নিয়ে চলে আসুন, অফিসার। আপনাদের জন্যে সব ফ্রী এবং অবশ্যই সেরা। যত খুশি সাঁতার কাটুন, বিপদ হলে মাসুদ রানা আছে সামাল দিতে।'

'দেখি,' শীতল হাসি দিয়ে বলল সে। 'আসব হয়তো।' পরক্ষণে পুরোপুরি পুলিস অফিসার বনে গেল। 'কার্লো, ন্যাড়া গার্সিয়ার সাথে তোমার শেষ দেখা হয়েছে কবে?'

'ন্যাড়া,' শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র কান খাড়া হয়ে গেল রানার।

'গার্সিয়া?' চোখ কুঁচকে উঠল কার্লোর, চেহারার সদয় ভাবটা মিলিয়ে গেছে। 'মনে নেই, কয়েক বছর আগের কথা, মিস্টার কোয়েল, কেন?'

তার মুখের ওপর নজর স্থির রেখে বলল ডিটেকটিভ, 'আমি খবর পেয়েছি গত সপ্তার প্রথমদিকে, মঙ্গলবার, পামবীচে দেখা গেছে তাকে। আরও জেনেছি সে তোমার সাথে দেখা করতেই এসেছে।'

'ভুল কথা, অফিসার। অন্তত দু'বছরের মধ্যে ওর চেহারা দেখিনি আমি। বিলিভ মি।'

গরিলার প্রতিটা অঙ্গভঙ্গি তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করল ডিটেকটিভ। 'তিনদিন এখানে থেকে গেছে সে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'অথচ তোমার সাথে তার দেখাই হয়নি?'

'হয়নি, বলেছি তো,' শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল গরিলা। 'তাছাড়া গার্সিয়ার সাথে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতাও নেই যে এখানে এলেই আমার সাথে দেখা করতে আসতে হবে ওকে।'

'আমি এখানে নতুন, কার্লো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার হেডকোয়ার্টার্সের যে সব রেকর্ডস, সে সব পুরনো। তাতে আছে অন্য কথা, তুমি আর গার্সিয়া খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলে অতীতে, সে কথা লেখা আছে সেখানে।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেক্সিকান, আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল। 'মানলাম, ছিল। কিন্তু সে তো বহুদিন আগের কথা। দু'বছরের মধ্যে সত্যিই ওর সাথে আমার দেখা হয়নি, বিশ্বাস করুন!'

'বেশ, করছি। এতে বোঝা যায় মানুষটা তুমি ভাল হয়ে গেছ, অথবা হওয়ার চেষ্টা করছ। ভাল কথা। এবং একজন ভাল নাগরিকের কর্তব্য পুলিসকে তার তদন্ত কাজে সহায়তা করা, ঠিক?'

নীরবে মাথা দোলাল সে।

'তাহলে লোকটা বর্তমানে কোথায় আছে, কি করছে, সেটা অন্তত আমাকে জানাও।'

কপাল কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবল মেক্সিকান। কফিতে চুমুক দিল। 'আমি যদ্দূর জানি ভেরো বীচে আছে গার্সিয়া। শোনা কথা আর কি, শিওর নই। বেশ বড় কি এক কাজে নাকি হাত দিয়েছে। কাজটা কি জানি না। জানার চেষ্টা করিনি কখনও।'

'তার অবস্থানের খবর কি ভাবে জানলে?'

আরেক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কার্লো। 'মিস্টার কোয়েল, আমি এক সামার রেস্ট চালাই, হাজারো পদের মানুষ আসে ওখানে। অনেক ধরনের আলোচনা করে তারা, কানে আসে।'

'হুম! ভেরো বীচ, না?' আপনমনে মাথা দোলাল অফিসার। 'ওর কাজ সম্পর্কে কিছু জানো না তাহলে তুমি?'

'না, সত্যি। তাছাড়া ভেরো বীচ তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাও নয়, ওখানে এমন কী-ই বা করার আছে?'

'অনেক কিছু করার আছে। তার এক নম্বর কিউবায় স্মাগলিঙ।'

ওদিকে রানার আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়ছে। লঙ রেঞ্জ অ্যান্টেনার মত কান খাড়া রেখেছে ও যাতে একটা শব্দও শুনতে ভুল না হয়।

'শোনো, কার্লো,' খানিক বিরতি দিয়ে বলে উঠল ডিটেকটিভ। 'তোমার সাহায্য প্রয়োজন আমার। এই সুযোগটা যদি কাজে লাগাতে পারি, প্রমোশন পাব আমি।'

'নিশ্চই করব যদি আমার আয়ত্তের মধ্যে থাকে। বলুন, অফিসার, কি সাহায্য চাই?'

'বাজারে আলোচনা চলছে, গত মঙ্গলবার আসলেই পাম বীচ এসেছিল ন্যাড়া গার্সিয়া। এবং মেরে ফেলা হয়েছে ওকে।'

কাপের ওপর কার্লোর আঙুল চেপে বসল, ব্যাপারটা নজর এড়াল না রানার। 'তাই?' প্রশ্ন করল সে।

'সেরকমই শুনছি,' খানিকটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল ডিটেকটিভ। 'আমার ইনফর্মারদের একজন দেখেছে তাকে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসার সময়। মুশকিল হচ্ছে, একদল আহাম্মক ইনফর্মার নিয়ে কাজ করতে হয় আমাদের। এমনই একেক বুদ্ধিমান, তাকে দেখেও ছেলেটা সময়মত জানায়নি আমাকে। ওকে এমনকি অনুসরণ পর্যন্ত করেনি, নির্বিঘ্নে বেরিয়ে যেতে দিয়েছে।

'ব্যাটা সময়মত এমন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর জানায় না আমাকে, জানাল পরদিন। কি আর করা, খুঁজতে লেগে গেলাম গার্সিয়াকে। ভাবলাম নিজের গাড়ি যখন সঙ্গে আনেনি, তখন নিশ্চই কোন রেন্টাল কোম্পানি থেকে ভাড়া করেছে। শেষমেষ ভেরো বীচের হারয রেন্টাল কোম্পানির কাছ থেকে জেনেছি, গার্সিয়ার বর্ণনার সাথে মিলে যায় এমন এক লোক ওদের কাছ থেকে একটা মাসটাঙ ভাড়া নিয়েছে, জোয়েল ব্লাচ নামে।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল রানা। ভেতরে ঘাম ছুটে গেছে। যা শুনছে, সত্যি শুনছে

কি না এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

'তারপর?' প্রশ্ন করল কার্লো। ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল গলা।

'লোকটা ওদের ক্লিভল্যান্ডের এক ঠিকানা দিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ও নামে কেউ সেখানে থাকে না। ওদের গার্সিয়ার ছবি দেখালাম, ওরা তাকে সনাক্ত করল জোয়েল ব্লাচ নামে। এখন,' বলে কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিল সে। 'গার্সিয়া বা তার মাসটাঙ, দুটোই অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

'তো?' বলল কার্লো।

'ওকে খুঁজে পেতে তোমার সাহায্য চাই আমি।'

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল মেক্সিকান। 'দুঃখিত, অফিসার। এ ব্যাপারে আমি কোন সাহায্য করার মত অবস্থানে নেই। কিছুই জানি না আমি এসবের। জানলে করতাম, বিলিভ মি।'

স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল ডান কোয়েল। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'করলে বোধহয় ভাল করতে, কার্লো।'

'বিশ্বাস করুন, ওর ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।'

ধক্ করে জ্বলে উঠল ডিটেকটিভের দু'চোখ। 'ভেবে বলছ তো?'

'অবশ্যই।'

'বেশ। আজ আমি যাচ্ছি, কার্লো। তবে মনে রেখো, যদি কখনও জানতে পারি তুমি এসবে জড়িত ছিলে, সেদিন যে তোমার কি পরিণতি হবে আমি নিজেও তা বলতে পারি না।'

ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল ডিটেকটিভ। মেইন রোডের ভিড়ে লোকটা মিশে যেতে রানার দিকে তাকিয়ে হাসির ভঙ্গি করল কার্লো। নিষ্প্রাণ, ফ্যাকাসে হাসি। 'দেখো দেখি কেমন আজব কাণ্ড! যার সম্পর্কে কিছু জানি না, তার সম্পর্কে খোঁজ কি করে জানাব?'

সমঝদারের মত মাথা দোলাল ও। 'সে তো ঠিকই।'

'ভারি আমার মামা বাড়ির আবদার! উনি প্রমোশন পাবেন, সে জন্যে তাকে আমার সাহায্য করতে হবে, এমনই যোগ্য অফিসার!' গজ গজ করে আরও কি সব যেন বলে গেল লোকটা, সব রানার কানে গেল না। অন্য কথা ভাবছে।

'ন্যাড়া গার্সিয়া কে?' প্রশ্ন করল ও।

'এ অঞ্চলের সেরা পিটারম্যান ছিল এক সময়। যে কোন সেফের তালা খোলায় ওস্তাদ।'

বুঝেছি, মনে মনে বলল রানা। 'তার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?'

'কোন এককালে পরিচয় ছিল আমার সাথে, এই পর্যন্তই। আর কিছু না। বহুদিন যোগাযোগই নেই।'

ক্যারাভ্যানে দেখা মৃত বৃদ্ধের পোড়া পা-টা রানার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তার খোলা দু'চোখে জমাট বাঁধা আতঙ্কও দেখতে পেল স্পষ্ট।

'ওর নামের আগে ন্যাড়া ব্যবহার করা হয় কেন?'

হাসল কার্লো। 'ওর মাথাজোড়া টাক, তাই। বদনাম ঘোচাবার জন্যে প্রচুর পয়সা খরচ করেছে ও, উইগ কেনার পিছনে। একবার এক সেফ খুলতে গিয়ে ধরা

পড়েছিল লোকটা এই বাতিকের জন্যে। কাজের সময় উইগ জায়গা থেকে সরে গিয়েছিল, হ্যান্ড গ্লাভ খুলে ওটা সেট করতে গিয়ে বেখেয়ালে প্রিন্ট রেখে আসে। ব্যস, আর যাবে কোথায়?'

লাঞ্চের ঘণ্টাখানেক পর ফিরল মাসুদ রানা। বীচে জনাত্রিশেক বিভিন্ন বয়সী মেয়ে-পুরুষ দেখতে পেল, সান আমব্রেলার নিচে ম্যাট্রেসে শুয়ে আছে ঝিম্ মেরে। পরনে সংক্ষিপ্ততম পোশাক।

লাঞ্চের পালা শেষ, কাজেই রেস্টুরেন্ট একেবারে নীরব। মেঘ গর্জনের মত নাক ডাকছে কার্লোর, রেস্টুরেন্টের পিছনের এক কেবিনে ঘুমাচ্ছে।

আগুনের মত তাপ ছড়াচ্ছে দুপুরের নির্দয় সূর্য, নাকেমুখে গরম বাতাসের ঝাপটা লাগছে এসে, বিশ্রামরত কাস্টমারদের গায়ে মাখা তেল আর ঘামের মিলিত গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে।

ধীরেসুস্থে খাওয়া সারল ও। রিকিকে সাথে নিয়ে খোলা বীচে এক স্পাইডার অর্কিডের ছায়ায় এসে বসল। 'তুমি ন্যাড়া গার্সিয়াকে চেনো,' প্রশ্ন করল ও।

'গার্সিয়া? নাম শুনেছি। সেই তো আমাদের সেফ খুলে ডকুমেন্ট সরাতে সাহায্য করেছিল কার্লোকে।' চোখ কুঁচকে উঠল যুবকের। 'ওর নাম আপনি শুনলেন কোথায়?'

আনমনে বালি নিয়ে খেলতে লাগল রানা। মুঠো ভরে বালি নিয়ে হাত ওপরে তুলে একটু একটু করে ছাড়ছে, মৃদু বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে ফেলছে সামান্য দূরে। 'কাল যে দেহটা আমরা কবর দিয়েছি, সেটা গার্সিয়ার।'

চমকে উঠল রিকি। 'কি বলছেন!'

'ঠিকই বলছি।'

'পুলিস লাশ পেয়ে গেছে?' গার্সিয়া নয়, ওর সমস্যা লাশ।

'না, তা পায়নি। তবে পেয়ে যাবে যে কোন মুহূর্তে। তোমাকে কথাটা বলব না ভেবেছিলাম পরে চিন্তা করে দেখলাম যে ভাবেই হোক, লাশটা আমাদের দু'জনের ঘাড়েই চেপেছিল, কাজেই কি ঘটছে না ঘটছে সব জানার অধিকার তোমারও আছে। তাই বললাম।'

রানার গম্ভীর চেহারার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল রিকি। মনে হয় কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু উপযুক্ত কথা খুঁজে পাচ্ছে না। 'লকারের চাবিটা?' অনেক সময় পর ফিসফিস করে বলল, 'কোথায় ওটা?'

'আছে। কাল এয়ারপোর্ট যাব আমি ওটায় কি আছে দেখতে।'

চেহারা পাংশু হয়ে উঠল তার। 'কি দরকার ঝামেলায় যাওয়ার, চ্যাম্প? ফেলে দিন না! যদি কেউ কিছু টের পেয়ে যায়, সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

ঘুরে ওকে দেখল রানা। 'এত ভয় কিসের তোমার?'

'না, মানে, যদি…'

'যদি কি?' বলল ও।

'আপনি যেভাবে পরিস্থিতি ট্যাক্‌ল করেছেন, তাতে মনে হয় পুলিস আমাদের গার্সিয়ার কেসের সাথে জড়াতে পারবে না। কিন্তু যদি ওদের কেউ আপনাকে

লকার খুলে লোকটার ছেড়ে আসা জিনিসপত্র বের করতে দেখে ফেলে, তখন? সব বিফলে যাবে না?'

'না-ও তো ঘটতে পারে সেরকম কিছু, হয়তো নিরাপদেই কাজ সেরে ফিরে আসতে পারব। কি ঘটবে না ঘটবে সেই আশঙ্কায় বসে থাকতে রাজি নই, আমি ভেতরের খবব জানতে চাই।'

'কিসের ভেতরের খবর?'

'গুজব শোনা যাচ্ছে গার্সিয়া খুব বড় কোন কাজে হাত দেয়ার চুক্তিতে এসেছিল পাম বীচে। বোধহয় কোন সেফ খোলার কাজ হবে। যতদূর সম্ভব কাজটায় সে সফল হয়েছে, এবং পরে ডবলক্রস করেছে যাদের পক্ষে কাজ করছিল, তাদের সাথে। সেফের জিনিসপত্র নিজেই মেরে দিয়েছে। এয়ারপোর্ট লকারে হয়তো সেগুলোই আছে। ওগুলো গার্সিয়া কোথায় রেখেছে, সেই তথ্য বের করার জন্যেই তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। সেটাই তার মৃত্যুর কারণ বলে এখন মনে হচ্ছে আমার।'

চরম বিস্ময়ের সাথে ওকে দেখছে রিকি। চোয়াল ঝুলে আছে। 'এতসব…এতকিছু কিভাবে জানলেন আপনি?' কোনমতে বলল সে।

'সব এখনও জানতে পারিনি,' আরেক মুঠো বালি তুলে নিল ও। 'কিছু শোনা, কিছু অনুমান।'

'কিন্তু কাজ যদি গার্সিয়া পাম বীচে করে থাকে, তাহলে ওর মৃতদেহ আরেক মুল্লুকে গেল কি করে?'

'হয়তো ওখানেই মরেছে সে।'

আনমনে গাল চুলকাতে লাগল রিকি। চেহারা বিভ্রান্ত। 'ওখানে মেরে খুনীরা এতপথ কেন বয়ে আনতে গেল লাশটা?'

'সেটাও জানতে হবে।'

ওর চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ দেখে শঙ্কিত হলো যুবক। 'থাক না,' অনুনয় করল। 'কি দরকার আগুন ঘাঁটাঘাঁটি করার? ফেলে দিন ও চাবি, চ্যাম্প, প্লীজ!'

ধীরে ধীরে ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল রানা। 'সম্ভব না, রিকি। আমার বুদ্ধিকে কেউ চ্যালেঞ্জ করেছে, নির্বোধ ভেবে ফাঁসাতে চেষ্টা করেছে, আমি তাকে ছাড়ব না। সন্দেহ করে যদি ক্যারাভ্যান চেক না করতাম, যদি লাশসহ হাইওয়ে পেট্রলের হাতে ধরা পড়ে যেতাম, কতবড় ঝামেলায় পড়তাম আমরা ভেবে দেখেছ? কাজেই এর পিছনের সব ঘটনা জানতেই হবে আমাকে। এসবের মূল হোতা কে, তাও জানতে হবে।'

রিকি আর বাধা দেয়ার চেষ্টা করল না, কারণ লোকটা যে এক কথার মানুষ, তা এতদিনে বেশ বুঝে গেছে সে। ওদিকে হাতের কাজ থেমে গেছে রানার, দু'চোখ সেঁটে আছে রেস্টের বারান্দায়। নিনা এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে। পরনে টকটকে লাল বিকিনি, কাঁধে তোয়ালে। অজান্তেই একটা ঢোক গিলল রানা, আবারও লাফিয়ে উঠল বুকের রক্ত। আড়চোখে দেখল ওকে মেয়েটা, তারপর লম্বা পা ফেলে একেবারে ওদের নাকের ওপর দিয়ে ছুটে গেল বীচের দিকে। চোখের সামনে ওর প্রায় নগ্ন বুক ও নিতম্বের নাচন দেখে রানার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

ঢাকা। বলে চেহারা দেখার উপায় নেই। তবে গায়ের রঙ যে সাদা নয় মানুষটার, তা বোঝা গেল। তামাটে। চওড়া কাঁধ। একাই আছে সে গাড়িতে।

সতর্ক হয়ে উঠল রানা। হাইওয়েতে উঠে প্রথম ট্রাফিক সাইনে স্টপ সাইন দেখে থামল, ওর রাইট ইন্ডিকেটর মৃদু টিক্ টিক্ শব্দে সঙ্কেত দিচ্ছে। দুটো গাড়ির পিছনে শেভ্রোলেও দাঁড়িয়েছে এসে, ওটারও রাইট ইন্ডিকেটর জ্বলছে। ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে? ভাবল রানা, নাকি ওর সন্দেহপ্রবণ মন কল্পনা করছে? দেখা যাক।

সিগন্যাল ক্লিয়ার হতে বাঁক নিল ও, তীরবেগে ছুটল শহরের দিকে। পিছনের অন্যসব গাড়ির সাথে ওটাও আসছে। শহর পর্যন্ত কোন অসুবিধে নেই, এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় সব গাড়ি শহরেই আসে। তারপরও যদি দেখা যায় ওটা পিছু লেগে আছে, তখন বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে ভেবে রাস্তার দিকে মন দিল। ডাভরেইলের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে যখন নামল, পিছনে শেভ্রোলেটা নেই দেখে নিশ্চিন্ত হলো। ওরই ভুল। চালক নিশ্চই কাউকে সী অফ করতে গিয়েছিল স্বাভাবিক আর দশজনের মত, কাজ সেরে ফিরে এসেছে নিজের আস্তানায়। তাই হবে।

কিন্তু তার চেহারা আড়াল করে রাখার বিষয়টা মন সহজে মেনে নিতে চাইল না। তাছাড়া ওরকম চওড়া কাঁধ, ওটাও সন্দেহজনক। সে রাতের সাদা মার্সিডিজের অজ্ঞাত চালকের মতই প্রশস্ত এর কাঁধ। সেই লোকই না তো?

শহর থেকে বেরিয়ে গাড়িটাকে আর দেখতে পেল না রানা। অর্থাৎ ওর অনুমান ঠিক নয়। ভুল সন্দেহ করেছিল। কিন্তু হাইওয়ে ছেড়ে সামার রেস্টের প্রাইভেট রোডে ওঠার কয়েক সেকেন্ড পর টের পেল ভুল করেনি ও, সন্দেহ ঠিকই ছিল। প্রাইভেট রোডে গাড়ি তুলে ডানে তাকিয়েছিল রানা, কিছুদূর পর্যন্ত প্রায় ওর সমান্তরালে চলে যাওয়া হাইওয়ের গাড়ির মিছিল দেখতে। ওর মধ্যে সেই গাড়িটাকেও দেখল, ওর পরের ছয়টা গাড়ির পিছন পিছন চলে যাচ্ছে পাম বীচ পিছনে ফেলে।

ব্রেক কষে ভ্যান দাঁড় করিয়ে ফেলল রানা। বেকুবের মত তাকিয়ে থাকল। ইচ্ছে থাকলেও এখন ওটাকে অনুসরণ করতে যাওয়া বোকামি হবে। এর মধ্যেই বেশ এগিয়ে গেছে শেভ্রোলে, গাড়ি ঘুরিয়ে হাইওয়েতে উঠতে উঠতে আরও এগিয়ে যাবে, ধরা যাবে না। ওটার টেইল লাইট অদৃশ্য হয়ে যেতে চিন্তিত মনে গাড়ি ছাড়ল ও, ততক্ষণে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, এই লোকই সে রাতের মার্সিডিজ চালক। কিন্তু কে ও?

রেস্টের এক মাইল আগে পথের পাশে গাড়ি রাখল রানা। সামনে পিছনে দেখে নিয়ে ব্রীফকেসটা খুলতে লেগে গেল। বিশেষ বেগ পেতে হলো না, কেসের মত তালাও যথেষ্ট ব্যবহৃত, রানার প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী স্টেইনলেস স্টীলের সরু লক ওপেনারের সামান্য খোঁচাখুঁচিতেই খুলে গেল। পাশের সীটে রেখে ওটার ডালা খুলে ভেতরে চোখ বোলাল ও।

ধূসর রঙের একটা লাইটওয়েট স্যুট, তিনটে সাদা শার্ট, চারজোড়া কালো মোজা, ছোট এক প্লাস্টিক হোল্ড-অলে একটা কর্ডলেস রেজর, টুথ ব্রাশ, পেস্ট,

স্পঞ্জ, সাবান, একজোড়া নীল পাজামা, বহু ব্যবহৃত একজোড়া স্লিপার এবং ছয়টা সাদা রুমাল যত্নের সাথে সাজিয়ে রাখা আছে। তার নিচে শুয়ে আছে একটা সেভেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন এমএম লুগার অটোমেটিক পিস্তল, সাথে একশো বুলেটের বাক্স, কিছু রাবার মোড়া পাঁচ ডলারের নোট আর একটা জীর্ন ওয়ালেট।

শেষেরটা তুলে নিল মাসুদ রানা। ভেতর থেকে বের হলো বেশ কিছু ভিজিটিং কার্ড, থমাস লোয়ারি নামে ইস্যু করা আমেরিকান এক্সপ্রেসের একটা ক্রেডিট কার্ড, লস অ্যাঞ্জেলিসের ঠিকানার কোন এক উইলিয়াম রিকার্ডের নামের একটা ড্রাইভিঙ লাইসেন্স ও একটা একশো ডলার বিল।

সন্তুষ্ট হতে পারল না রানা। শুধুই এই! আরও কিছু থাকা উচিত। সবকিছু বের করে ঝুঁকে কেসের লাইনিঙ পরীক্ষায় মন দিল ও। মিনিট পুরো হওয়ার আগেই ছোট্ট করে শিস বাজাল। ডালার লাইনিঙের নিচের একদিকের সেটিঙ একটু অন্যরকম—আর সব জায়গার মত নয়। লক ওপেনারের মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে ওখানকার নাইলনের কাপড়ে আঙুল ঢোকাবার মত ছিদ্র করল ও, তারপর বাঁ হাতের তর্জনী ভরে দিয়ে ফড়াৎ করে খানিকটা লাইনিঙ ছিঁড়ে ফেলল।

ভেতরে স্কচ টেপ দিয়ে সাঁটা আছে আরেকটা ভিজিটিঙ কার্ড। টেপের বাঁধন মুক্ত করে ওটা বের করল রানা। উল্টো করে পিছনদিকে নজর বোলাল। ছোট্ট একটা বার্তা লেখা আছে ওখানে, হাতে লেখা। পড়ল ও:

ফানেল, শেলডন। ০৭·৪৫ মে ২৭

ছয়

চোখ কুঁচকে লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকল। এর মানে কি? শেলডন শব্দটা চেনা চেনা লাগছে, নিশ্চই কোন জায়গার নাম। কোথায়? ফানেল কি? এ নিয়ে পরে মাথা খাটানো যাবে ভেবে কার্ডটা বুক পকেটে রেখে দিল রানা। আরও কিছু আছে কি না নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ডালার ও কেসের পুরো লাইনিঙ ছিঁড়ে ফেলল। নেই।

জিনিসপত্র সব ভেতরে ভরে ব্রীফকেস বন্ধ করল ও, নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে বালি খুঁড়ে পুঁতে ফেলল ওটা। প্রয়োজন দেখা দিলে পরে যাতে জায়গাটা সনাক্ত করতে অসুবিধে না হয়. সে জন্যে ওখানটায় এক খণ্ড পাথর রেখে দিয়ে বালিতে বসে যাওয়া পায়ের চিহ্ন ঝাড়ু দিয়ে মুছে ফেলল একটা গাছের ডাল দিয়ে। তারপর ফিরে চলল।

রাতের খাওয়া সেরে বীচে পাতা ইজি চেয়ারে এসে বসল ও। গরম কিছুটা কম এখানে, ফুরফুরে বাতাসও আছে। মাথার নিচে দু'হাত রেখে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখতে লাগল ও। আনমনে ভাবছে ডিটেকটিভ কোয়েল, শেভ্রোলের চালক আর গার্সিয়ার ব্রীফকেসে পাওয়া কার্ডটার কথা।

প্রথমটা বড় দুর্ভাগ্যজনক। যে ভাবে উঠেপড়ে লেগেছে অফিসার, তাতে আর

অল্প দিনের মধ্যেই গার্সিয়ার খোঁজ বের করে ফেলবে সে, এবং লাশটা পাওয়ামাত্র আরও বহুগুণ তৎপর হয়ে উঠবে। তখন সমস্যায় পড়তে পারে রানা, যদি লোকটা জানতে পারে লাল স্ট্রাইপ দেয়া সাদা ব্রীফকেসটার আসল মালিক স্বয়ং গার্সিয়া। ফাঁসটা তখন শক্ত হয়েই এঁটে বসবে রানার গলায়।

এক সমস্যা আরেক সমস্যা ডেকে আনবে। ডিটেকটিভ যখন প্রশ্ন করবে মৃত এক ক্রিমিন্যালের ব্রীফকেসের খোঁজ তুমি জানলে কি করে? কেন ওটার ব্যাপারে মিথ্যে বলেছিলে? জবাব দেয়া কঠিন হয়ে পড়বে। মাসটাঙ, ক্যারাভ্যান আর গার্সিয়ার লাশের সাথে জড়িত থাকার ব্যাপারে যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে রানা, সব বিফলে যাবে। এখানে যে জন্যে আসা, তা ছেড়ে তখন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লাগতে হবে ওকে। কি ভাবে তা করবে ও? রানা নিজেই তো জানে না ওকে এর সাথে ফাঁসানো হয়েছে, না ঘটনাচক্রের শিকার হয়েছে ও।

যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা, সুতো ধরে ডান কোয়েল ওর কাছে পৌঁছার আগেই। মৃদু 'খুক্' কাশির শব্দে সচকিত হয়ে ঘুরে তাকাল ও। রিকি দাঁড়িয়ে আছে চার হাতের মধ্যে। 'ভেবেছিলাম ঘুমিয়ে পড়েছেন বুঝি,' চোখাচোখি হতে বলল যুবক।

'বোসো,' ইঙ্গিতে কাছের ম্যাট্রেসটা দেখাল রানা। 'কথা আছে।'

'গিয়েছিলেন এয়ারপোর্ট?' বসতে বসতে চাপা কণ্ঠে বলল সে। 'কিছু পাওয়া গেল লকারে?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।'

'কি, টাকা-পয়সা নাকি?' চক্‌চক্‌ করে উঠল ওর চোখ।

'একটা ঠিকানা।'

'ব্যস্?' বেশ বিস্মিত হলো সে। 'একটা ঠিকানা রাখার জন্যে লকার ব্যবহার করেছে গার্সিয়া!'

'নিশ্চই অনেক দামী ঠিকানা,' আনমনে মন্তব্য করল ও। 'শেলডন কিসের নাম, বলতে পারো?'

'শেলডন? একটা দ্বীপের নাম শেলডন জানি।'

আগ্রহী হয়ে উঠে বসল ও। 'তাই হবে খুব সম্ভব। কোথায় দ্বীপটা?'

'দশ মাইল দক্ষিণে,' মুখ ঘুরিয়ে খোলা সাগর দেখাল যুবক। 'সাগরের মধ্যে কোথাও, চিনি না। সেই শেলডনই তো, না অন্য কিছু?'

'কি আছে ওখানে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'কিছু না। পাথরের ন্যাড়া এক দ্বীপ। পাখি ছাড়া কিছু নেই। নিনা মাঝেমধ্যে ওখায় যায় সাঁতার কাটতে।'

ঘাড়ের পেশী শক্ত হয়ে গেল ওর। 'নিনা?'

'হ্যাঁ।' রানার গলার স্বর হঠাৎ পাল্টে গেছে টের পেয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রিকির চাউনি। 'কেন?'

'নিয়মিত যায় ও?'

'না, মাঝে মাঝে।'

'একা যায়?'

'আমি যতবার দেখেছি, একাই গেছে ওই বোট নিয়ে,' জেটিতে বাঁধা মোটর বোটটা দেখাল সে। চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'সেই সর্বনাশা বোট।'

'আমিও সেরকমই অনুমান করেছি,' নরম সুরে বলল রানা। 'শেলডনে শেষ কবে গেছে মেয়েটা?'

একটু ভাবল ও। 'না, মনে পড়ছে না। এক কি দেড়মাস আগে সম্ভবত গিয়েছিল, খেয়াল নেই।'

'ফানেল কি বলতে পারো?' ছেলেটাকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে যোগ করল, 'শেলডনের সাথে ফানেলের হয়তো কোন সম্পর্ক আছে।'

'বলতে পারি না। নিনা জানে হয়তো, জিজ্ঞেস করে...'

'না!' চাপা কণ্ঠে প্রায় ধমকে উঠল ও। 'এ ব্যাপারে কাউকেই কিছু জিজ্ঞেস করবে না তুমি। একটা শব্দও উচ্চারণ করবে না।'

'আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল দু'জনেই। ওদের সামনের বালিতে ছায়া ফেলে একঝাঁক নিশাচর পাখি উড়ে গেল মনের আনন্দে ডাকতে ডাকতে।

'কার্লো যায় শেলডনে?'

'দেখিনি কোনদিন।' একটু চুপ করে আবার বলল রিকি, 'আপনাকে মনে ধরেছে কার্লোর। খুব খুশি হয়েছে আপনাকে পেয়ে। কিন্তু আমার কোন লাভ হলো না।'

কথাটা বলার মধ্যে আক্ষেপ ছিল বুঝতে পেরে ঘুরে তাকাল রানা। 'অর্থাৎ?'

'ভেবেছিলাম আমার মাধ্যমে আপনার মত এত নামী একজন সাঁতারু পেয়ে হয়তো খুশি হবে লোকটা আমার ওপর, কিন্তু এখন দেখছি ফল হয়েছে উল্টো।'

'কি রকম?' নিরাসক্ত গলায় বলল ও।

'ওর দুর্ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে গেছে। সহ্যই করতে পারছে না আমাকে, সামান্যতেই যা-তা বলে।'

চুপ করে থাকল রানা।

গভীর রাতে বিছানা ছাড়ল ও নিঃশব্দে। আড়াইটার মত বাজে। অনেক আগেই নিথর হয়ে পড়েছে রেস্টের জীবন, কেউ জেগে নেই। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য না থাকলে এতরাতে জেগে থাকার কথাও নয় কারও।

ঘরের আলো জ্বালল না ও, জানালা দিয়ে প্রচুর চাঁদের আলো আসছে, প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। ওয়ালেটে সামান্য কিছু রেখে বাকি সব টাকা, ক্রেডিট কার্ড, আইডি ইত্যাদি যা যা ছিল, সব বের করল। সাঙ্কেতিক বার্তা লেখা কার্ডটাও রাখল ওর সাথে, তারপর প্রিয় সঙ্গী ওয়ালথার, পাসপোর্ট সবকিছু ভরল একটা প্লাস্টিক প্যাকেটে।

ওটা তোয়ালে দিয়ে মুড়ে খুব সাবধানে রুমের দরজা খুলল ও, ভূতের মত নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল, কান পাতল। চোখ হাজার গুণ সতর্ক। ঝাড়া দু'মিনিট জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ও, নিশ্চিত হয়ে চেপে রাখা দম ছাড়ল একটু এক করে। মূল রেস্ট বিল্ডিঙের দিকে তাকাল, কার্লোর নাক ডাকার আওয়াজ ছাড়

প্রাণের কোন সাড়াই নেই ওখানে।

বাড়তি সতর্কতা হিসেবে নিজের রুমের দেয়াল ঘেঁষে স্টাফ কোয়ার্টারের পিছনে চলে এল ও, কোনাকুনি পা চালাল নিঃশব্দে। একশো গজমত গিয়ে থামল, এক সাইপ্রেস গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল। এবার ঘড়ি ধরে পুরো পাঁচ মিনিট ব্যয় করল রানা। না, কোথাও বিন্দুমাত্র নড়াচড়া নেই।

নিশ্চিন্তমনে ওখানেই হাতের প্যাকেটটা বালির নিচে পুঁতে রাখল। কাজ শেষ হতে আগে যেমন ছিল, বালি সরিয়ে সরিয়ে তেমনি সমান করে দিল। যদিও তার বিশেষ দরকার ছিল না। এতদূরে কেউ এমনিতেই আসে না, তারওপর বালির নড়াচড়াও থেমে নেই, বাতাসের কারণে প্রতিমুহূর্তেই নড়ছে, আপনা থেকেই সমান হয়ে যায় কোথাও উঁচুনিচু থাকলে। কিন্তু রানা বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেয়ার পক্ষপাতী নয়।

সন্তুষ্ট হয়ে কাছের একটা ঝোপের ডাল ভেঙে ওটা দিয়ে পায়ের ছাপ মুছতে মুছতে ফিরে চলল ও। এই সামান্য কাজেই এক ঘণ্টা লেগে গেল। রুমে ঢোকার আগে দরজার সামনে আরও দুই মিনিট খরচ করল। তারপর দরজা লাগিয়ে শুয়ে পড়ল। মুখে সন্তুষ্টির হাসি।

যে মুহূর্তে রানা নিশ্চিত হয়েছে শেভ্রোলে গাড়িটা ওকেই অনুসরণ করে এসেছে, তখনই এ কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ ওর দৃঢ় বিশ্বাস, এখন যে কোন মুহূর্তে ওর রুম সার্চ করা হবে। গার্সিয়ার ব্রীফকেস থেকে ও কি উদ্ধার করেছে, জানার জন্যে কেউ না কেউ নিশ্চই ঢুঁ মারবে ওর অনুপস্থিতিতে। এবার আসুক, দেখে যাক কি ঘোড়ার ডিম আছে।

ওটা তো বটেই, নিজের আসল পরিচয়ও এখনই কাউকে জানতে দিতে চায় না রানা। তাতে আসল কাজ উদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই ওগুলোও সরিয়ে ফেলেছে।

একটু দেরিতে ভাঙল ওর ঘুম। ততক্ষণে দিনের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে রেস্টের। নাস্তা খেয়ে নিয়েছে সবাই. কাজেই একাই বসতে হলো রানাকে। কার্লো বাজারে গেছে। বারম্যান জো নাস্তা নিয়ে এল ওর. খাতির জমানোর খানিক ব্যর্থ চেষ্টা করে সরে পড়ল। বুঝল কিছু ভাবনায় পড়েছে লোকটা।

পর পর দু'কাপ কফি খেয়ে সিগারেট ধরাল রানা। 'রিকি কোথায় গেছে, জো?'

'একটু আগে নাস্তা খেয়ে গেছে, বস্। কোথায় গেছে বলে যায়নি।'

'আমি বীচে আছি,' আসন ছাড়তে ছাড়তে বলল ও। 'পেডাল বোটগুলো চেক করতে হবে।'

কালোর মধ্যে মুক্তোর মত সাদা দাঁত ঝিকিয়ে উঠল জোর। 'রাইট, বস্, তাই করুন। কার্লো যে হারে আপনার বিজ্ঞাপন করে বেড়াচ্ছে, তাতে খুব শিগ্গিরি হাট-বসে যাবে এখানে শহরের সব হবু চ্যাম্পিয়নদের।' রানা বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল, 'আপনার জন্যে ড্রিঙ্কস পাঠাব, বস্?'

'পরে, থ্যাঙ্কস।' বেরিয়ে এল ও কিচেন থেকে, নিনা আর শেলডনের মধ্যে যোগাযোগটা কিসের ভাবতে ভাবতে বীচের দিকে এগোল।

অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছে ও, এমন সময় পিছনে একটা গাড়ির শব্দ উঠতে ঘুরে তাকাল। পরক্ষণে চমকে উঠল। সাদা রঙের মার্সিডিজ একটা—এসএল ওয়ান

এইটি। রাজকীয় ভঙ্গিতে ঘুরল গাড়িটা, ধীরগতিতে পার্কিং লটের এক মাথা় দাঁড়িয়ে পড়ল।

সব ভুলে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল রানা। ভেতরে ভেতরে সতর্ক, একই সাথে অস্বস্তিও লেগে উঠল। একই রঙের, একই মডেলের এক মার্সিডিজ তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেদিনের সেই রহস্যময় মেয়েটিকে, দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পেল। এটাই কি সেই গাড়ি? কিন্তু···

প্রথমে নামল চালক। লোকটাকে দেখে চোখ আরও কুঁচকে উঠল ওর। কাল এই লোকটাই···? প্রশস্ত কাঁধ তার, খাটো, গাট্টাগোট্টা। চল্লিশের মত বয়স, চামড়া তামাটে। মাথায় স্লাউচ হ্যাট। তার আকার-গঠন, চলন ইত্যাদি দেখে কেন যেন বুনো শুয়োরের কথা মনে পড়ল রানার। অনেকটা সে রকমই লাগে দেখতে। হেঁটে নয়, টেনিস বলের মত বাম্প করতে করতে গাড়ি ঘুরে এসে এ পাশের ব্যাক ডোর খুলে দিল সে।

প্রথমে হাই হীল পরা দুটো ফর্সা, চমৎকার পা বের হলো ভেতর থেকে। তারপর পায়ের মালিক, এক অপরূপা। নিনার মতই আরেক সেক্স বম্ব। বেশ লম্বা, পাঁচ ফুট সাতের কম হবে না। সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেখা গেল চালকের চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক উঁচু মেয়েটি। তাকে সসম্মানে নড করল চালক, দরজা বন্ধ করে নিজের আসনে গিয়ে বসেই ছেড়ে দিল গাড়ি।

কাছে গিয়ে দু'জনকেই দেখার ইচ্ছে জেগেছিল, অনেক কষ্টে দমন করেছে রানা। তাতে বিপদ ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এরাই যদি সেই জুটি হয়ে থাকে, ওকে কৌতূহলী হয়ে উঠতে দেখলে সতর্ক হয়ে যেত। মেয়েটিকে ড্রেসিঙ রুমে ঢুকতে দেখে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সিগারেট ফেলে আরেকটা ধরাল ও, মাথার মধ্যে ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে।

ধৈর্য ধরে আধঘণ্টা ধীরে কাটাল রানা, তারপর রেস্টে ফিরে এল। বারে যাওয়ার পথে মেয়েটিকে খুঁজল, কিন্তু দেখা পেল না। বারে গ্লাস ধোয়ামোছার কাজে ব্যস্ত ছিল জো, কাজের ফাঁকে গুন গুন করে গান গাইছে। রানাকে ঢুকতে দেখে হাসল। 'হয়ে গেল, বস্?'

'আপাতত। একটা ঠাণ্ডা কোক দাও,' বার স্টুলে বসে পড়ল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জিনিস নিয়ে হাজির জো, তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঠাণ্ডা কোকে চুমুক দিল। 'জো?'

'জি, বস্?'

'বাইরে সাদা মার্সিডিজ দেখলাম একটু আগে, এক মেয়েকে নামিয়ে দিয়ে গেল। গাড়িটা কার, জানো?'

'নিশ্চই! আমাদের রেগুলার কাস্টমার, মিস্টার চাক জোনসের।'

'চাক জোনস?' আরেক ঢোক চালান করল রানা।

'রাইট, বস্,' চোখ পাকাল সে। 'বিরাট বড়লোক! কোটিপতি।'

'কি করেন ভদ্রলোক?'

'ব্যবসা, আবার কি! বললাম না কোটিপতি?'

'হুঁম!'

'পাইন স্ট্রীটে ভদ্রলোকের যা একখানা বাড়ি আছে না, বস্, দেখলে মাথা ঘুরে যাবে আপনার।'

'গাড়িতে একটা মেয়ে এসেছে, সে কে?'

'মিসেস জোনস,' বলেই গলা খাদে নামিয়ে ফেলল জো। 'ম্যান ঈটার, বস্, সাবধান থাকবেন। যদি আপনাকে একবার মহিলার মনে লেগেছে, তাহলে, হুঁ হুঁ!' চোখ মটকে ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগল লোকটা।

'তাই নাকি?'

ওপরে-নিচে মাথা দোলাল সে।

'যে লোকটা পৌঁছে দিয়ে গেল, সে কে?'

'মিস্টার জোনসের শোফার, কোর্টেজ। মেক্স।'

'মিস্টার জোনস আসেন না?'

'হ্যাঁ, আসেন। কম। ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যস্ত থাকেন।'

কোক শেষ করে সিগারেট ধরাল রানা। এরমধ্যে আরও কিছু গাড়ি জমে গেছে বাইরের লটে, পয়সাওয়ালারা আসতে শুরু করেছে রোদে গা মেলে, অথবা ছাতার নিচে সময় কাটাতে। কাছে থেকে মিসেস জোনসকে দেখার একটা বুদ্ধি আঁটল রানা, রুমে এসে কাপড় পাল্টে সুইম স্যুট পরে তক্ষুণি বেরিয়ে এল আবার। বীচের দিকে এগোল।

এরমধ্যে বেশ কিছু ছাতা দখল হয়ে গেছে, এগোবার ফাঁকে সন্তর্পণে পথের দু'দিকে দেখতে দেখতে এগোল ও। বাঁ দিকের আট নম্বর ছাতার নিচে শুয়ে আছে মহিলা, হাতে ম্যাগাজিন। চোখে বড় এক সান গ্লাস। খাটো নাক, ছোট ছোট ঠোঁট, থুতনিটা সরু। ঠোঁটে টকটকে লাল স্টিক ঘষেছে বেশ যত্নের সাথে। মহিলা সেই ভাগ্যবানদের দলে পড়ে, যাদের বয়স পঞ্চাশেও ত্রিশ পার হতে পারে না, মানে বোঝা যায় না চেহারা দেখে।

এর বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে যে কোন একটা হবে অনুমান করল রানা। সে রাতের একাংশ দেখা মুখটার সাথে একে মেলাতে চাইল। মনে হলো মিলে গেছে, অনেকটাই। সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল রানা, ম্যাগাজিন সরিয়ে তাকাল মহিলা। নড়াচড়া টের পেয়ে ও-ও তাকাল।

'হ্যালো!' ভুবন ভোলানো হাসি দিল রানা।

'হাই!' দ্রুত উঠে বসল মেয়েটি। এতই দ্রুত যে ঝাঁকি খেয়ে সরু ব্রার ওপর দিয়ে একটা বুক প্রায় বেরিয়ে আসার জোগাড়।

'আমি মাসুদ রানা। এখানকার নতুন লাইফগার্ড।'

'ও হ্যালো, মাসুদ রানা!' মুচকে হাসল সে। 'আমি পলা জোনস। এখানে সবার কাছে মিসেস জোনস নামে পরিচিত।'

হাসি আরও চওড়া হলো ওর। 'আপনাদের দু'জনের কথা শুনেছি আমি। কার্লোর রেগুলার কাস্টমার, বিশেষ করে আপনি।'

'আপনি সাঁতার জানেন তো? আগে যে লাইফগার্ড ছোকরা ছিল, সে সাঁতার শেখাবার বদলে পানিতে নেমে কচি কচি মেয়েদের গায়ে হাত বোলাতে পছন্দ করত। আপনি···?'

'সেটা জানতে হলে আমার সাথে পানিতে নামতে হবে আপনাকে, মিসেস জোনস।'

'শুধু পলা, প্লীজ!'

চোখেমুখে ষড়যন্ত্রের ভাব ফোটাল ও। 'মালিককে ওভাররাইড করা হবে না তাতে? সে কি এ অনুমতি পেয়েছে?'

'ওর মত এক বুড়ো দানবকে দেব এই অনুমতি? প্রশ্নই আসে না। কেন দেব না, তা না বোঝার মত গর্দভ নিশ্চই নন আপনি, মিস্টার রানা?'

'কুইট ''মিস্টার'', পলা, শুধু রানা।'

ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল মেয়েটি। 'সাঁতার তাহলে সত্যিই জানো তুমি?'

শ্রাগ করল রানা। 'পরীক্ষা প্রার্থনীয়।' এই কি সেই মেয়ে? দ্বিধা যায় না ওর কিছুতেই। কিন্তু এতবড় এক ধনী লোকের স্ত্রী কেন এসব ছোটখাট নোংরা কাজে, খুনোখুনিতে জড়াবে নিজেকে? নাকি এ পথেই পয়সা করেছে চাক জোনস? স্বভাব ছাড়তে পারেনি? কোন ভুল হচ্ছে না তো ওর?

কিন্তু তাহলে সাদা মার্সিডিজ, ওটার চওড়া কাঁধের ড্রাইভার লোকটা, এসবের ব্যাখ্যা কি?

'আজ থাক তাহলে,' বলল পলা। 'আরেকদিন।'

'বেশ।'

দুপুরে শাওয়ার সারতে রূমে এল রানা। ভেতরে ঢোকার সময় প্রমাণ হয়ে গেল ওর ধারণা কত অভ্রান্ত ছিল। যাওয়ার সময় দরজার ফাঁকে গুঁজে রেখে যাওয়া ছোট্ট কাগজের টুকরোটা নিচে পড়ে থাকতে দেখে মৃদু হাসল ও।

কেউ ঢুকেছিল ঘরে।

গোসল সেরে ধীরেসুস্থে লাঞ্চের জন্যে তৈরি হলো রানা। রূমের ব্যাপারে আর সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন মনে করল না। যে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল, হয়েছে। আর দরকার নেই। কিচেনে চলে এল। সবে খেতে বসেছে তখন অন্যরা।

'কি খবর, রানা?' হেঁকে উঠল কার্লো। 'এতক্ষণ পর্যন্ত কি করলে বাঁচে?'

আড়চোখে নিনাকে দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল ও। সে-ও একই কর্ম করছিল। 'পেডাল বোটগুলো চেক করেছি, তোমার দুয়েকজন রেগুলার কাস্টমারের সাথে পরিচিত হয়েছি।'

'আচ্ছা, কে কে?'

'মেইনলি পলা,' নিনার সামনের চেয়ারে বসল রানা।

চোখ কুঁচকে উঠল গরিলার। 'মিসেস জোনসের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

এরপর আর আলাপ জমল না কেন যেন। সবাই নীরবে খেয়ে চলেছে। সবার আগে নিনার খাওয়া শেষ হলো। রানা আসার পর মিনিট দশেক ছিল সে, এর মধ্যে কম করেও বিশবার চোখাচোখি হয়েছে ওর মেয়েটির সাথে। কয়েকবার মিষ্টি হাসিও উপহার দিয়েছে সে রানাকে। হঠাৎ করে এত সদয় কেন হলো মেয়েটি ভেবে পেল না ও।

ঘণ্টাখানেক পর রানার রুমে এল রিকি। চেয়ারে বসল পায়ের ওপর পা তুলে। 'খাওয়ার সময় আপনাকে খুব চিন্তিত মনে হয়েছে। খোঁজ নিতে এলাম কোন সমস্যা হয়েছে কি না।'

'সমস্যা তো সঙ্গে করে নিয়েই এসেছি,' মৃদু হেসে রানা বলল। 'তুমি কোথায় ছিলে দুপুর পর্যন্ত?'

'টাউনে গিয়েছিলাম গিটার টিউন করিয়ে আনতে।' খানিক চুপ করে থাকল রিকি। 'একটা জরুরী কথা আছে।'

ওর মুখের দিকে তাকাল রানা। 'বলো।'

'টাউনে কার্লো আর ফের্নান্দোকে কথা বলতে দেখেছি।'

'ফের্নান্দো?'

'মিসেস জোনসের শোফার, ফের্নান্দো কোর্টেজ।'

'চিনেছি। তারপর?'

'দু'জনকেই বেশ উত্তেজিত মনে হয়েছে।'

'ওরা তোমাকে দেখেছে?' প্রশ্ন করল ও।

'না। ওদের দেখেই লুকিয়ে পড়েছিলাম।'

'কতক্ষণ কথা হয়েছে দু'জনের?'

'তা প্রায় আধঘণ্টা। শেষের দিকে কার্লোকে খুব চিন্তিত দেখা গেছে।'

মাথা দোলাল রানা। 'বুঝতে পেরেছি কি নিয়ে কথা বলছিল ওরা। ফের্নান্দো লোকটার নিজের কোন গাড়ি আছে কি না বলতে পারো?'

'আছে।'

'সাদার ওপর নীল স্ট্রাইপড্ শেভ্রোলে?'

বিস্ময়ে চোখ কুঁচকে উঠল রিকির। 'হ্যাঁ। আপনি জানলেন কি করে?'

'ওর ব্যাপারে কি জানো তুমি, রিকি?' প্রশ্ন করল রানা।

'কার্লোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কয়েক বছর ধরে মিসেস জোনসের গাড়ি চালাচ্ছে। মাঝেমধ্যে রাতে একা আসে লোকটা, অনেক রাত পর্যন্ত কার্লোর সাথে তাস খেলে,' থেমে বলার আরও কিছু আছে কি না ভাবল যুবক, তারপর মাথা দোলাল। 'এই পর্যন্তই জানি।'

'ওকে, রিকি। থ্যাঙ্কস। আমাদের মধ্যে যে সব আলোচনা হয়, ভুলেও সে ব্যাপারে কারও সামনে মুখ খুলো না যেন।'

মাথা কাত করে সায় দিল সে।

রাত এগারোটা। সুইম স্যুট পরে কাঁধে তোয়ালে নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। অসহ্য গরম পড়েছে। একটু সাঁতার না কাটলে ঘুম আসবে না। ধীর পায়ে লেগুনের দিকে চলল ও।

মূল রেস্ট বিল্ডিঙ ছেড়ে বড়জোর বিশ কদম এগিয়েছে, হঠাৎ সামনেই একটা ছায়া সাঁৎ করে সরে গেল দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা গাছের আড়ালে চলে গেছে ছায়াটা। চোখ কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে থাকল ও। কে হতে পারে? অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। চাঁদ উঠতে দেরি আছে, কাজেই ছায়ার পরিচয়

জানতে হলে হয় ওকে কাছে যেতে হবে ওটার, নয়তো লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় আছে কি না ভাবতে লাগল রানা। সরে নিজেও এক পাম গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

মৃদু ক্লিক শব্দ শুনল, একই সাথে একটা আগুনের সরু শিখা দেখল, তার আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল নিনাকে—সিগারেট ধরাচ্ছে। কালো ফ্রেমে বন্দী সুন্দর মুখটা আরও বুনো লাগছে লাইটারের আলোয়। কপাল কুঁচকে উঠল রানার, আড়াল ছেড়ে পথে উঠে এল।

আলোটা নিভে গেছে। তার বদলে টকটকে লাল একটা বিন্দু জ্বলজ্বল করছে। এগিয়ে আসছে। কয়েক হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল মেয়েটা, নাকে তার গায়ের কড়া সেন্টের গন্ধ পেল রানা। কেমন এক মাদকতা আছে ওতে, তারওপর পরিবেশটাও তেমনি। অন্ধকার, নির্জনে একা এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতীর সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে আছে রানা, নাকে তার দেহের মন পাগল করা মিষ্টি গন্ধ, মাথার ওপর মৃদু বাতাসে সরসর করছে গাছের পাতা। বুকের মধ্যে ঢিব্ ঢিব্ করছে ওর।

তিন হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল নিনা, ঘন ঘন টান দিচ্ছে সিগারেটে। তার ছায়া ছায়া কাঠামোর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

'অনেকক্ষণ থেকে তোমার অপেক্ষায় ছিলাম,' সুরেলা, চাপা গলায় বলে উঠল মেয়েটি, মুখে জ্বলে উঠল আগুনের বিন্দু।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল ও।

'তোমার সাথে কিছু কথা আছে।'

'বলে যাও,' রানা বলল। 'শ্রোতা হিসেবে যথেষ্ট সুনাম আছে আমার।'

সিগারেট ফেলে দিল নিনা। 'এখানে নয়। আমার সাথে এসো,' ডান হাত বাড়াল। 'তোমার হাত দাও,' প্রায় হুকুমের সুরে বলে নিজেই এগিয়ে এসে মুঠো করে ধরল ওর হাত। আলতো করে টানল। 'এসো।'

মেয়েটির স্পর্শে শিরায় শিরায় গরম রক্তের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল রানার। 'কোথায়?'

'এসোই না!' আদুরে গলায় বলল নিনা। 'বীচের ও মাথায় গিয়ে বসি। ওখানে বসে বলব।'

'কি…?'

চাপা হাসি দিল মেয়েটি। 'এত ব্যস্ত কেন? এই না বললে শ্রোতা হিসেবে যথেষ্ট সুনাম আছে তোমার?'

'তা আছে। সেই সাথে কাউকে অন্ধ অনুসরণ না করার দুর্নামও আছে,' বলল ও। 'আমি…'

'আস্তে! কেউ শুনে ফেলতে পারে।'

এগিয়ে চলল ওরা। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে—চাঁদ উঠবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

পথ ছেড়ে বেপথে নিয়ে চলল ওকে মেয়েটি। গাছপালার মধ্যে দিয়ে সরু চ্যানেলটার কাছে এসে থামল। 'এখানে।' হাঁটু গেড়ে বালিতে বসে পড়ল নিনা। রানা তখনই বসল না, ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

'কোথায় গেছে?'

'বাসায়। লনের ঘাস বড় হয়ে গেছে, ওগুলোর বিহিত করতে এ বেলা ছুটি নিয়েছে। কেন?' ঝুঁকে বসল হ্যারিস পা নামিয়ে।

'ঘাস বড় হয়ে গেছে?' যেন জবর আঘাত পেয়েছে, এমন চেহারা হলো তার। 'পাওয়ার মোওয়ার দিয়ে ঘাস কাটছে লনের?'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল সার্জেন্ট। 'পাওয়ার মোওয়ারের কথা বলেছি নাকি?' কৌতুকের সুরে বলল, 'নেইল কাটার দিয়ে কাটছে। তাতে সময় বেশি লাগে, চামড়া ট্যান করার ভাল সুযোগ পাওয়া যায়।'

'দেখো, সার্জ, ঠাট্টা রাখো!' বিরক্তি ফুটল কোয়েলের চেহারায়। 'খুব গরম খবর আছে, বসকে দরকার। কোন সন্দেহ নেই। এই কেসেই প্রমোশন পাব আমি। অকম্মার মত বসে বসে সিগারেট ফুঁকিনি আমি, কাজ করেছি, কাজেই...'

'তুমি আমাকে অকম্মা বলতে চাইছ?' গরম হয়ে উঠল সে।

'না তো!' নিরীহ চেহারা করল কোয়েল। 'তোমাকে নয়, ওকে বলেছি,' নির্ভয়ে আঙুল তুলে কুককে দেখাল। তার এক গ্রেড নিচে সে, অতএব ওদিক থেকে কোন আক্রমণ আসার ভয় নেই। 'শোনো, সার্জ, যখন এ ধরনের মন্তব্য করে বসব রাগের মাথায়, বুঝবে বস্ আর তোমাকে বাদ রেখে করেছি।'

সন্তুষ্ট হলো হ্যারিস। 'বেশ। বলো, কি খবর এনেছ।'

'ন্যাড়া গার্সিয়ার গাড়ি খুঁজে পেয়েছি আমি।'

'রিপোর্ট লিখে ফেলো।'

'তার আগে মনে হয় চীফের সাথে কথা বলে নেয়া দরকার,' ব্যস্ত কণ্ঠে বলল ডিটেকটিভ।

কিন্তু তার ব্যস্ততা বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারল না হ্যারিসের ওপর, কারণ সেই মুহূর্তে তিনটের বদলে ছয়টার রেসে ইয়াং হোপফুলের ওপর বাজি ধরার সিদ্ধান্ত পাকা করতে ব্যস্ত সে। 'থামো! লাফিয়ো না। কোথায় পেয়েছ গাড়িটা?'

'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ তুমি, সার্জ,' বিরক্তি বহুকষ্টে চেপে বলল কোয়েল। 'বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা আমার জন্যে কত গুরুত্বপূর্ণ চীফের সাথে এখনই কথা বলা দরকার আমার।'

'আমিই চীফ,' গম্ভীর হলো সার্জেন্ট। 'বলো, কোথায় পেয়েছ গাড়িটা।'

'সার্জেন্ট, তুমি...'

হুঙ্কার ছাড়ল হ্যারিস। 'কোথায় পেয়েছ?'

তার চেহারা দেখে হাল ছেড়ে দিল ডিটেকটিভ। লোকটা রেগে গেছে, এখন ওর সাথে তর্ক করা অর্থহীন। 'ঠিক আছে, রিপোর্ট লিখছি আমি।'

'পরে। আগে মুখে বলো, কোথায় পেয়েছ?'

'জুনো বীচে। রাস্তার পাশের জঙ্গলে।'

'নিশ্চই তুমি নিজে পাওনি?' বলল সার্জেন্ট।

'ওখানকার এক প্যাট্রলম্যান পেয়েছে,' আস্তে করে বসল কোয়েল হ্যারিসের মুখোমুখি। চেহারায় রাগ রাগ ভাব। 'আমি ফোন করে জেনেছি সব। তার মানে...'

'ক্রেডিটটা তোমার, এই তো? ঠিক আছে, পাবে। এবার লিখে ফেলো গিয়ে,'

রবিন কুকের দিকে ফিরল সার্জেন্ট। 'কুক, এক্ষুণি ল্যাববয় নিয়ে জুনোয় ছোটো। ফটোগ্রাফার নিয়ে যেতে ভুলো না।'

'রাইট, সার্জ,' বই ড্রয়ারে রেখে ছুটল থার্ড গ্রেড।

চোখ কুঁচকে সামনে বসা ডিটেকটিভকে দেখল কেন হ্যারিস। 'কি হলো? বসে রয়েছ যে এখনও? রিপোর্ট...'

'হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হলো, তাই ভাবছি রিপোর্ট একবারেই লিখব। এই কাজটা আগে সেরে আসি।'

'কি?'

'ড্যানি ও' ব্রায়ান নামে নামকরা এক পেনম্যান ছিল গার্সিয়া আর কার্লোর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কার্লো গার্সিয়ার কথা অস্বীকার করেছে, ঠিক আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস ড্যানির মুখ থেকে আমি আসল কথা বের করতে পারব। গার্সিয়া নিশ্চই ওর সাথেও যোগাযোগ করেছে এখানে এসে। ওকে ধরলে আসল খবর জানা যাবে।'

'কার্লো অস্বীকার করেছে, আর তুমি ওকে ছেড়ে দিলে?'

'ওর মত দানবের মুখ থেকে কথা আদায় করা আমার জন্যে কঠিন হত,' স্বীকার করল কোয়েল 'এর বেলায় তা হবে না।'

'যাও, তবে রিপোর্ট লিখে। চীফকে ফোন করছি আমি। খবর পেলে সে আসবে। তাকে ওটা দেখাতে হবে।'

দীর্ঘশ্বাস মোচন করে উঠল ডিটেকটিভ। দশ মিনিট ঝড়ের বেগে টাইপ করে রিপোর্ট শেষ করল, ওটা পড়ে সই করে তুলে দিল সার্জেন্টের হাতে। সে-ও তেমনি তুফান বেগে পড়ল। তারপর একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তোমাকে যদি নিজ চোখে এটা টাইপ করতে না দেখতাম, কোয়েল, ভাবতাম নিশ্চই কোন গাড়লের কাজ এটা। অথবা কোন মানসিক প্রতিবন্ধীর।'

চোখ গরম করে তাকে দেখল সে। 'দুটোর কোনটাই সেকেন্ড গ্রেড ডিক হতে পারে না, সেটা বোঝার মত বুদ্ধিও তোমার নেই, সার্জ! ভারি অবাক করলে তুমি।' একটু থামল সে। 'যেদিন আমি এখানকার পুলিস চীফ হব, হ্যারিস, তোমাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেব।'

ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে থাকল কেন হ্যারিস। 'যেদিন তুমি এখানকার পুলিস চীফ হবে, কোয়েল,' একঘেয়ে কণ্ঠে তাকে অনুকরণ করল, 'সেদিন আমি চাঁদের দশম অভিবাসী হব।'

*

শহরের এক প্রান্তে বেশ পুরানো এক অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের ছয়তলায় দুই রুমের ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে বুড়ো ড্যানি ও' ব্রায়ান। আইরিশ। বয়স তেয়াত্তর। এক্সপার্ট জালিয়াত ছিল এককালে, পাসপোর্ট, দলিল ইত্যাদি জাল করত নিখুঁতভাবে।

লম্বা ক্যারিয়ার জীবনে মাত্র একবার ধরা পড়েছে সে, জেল খেটেছে পাঁচ বছর। তারপর ভাল হয়ে গেছে। টাকাকড়ি যা কামিয়েছে, এখন শেষ বয়সে তাই ভেঙে খাচ্ছে। একেবারে অনাড়ম্বর জীবন। তবে ওর মধ্যেও একটা বিলাসিতা আছে। প্রতি রবিবার সন্ধের পর শহরের দুই পতিতা আসে তার ঘরে, তার চোখের সামনে, কার্পেটে আদিম খেলার অভিনয় করে ঘণ্টাখানেক ধরে। পানীয়ের গ্লাস হাতে বসে

।।।। সে দৃশ্য দেখে ও' ব্রায়ান, নিজে শেষ করে ওই সুখ উপভোগ করেছে, তাই ।।।বে।

দরজায় নক শুনে উঠল সে। কে এল এই অসময়ে? ভাবতে ভাবতে এগোল, এখনই মেয়েরা আসতে পারে না, ওরা আরও ঘণ্টাখানেক পর আসবে। রুটিন টাইম। তাহলে কে? আগন্তুককে দেখে চমকে উঠল বৃদ্ধ। 'মিস্টার কোয়েল! কী আশ্চর্য, আপনি? কেমন আছেন? মিসেস ভাল তো?'

গটমট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ডিটেকটিভ। একটা চেয়ারে বসে ব্রায়ানকেও বসতে বলল ইশারায়। 'তেল মারা বন্ধ করো। কথা আছে।'

মুখে ছিপি এঁটে বসল সে। 'বলুন।'

'কয়েকদিন আগে ন্যাড়া গার্সিয়া এসেছিল পাম বীচে। তিনদিন থেকে গেছে। আমি জানতে চাই কেন, কার কাছে এসেছিল লোকটা।'

'গার্সিয়া!' হেলান দিয়ে বসল ও' ব্রায়ান, বুড়ো চোখে বিস্ময়। 'এখানে এসেছে এবং তিনদিন থেকেও গেছে? কী আশ্চর্য, আমার সাথে একবার দেখা পর্যন্ত করল না!' আপনমনে মাথা দোলাল। 'এই হয় শেষ পর্যন্ত, এক্স ক্রিমিন্যালরা নিঃসঙ্গ হয়ে…' কোয়েলের ঠোঁটের কোণে পুলিসী কঠোর হাসি ফুটতে দেখে থেমে গেল সে।

'আমি তোমার সাথে গল্প করতে আসিনি, ও' ব্রায়ান, ক্রিমিন্যালদের শেষ জীবনের জীবনযাপন পদ্ধতিও জানতে আসিনি, এসেছি এক ক্রিমিন্যালের খবর জানতে। আমার প্রশ্নের সোজা উত্তর দাও, নইলে অনেক বড় সমস্যায় পড়বে তুমি।'

কিন্তু অনেক পুরানো এবং অভিজ্ঞ পাপী লোকটা, এত সহজে কবুল করতে রাজি নয়। 'আমার বিরুদ্ধে কিছুই নেই আপনার হাতে, অফিসার,' হাসিমুখে বলল বৃদ্ধ। 'আমি জানি না গার্সিয়ার খবর।'

'আমি কালা নই, কি বলেছ কানে গেছে। এবার আমার কথা কান খুলে শোনো। আজ রোববার, একটু পর তোমার দুই ভাড়াটে বেশ্যা আসছে এখানে। ওদের আমি ধরে নিয়ে যাব, ওদের দালালদের জানিয়ে দেব তুমি পয়সা খেয়ে পুলিসে তুলে দিয়েছ ওদের। লোকগুলোকে চেনো তো? একেকটা পাক্কা খুনী। এরপর কি হবে বুঝতে কোন অসুবিধে হচ্ছে তোমার?' থামল কোয়েল।

চোখ পিট্ পিট্ করে উঠল ও' ব্রায়ানের। চেহারার রঙ বদলে গেছে। 'আমি বুঝতে পারছি না…'

'আমি বুঝেছি,' বাধা দিয়ে বলল সে। 'তুমি আমার সময় নষ্ট করছ। ওকে, ব্রায়ান, সীট টাইট। আমি মেয়ে দুটোর জন্যে অপেক্ষা করব।'

'দেখুন, আমি কিছুই করিনি।'

'আমি বলিনি তুমি করেছ।'

'আমি বুড়ো মানুষ, কেন শুধু শুধু ঝামেলায় ফেলতে চেষ্টা করছেন, মিস্টার কোয়েল?'

'যে খবর জানতে চাইছি, জানা হলেই চলে যাব আমি, কোন ঝামেলা হওয়ার প্রশ্নই আসে না। যদি তুমি সহযোগিতা না করো, তাহলে…' থেমে শ্রাগ করল

ডিটেকটিভ।

হার স্বীকার করল আইরিশ। কয়েক মিনিট পর মুখ খুলল। 'ঠিক আছে। কি জানতে চান, বলুন।'

'এই তো ভাল মানুষের মত কথা। বুদ্ধি আছে তোমার।'

'সত্যি বললে আমার পিছু ছেড়ে দেবেন কথা দিচ্ছেন?'

'অবশ্যই!' জোর দিয়ে বলল ডান কোয়েল। 'তোমার পিছু নিয়ে কেন অনর্থক সময় নষ্ট করতে যাব কাজ হয়ে গেলে? বলো এবার, গার্সিয়া এসেছিল তোমার এখানে?'

'হ্যাঁ। আগে কার্লোর কাছে গিয়েছিল সাহায্য চাইতে, কিন্তু করেনি সে। তাই আমার কাছে আসে।'

'কেন, কি সাহায্য?'

'ক্যাশ দশ হাজার,' বলল ও' ব্রায়ান। 'বলছিল, একটা বোট ভাড়া করতে টাকাটা খুব জরুরী দরকার। অল্পদিনে শোধ করে দেবে।'

'বোট ভাড়া করবে কেন?' ঝুঁকে বসল কোয়েল।

ইতস্তত করতে লাগল বৃদ্ধ।

'কেন?'

'বলছিল কিউবায় যেতে হবে, তাই।'

'স্মাগলিঙ?' আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়ে চলল অফিসারের।

'হ্যাঁ।'

'কি মাল?'

'তা জিজ্ঞেস করিনি,' মাথা দোলাল আইরিশ। 'ওসবে আমি আগ্রহী নই। তবে শুনেছি অনেক কিছু নিয়ে যায় সে ও দেশে।'

'আচ্ছা, তারপর?'

'আমি টাকা দেইনি। এত টাকা কোথায় পাব?'

'কার্লোর কাছেও টাকা…'

'না। ওর কাছে গিয়েছিল ওর বোট ধার চাইতে।'

কিছু ভাবল ডিটেকটিভ। 'ভেরো বীচে গার্সিয়া কি করত?'

'ঠিক বলতে পারব না।'

'ও যে মারা গেছে তা জানো?'

চোখ তুলে তাকে দেখল বৃদ্ধ। 'শুনেছি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।'

'কথাটা মিথ্যে নয়।' একটু বিরতি দিল কোয়েল। 'টাক আড়াল করতে লোকটা সবসময় দামী দামী, প্রায় আসলের মত দেখতে নকল চুল পরত, নিজের বয়স কম বোঝাতে চাইত। অর্থাৎ মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ ছিল তার। বর্তমান বান্ধবী কে গার্সিয়ার, মানে, কে ছিল অ্যাকচুয়ালি!'

'ওর সাথে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, মিস্টার কোয়েল। মেয়েমানুষ নিয়ে কখনও আলাপ করিনি, বলতে পারব না।'

চাউনি শীতল হয়ে উঠল তার। 'প্রশ্নটা আমি আরেকবার করছি।'

জিভ বের করে শুকনো ঠোঁট চাটল লোকটা। 'হানা ল্যাঙলি।'

‘থাকে কোথায়?’

‘সেইন্ট লুসি।’

‘ঠিকানা?’

‘জানি না।’

তার চোখ দেখে কোয়েল বুঝল সত্যি কথাই বলছে সে এবার। ‘তোমার ফোন ইনডেক্সটা দেখি।’

পাওয়া গেল মেয়েটার নাম-ঠিকানা। বই বন্ধ করে উঠল ডিটেকটিভ। দরজার দিকে এগোল। কি মনে হতে নবে হাত রেখে ঘুরে তাকাল। ‘আমি পৌঁছে যদি মেয়েটাকে বাসায় না পাই, বুঝব তুমি সতর্ক করে দিয়েছ। সে ক্ষেত্রে আমার মৌখিক ওয়াদা বাতিল হয়ে যাবে জেনো। কাজেই প্রার্থনা করো যেন ব্যক্তিগত কাজেও সে বের না হয়, অন্তত কালকের দিনটা।’

বড় এক ঢোক গিলল ও’ ব্রায়ান। আসলেই তাই করতে যাচ্ছিল সে। ‘ওকে সতর্ক করার কোন দায় পড়েনি আমার।’

বেরিয়ে গেল ডান কোয়েল। খুশি আবার চিন্তিতও। সেইন্ট লুসি আরেক কাউন্টি। আলাদা জুরিসডিকশন। ওখানে নিজের ইচ্ছেমত কাজ করা যাবে কি না সন্দেহ।

পাম বীচ পুলিস চীফ, ক্যাপ্টেন রিচার্ড অ্যাশক্রফট লম্বায় ছয় ফুট চার। পাশেও কম নয়। বয়স চল্লিশের নিচে। দারুণ দক্ষতা দেখিয়ে যথেষ্ট আগেই ক্যাপ্টেন হয়েছে সে। নইলে পঞ্চাশের নিচে বা কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত এই র‍্যাঙ্ক পাওয়া প্রায় অসম্ভব এ দেশে।

শেষ বিকেলে অফিসে পৌঁছল সে সার্জেন্ট কেন হ্যারিসের ফোন পেয়ে। এসেই সোজা ঢুকে পড়ল ডিটেকটিভদের আলাদা অংশে। এরমধ্যে গার্সিয়ার গাড়ি পরীক্ষা করে ফিরে এসেছে রবিন কুক। রিপোর্ট টাইপ করছে সে। ওদিকে সার্জেন্টের টেবিলে বসে তার সাথে তদন্তের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে হোমিসাইড সেকশনের ইন-চার্জ, ফ্রেড হেস।

‘বলো, হেস,’ একটা চেয়ারে বসল চীফ।

মাথা দোলাল হোমিসাইড ইন-চার্জ। ‘ওটাই হায়ার করেছিল গার্সিয়া। সন্দেহ নেই। ল্যাবের ছেলেরা কাজ করছে ওটার ওপর।’

‘কোয়েল কোথায়?’

‘আইরিশ জালিয়াতটার সাথে আলাপ করতে গেছে,’ সার্জেন্ট হ্যারিস বলল। মানে হাত মুচড়ে তথ্য আদায় করতে আর কি!’

চিন্তিত মনে পাইপ টানতে লাগল রিচার্ড অ্যাশক্রফট। ‘লোকটা খুব বড় কোন কাজে হাত দিয়েছিল বলে যে গুজব শোনা যাচ্ছে, তা কি সত্যি হতে পারে?’

‘পারে,’ মাথা দোলাল হেস। ‘যতটা শোনা যাচ্ছে তত বড় হয়তো নয়, তবে একেবারে ছোটও নয়। বাতাসে সেরকম গুজবই ভাসছে।’

এই সময় ভেতরে এসে দাঁড়াল ডান কোয়েল। তাকে দেখে দাঁত বের করে হাসল সার্জেন্ট হ্যারিস। ‘এসো এসো, শার্লক হোমস!’

পাত্তা না দিয়ে চীফের সামনে চলে এল সে। 'বস্, মনে হয় সূত্র পেয়ে গেছি আমি গার্সিয়া কেসের।'

'বোসো। কি জেনেছ, বলো।'

বৃদ্ধকে ফাঁদে ফেলার কৌশলটা বাদ দিয়ে আর সব খুলে বলল ডিটেকটিভ।

কৌতুক ও প্রশংসা ফুটল্ল চীফের চেহারায়। 'লোকটা উইগ পরে বলেই সম্ভাবনাটা মনে জেগেছে তোমার?'

সার্জেন্ট হ্যারিসের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি দিল সে। 'হ্যাঁ, চীফ।'

'মেয়েটা থাকে কোথায়, তা জানতে পেরেছ?'

'পেরেছি।'

'ওয়েল!'

'সেইন্ট লুসি থাকে। হানা ল্যাঙলি নাম।'

সার্জেন্টের দিকে ফিরল অ্যাশক্রফট। 'মেয়েটাকে চিনি আমরা, কি বলো, সার্জ?'

'নিশ্চই!' বলল সে। 'হানা ল্যাঙলি, এককালে ছিল ক্যাবারে ডান্সার। মাদক কেনাবেচার অপরাধে তিনবার জেল খেটেছে। শর্ট টার্ম অবশ্য। এখন কাজ করে ওখানকার এক স্প্যানিশ নাইটক্লাবে।'

হাঁ করে তার কথা শুনছিল ডান কোয়েল, নড়ে বসল। 'এত খবর তুমি জানলে কি করে?'

বাঁকা হাসিতে সে-ও যে কম যায় না, এবার তা বুঝিয়ে দিল কেন হ্যারিস। 'এই জন্যেই আমি সার্জেন্ট।'

টেলিফোন বেজে উঠল এমন সময়। সার্জেন্ট ধরে ও প্রান্তের বক্তব্য শুনল, তারপর রিসিভার বসের হাতে তুলে দিল। 'ইয়েস?' বলল অ্যাশক্রফট। 'হ্যাঁ, বলো।'

দু'মিনিট পর ফোন রাখল সে। ফ্রেড হেসের দিকে তাকাল। 'ছেলেরা কোন ফিঙ্গার প্রিন্ট পায়নি মাসটাঙে।'

'তাই?' বিস্মিত হলো লোকটা। 'একটাও না?'

'না। খুব সতর্কতার সাথে সমস্ত প্রিন্ট মুছে ফেলা হয়েছে।'

এদিকে যখন এই আলোচনা চলছে, জুনো বীচের পাঁচ মাইল আগে এক বনের বেলেমাটির তলা থেকে ন্যাড়া গার্সিয়ার একটা হাত টেনে বের করে ফেলেছে এক শিকারীর স্পটার কুকুর। লোকটা বনে এসেছিল শিকার করতে। অস্বাভাবিক ঘ্রাণশক্তি কুকুরটাকে টেনে নিয়ে যায় যেখানে লোকটাকে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছিল রানা, সেখানে।

রাত দশটায় লাশের সুরতহাল রিপোর্ট পড়ল অ্যাশক্রফট। বলা হয়েছে, হার্টফেল করেছে গার্সিয়া চরম নির্যাতনের সময়। মৃত্যু হয়েছে আটদিন আগে ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা অসঙ্গতি পেল চীফ রিপোর্টে। দেহে তিনটে ছুরির আঘাত পাওয়া গেছে মৃতের, যদিও মারাত্মক নয় একটাও, কিন্তু প্রচুর রক্তপাত হয়েছে ওগুলো থেকে। অথচ মাসটাঙে এক ফোঁটা রক্তের দাগও পাওয়া যায়নি।

এ অসম্ভব, হতেই পারে না। হাতের ছাপ মুছে ফেলা সম্ভব, কিন্তু এতগুলো

পা থেকে রক্ত বের হওয়ার পরও তার কোন চিহ্নই নেই গাড়িতে, তা কি করে হয়?

'তার মানে আর কিছুতে করে আনা হয়েছে গার্সিয়াকে,' ঘোষণা করল চীফ। 'বেশ, হাইওয়ে ওয়ান চেক করো। জানার চেষ্টা করো এদিকে আসার পথে মাসটাঙটাকে কেউ দেখেছে কি না। ভেরো বীচ থেকে জুনো পর্যন্ত পথের পাশের প্রত্যেকটা বার, কাফে, গ্যাসোলিন স্টেশন, সব চেক করো।'

সারাপথ ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটিয়েছে ডিটেকটিভ ডান কোয়েল। সামনে যেখানেই ট্রাফিকের চাপ একটু বেশি মনে হয়েছে, সেখানেই সাইরেন বাজিয়ে রীতিমত ত্রাস সৃষ্টি করেছে সে হাইওয়ের চালকদের মধ্যে। এবং তাদের সাইড দেয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা দেখে মনে মনে হেসেছে।

সেইন্ট লুসির একমাত্র স্প্যানিশ ক্লাব খুঁজে বের করতে দেরি হলো না তার। ব্যাজ দেখিয়ে হানার অবস্থান বের করা তো পানির মত সহজ হয়ে গেল। ম্যানেজারকে ওটা দেখাতেই জানা গেল দোতলায়, ২৩ নম্বর রুমে আছে সে। ড্রেসরুমের পিছনদিকের শেষ মাথায় সিঁড়ি, তরতর করে ওপরে উঠে এল কোয়েল।

পুলিস পরিচয় পেয়ে প্রথমে চমকে উঠলেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল মেয়েটি। ছোটখাট, সুন্দরী। ত্রিশের মত বয়স। 'কি চাই?' দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকল সে।

'গার্সিয়া সম্পর্কে কিছু টিপস,' কাঁধ ধরে মৃদু ধাক্কা দিয়ে তাকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করল ডিটেকটিভ। ঢুকে পড়ল হানা ল্যাঙলির দুই রুমের সুইটে। প্রথমটা লিভিংরুম। এক সেট সোফা, কাঠের দুটো চেয়ার, টিভি ইত্যাদি আছে, তবে দেখলে বোঝা যায়, কোন কিছুর যত্ন নেয়া হয় না। সময় কোথায়!

'আমি কিছু জানি না,' খসখসে গলায় বলল মেয়েটি।

একটা কাঠের চেয়ার টেনে নিয়ে বসল কোয়েল। 'আরেকটু চেষ্টা করো। নইলে আমার পাম বীচ থেকে ছুটে আসা ব্যর্থ হবে।'

চেহারা কুঁচকে উঠল তার, সম্ভবত ঘৃণায়। 'বললাম তো, জানি না আমি।'

'কদিনেই ভুলে গেলে ন্যাড়া নাগরের কথা?' ব্যঙ্গের হাসি দেখা দিল লোকটার মুখে। 'অবশ্য ব্যাপারটা সত্যি হলে আমি তোমার স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারি।' মেয়েটি কথা বলছে না দেখে কাজ উদ্ধারের ধন্বন্তরী ওষুধ এখানেও প্রয়োগ করতে লেগে গেল সে।

'যখন তোমাদের মত ত্যাঁদোড় পথে আনা সমস্যা হয়ে পড়ে, তখন আমি কি করি, জানো? তার হাত ব্যাগে বা পকেটে সাদা পাউডার ভরে দেই, তারপর চীফকে জানাই জিনিসটা কোথায় পেয়েছি আমি,' দাঁত বেরিয়ে পড়ল কোয়েলের। 'আমার সৌভাগ্য যে আমার সব কথা আমার চীফ বিশ্বাস করে।'

কয়েক সেকেন্ড আগুন ঝরা চোখে তাকে দেখল মেয়েটি। 'গুল মারছ তুমি! তাছাড়া এটা ভেরো বীচ নয়।'

'তাতে তোমার কোন উপকার হবে না,' অমায়িক কণ্ঠে বলল সে। 'আমার চীফ আর এখানকার চীফ একজন অন্যজনের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এবার বলো, মনে

পড়েছে?'

লম্বা সময় চুপ করে থাকল হানা। দ্বিধাগ্রস্ত। 'কি জানতে চান?'

'পাম বীচে কেন গিয়েছিল গার্সিয়া?'

'একটা বোট ভাড়া করতে।'

'কেন?'

'কোথায় নাকি ট্রিপে যাবে, মালপত্র নিয়ে।' আবার খানিক ইতস্তত করল মেয়েটি। 'কিন্তু আগেরবার যে কাণ্ড ঘটে গেছে...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! আগেরবার বলতে?' ঝুঁকে বসল কোয়েল।

'দু'মাস আগে আরেক মোটর বোট নিয়ে সাগরে সমস্যায় পড়েছিল গার্সিয়া। কারা যেন গুলি করে বোট ডুবিয়ে দেয় ওর, সঙ্গের দুই ক্রুও মারা গেছে সে ঘটনায়।'

'আই সী!' ঠোঁট কামড়ে ভাবল সে কয়েক সেকেন্ড। 'তারপর?'

'ওই কারণে বোট দেয়নি...'

'কার্লো। তারপর? বোট হায়ারের কাজ তো সে এখানেও করতে পারত, এ জন্যে ওখানে কেন গেল লোকটা?'

নতমুখে কার্পেট দেখতে লাগল হানা। 'ও ভয় পেয়েছিল। কারা যেন পিছু লেগেছিল ওর, তাই সরে পড়েছে। তাছাড়া কিছু গোপন জিনিসসহ একটা ব্যাগ নিরাপদ কোথাও সরিয়ে রাখার প্রয়োজনও দেখা দেয়, তাই...'

'কি এমন গোপন জিনিস?' আরও ঝুঁকে বসল অফিসার।

'তা জানি না। বলেনি ও আমাকে। আমিও জানতে চাইনি।'

'আচ্ছা, বেশ। ব্যাগ নিয়ে ভেরো বীচ গিয়েছিল সে?'

ওপরে-নিচে মাথা দোলাল মেয়েটি।

'ওটার বর্ণনা দাও। দেখতে কেমন ছিল ব্যাগটা?'

'ব্যাগ মানে ব্রীফকেস। সাদা রঙের, কভারে লাল রঙের ব্যান্ড আঁকা।'

শক্ত হয়ে গেল ডিটেকটিভ। মনে হলো যেন আচমকা কারও কবরের ওপর পা দিয়ে বসেছে না জেনে। 'আবার বলো কথাটা,' থমথমে গলায় বলল সে।

'কি?'

'গার্সিয়ার ব্রীফকেসের বর্ণনা।'

বলে গেল হানা ল্যাঙলি।

'এবার বলো, কে, কারা তাকে ভয় দেখাচ্ছিল? কেন?'

'বলেছি তো...আমি জানি না।'

চট্ করে উঠে পড়ল ডান কোয়েল। 'চলো, আমার সাথে যেতে হবে তোমাকে।'

'কেন আমাকে...'

'শাটাপ্!' কড়া পুলিসী ধমক লাগাল সে। 'জল্‌দি ওঠো!'

এবার চূড়ান্ত হার স্বীকার করল নর্তকী। 'আচ্ছা, ঠিক আছে। বলছি।'

একসাথে পর পর তিনটে ঘটনা ঘটল সেই মুহূর্তে। কোয়েল বসল চেয়ারে, তার পিছনের ভেড়ানো দরজা দড়াম করে বিস্ফোরিত হলো, এবং সেদিকে মুখ করে

হানা ল্যাঙলি আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠল। সব এত দ্রুত ঘটল যে কয়েকমত আহাম্মক বনে গেল কোয়েল। ঝট্ করে পিছন ফিরতে গেল সে, কিন্তু কাজটা অর্ধেক সম্পন্ন হওয়ার আগেই একেবারে কানের কাছে পর পর দুটো প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো।

হানার চিৎকারও থেমে গেল মাঝপথে। দুটো গুলিই সোজা হৃৎপিণ্ডে বিঁধেছে তার। মেঝেতে বসে পড়ল ডান কোয়েল, হোলস্টার থেকে নিজের অস্ত্র বের করে আরও গুলি হয় কি না সেই অপেক্ষায় থাকল। এল না। তার বদলে করিডরে ধুপ্ ধাপ পায়ের আওয়াজ উঠল। হানার দিকে এক পলক তাকিয়েই দরজা সই করে লাফ দিল ডিটেকটিভ। এবং সিঁড়িগোড়ায় পলকের জন্যে এক খাটোমত, মোটা লোককে দেখতে পেল। পালাচ্ছে!

কয়েক মুহূর্ত পর যখন নিচে পৌঁছল সে কয়েক লম্বা লাফে, হাওয়া হয়ে গেছে তখন মানুষটা। নেই তো নেই-ই।

আট

দু'ঘণ্টা পরের কথা।

আহাম্মকের মত ঘরভর্তি মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ডান কোয়েল। খবর পেয়ে সেইন্ট লুসির হোমিসাইড ইন-চার্জ লেফটেন্যান্ট ডেমন অ্যালবার্ট ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বেশ কিছুক্ষণ। সঙ্গে এক সার্জেন্ট ও চার গম্ভীরদর্শন মোবাইল পুলিস।

হানা ল্যাঙলির লাশ পরীক্ষা করছে লেফটেন্যান্ট অ্যালবার্ট। থেকে থেকে এমন চোখে কোয়েলকে দেখছে, যেন এখনই কাঁচা চিবিয়ে খাবে। লোকটা বদমেজাজী, খোঁচা মেরে কথা বলার অভ্যেস। তারওপর তার এলাকায়ই ঘটেছে খুনটা, আরেক কাউন্টির অফিসার কোয়েলের চোখের সামনে। সব মিলিয়ে বিষয়টা বেশ জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন তাকে অপ্রীতিকর প্রশ্নবাণের মুখোমুখি হতে হবে, জানে কোয়েল, তাই অস্বস্তি বোধ করছে।

ওকে ঘেমে গোসল করার জন্যে প্রচুর সময় দিল লেফটেন্যান্ট, হ্যাট নামিয়ে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাল। চিন্তিত। 'পাম বীচের এক দুগ্ধপোষ্য খানদানকে দেখলাম মনে হলো এখানে?' হ্যাট জায়গায় রেখে আরেকদিকে ফিরে বলল সে।

অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল ডান কোয়েল। এই শুরু হলো!

'লোকটা কে, সার্জেন্ট?' নিজের সহকারীকে প্রশ্ন করল লেফটেন্যান্ট।

'ডিটেকটিভ সেকেন্ড গ্রেড ডান কোয়েল,' জবাব দিল দশাসই সার্জেন্ট।

ইন-চার্জ হতাশ চেহারায় মাথা দোলাল। 'আমার বিশ্বাস হয় না। ভেরো বীচের কোন ডিটেকটিভ আমার অনুমতি না নিয়ে এখানে আসার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।'

অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে দাঁড়াল কোয়েল। 'লেফটেন্যান্ট, আমি একটা তথ্য

যাচাই করতে এসেছিলাম। তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, হলে অবশ্যই আপনার অনুমতি চাইতাম।'

'তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, ঠিক,' টিট্‌কিরির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লোকটা। 'মাত্র একটাই তো লাশ। বোধহয় ম্যাসাকার হলে গুরুত্বপূর্ণ হত, কি বলো?'

'আমি মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছিলাম,' তোতা পাখির মত আউড়ে যেতে থাকল কোয়েল। 'হঠাৎ এক অস্ত্রধারী ঘরে ঢুকেই গুলি করে বসল মেয়েটাকে।'

'তারপর?' আগুন চোখে তাকে দেখছে লেফটেন্যান্ট।

'দুটো গুলি করেই পালিয়ে গেল লোকটা।'

সহকারীর দিকে ফিরল ইন-চার্জ। 'শুনলে, সার্জেন্ট? এক অস্ত্রধারী ঘরে ঢুকে ভেরো বীচের এক সো-কল্‌ড্ সেকেন্ড গ্রেড ডিটেকটিভের উপস্থিতিতে এই মেয়েটিকে পর পর দুটো গুলি করে মেরে রেখে চলে গেছে। কি বুঝলে?'

কোয়েলকে দেখল দশাসই লোকটা। নির্বোধের মত চেহারা তার, সার্জেন্ট হওয়ার কোন যোগ্যতাই নেই, তবু সার্জেন্ট। কারণ লেফটেন্যান্ট ডেমনের চামচা সে। অন্ধ ইয়েস ম্যান। বস্ রেগে গেছে, তাই তাকেও একটু রাগ না দেখালে চলে না ভেবে চোখমুখ পাকাল লোকটা। দেখে মনে হলো রাগ নয়, প্রসব বেদনা উঠেছে বুঝি। গলা দিয়ে দুর্বোধ্য আওয়াজ করছে সে।

ঘুরে ডান কোয়েলকে দেখল লেফটেন্যান্ট। 'কি করে পালাল খুনী?'

'গাড়িতে করে, স্যার।'

'যাক্, অন্তত একটা সূত্র তো পাওয়া গেল। সার্জেন্টকে গাড়ির নম্বরটা লিখে দাও, পরে খুঁজে বের করব।'

'স্যার, নাম্বার দেখতে পাইনি আমি,' চোখকান বুজে বলল সে। 'আমি লোকটাকে ধাওয়া করে...'

'আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি, তোমাকে ছবি আঁকতে হবে না। খুনী ঘরে ঢুকে তোমার সামনে একজনকে খুন করে নির্বিঘ্নে গাড়ি নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল, আর তুমি এমনকি গাড়ির নাম্বারটা পর্যন্ত টুকে রাখতে পারোনি, চমৎকার! তোমার রেকর্ডের জন্যে দারুণ! তুমি কোন্ গ্রেড ডিটেকটিভ শুনলাম যেন, সেকেন্ড, না থার্ড, কোয়েল?'

হয়ে গেছে আমার প্রমোশনের দফারফা, তিক্ত মনে ভাবল সে। লেফটেন্যান্ট যদি তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে, তার ফার্স্ট গ্রেড ডিটেকটিভ বনার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যাবে। 'সেকেন্ড গ্রেড, স্যার।'

'ওয়ান্ডারফুল!' ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল লেফটেন্যান্ট। 'আগাগোড়াই জানতাম পাম বীচের পুলিস বাহিনীতে আছে উপকূলের সেরা যত অকম্মার ধাড়ী, আজ তার প্রমাণ পেলাম। সে যাক্, খুনীর বর্ণনা দিতে পারবে, নাকি তাকেও দেখোনি?'

'দেখেছি। পাঁচ ফুট পাঁচের কাছাকাছি হবে লোকটা, স্যার। চওড়া কাঁধ, মজবুত গড়ন। একশো ষাট পাউন্ডের মত ওজন, পরনে ছিল পেপারমিন্ট স্ট্রাইপ স্যুট, মাথায় পানামা হ্যাট। চোখের নিচের অংশ সাদা রুমাল দিয়ে ঢাকা ছিল বলে চেহারা দেখতে পাইনি। অস্ত্রটা ছিল ওয়ালথার সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অটোম্যাটিক।'

চেহারায় নিখাদ বিস্ময় ফুটল লেফটেন্যান্টের। 'বলো কি হে, এতকিছু দেখেছ তুমি! গুলির সময় শুয়ে পড়েছিলে নাকি?'

'বসে পড়েছিলাম।'

'হুঁম! কি তথ্যের খোঁজে এসেছ তুমি এখানে?'

'ন্যাড়া গার্সিয়ার খুনের ব্যাপারে...'

'কে আসতে বলেছে?' বাধা দিল অ্যালবার্ট।

'ক্যাপ্টেন অ্যাশক্রফট, স্যার।'

জবাব শুনে চেহারা কিছুটা সদয় হলো তার, অ্যাশক্রফট যে নিজের চীফের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তা জানে ভালই। 'কেমন আছেন ক্যাপ্টেন?' বলল সে।

মাথা ঝাঁকাল কোয়েল। 'ভাল, স্যার।'

'ওঁর মত এক জাঁদরেল অফিসার কি ভাবে তোমাদের মত সরীসৃপ দিয়ে কাজ ম্যানেজ করেন, আমি তো বুঝি না। এবার বলো, মেয়েটির কাছে কি জানতে এসেছিলে তুমি?'

আধঘণ্টা পর লেফটেন্যান্টের কাউন্টি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ মাথা পেতে নিয়ে ক্লাব থেকে বেরিয়ে এল বিধ্বস্ত ডান কোয়েল। জ্বলছে রাগে-অপমানে। গাড়ির দিকে এগোচ্ছিল সে, এমনসময় পথরোধ করে দাঁড়াল এক কিশোর। নোংরা, দশ-এগারোর মত বয়স। রাস্তার ছেলে। 'আপনি ডান কোয়েল?' বলল সে।

চোখ কুঁচকে উঠল ডিটেকটিভের। 'হ্যাঁ, কেন?'

'মেসেজ আছে আপনার,' হাত পাতল কিশোর। 'আগে এক ডলার।'

'কিসের মেসেজ? কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'একটা মেয়ে।'

'কি নাম? কিসের মেসেজ?'

'সব বলব, আগে টাকা।'

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল ডিটেকটিভ। 'আগে মেয়েটার নাম বলো।'

'ঠিক আছে, বলছি। কিন্তু টাকা না পাওয়া পর্যন্ত ঠিকানা বলব না।'

'কি চায় সে?'

'কিছু খবর জানাতে চায়।'

পকেট থেকে একটা ডলার বের করল কোয়েল। 'বলো।'

'ওর নাম লুসি হেস্টিংস,' ওর হাতের দিকে চোখ রেখে বলল কিশোর। 'হানা ল্যাঙলির বান্ধবী।'

চট্ করে টাকাটা তার শার্টের পকেটে গুঁজে দিল ও। 'ঠিকানা?'

'তেইশ, টার্টল কোভ, তিনতলা।'

'কোথায় জায়গাটা? আমি এখানে নতুন।'

'সোজা গিয়ে হাতের বাঁদিকে দু'নম্বর গলি,' কোয়েলের ফিরে যাওয়ার পথ নির্দেশ করল কিশোর, তারপর ছুটে চলে গেল নিজের পথে।

জায়গাটা কাছেই, নাইট ক্লাব থেকে বড়জোর পাঁচশো গজ দূরে। খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না। ফ্ল্যাটের দরজা খুলল মাঝবয়সী এক লোক বেশভূষা মন্দ নয়, তবে চেহারা দেখলেই বোঝা যায় ভাড়ুয়া—মেয়ের দালাল। 'আসুন,'

ডিটেকটিভকে আহ্বান করল লোকটা। 'আমি জ্যাক টমাস। লুসির ম্যানেজার।'

লিভিংরুমে ঢুকল সে। এটাও মন্দ নয়—পুরু কার্পেটের ওপর বেশ দামী সোফা সেট, টিভি, সনি ডেক সেটসহ অনেক কিছুই আছে। মেয়েটির ব্যবসা বেশ ভালই চলে বোঝা গেল।

'লুসি কোথায়?' কড়া চোখে টমাসকে দেখল ডান কোয়েল।

'এখনই আসছে ও। বসুন।'

কি ভেবে নিজেই দরজা বন্ধ করে দিল সে, লক্ করে সেফটি চেইনও লাগিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসল। আর আহাম্মক হতে চায় না।

রুমের আরেক মাথার খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল মেয়েটি। চমৎকার চোখা চেহারা, বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়স। উজ্জ্বল সোনালী চুল। মেয়েটিকে কোয়েলের বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হলো। ওর মুখোমুখি বসে সিগারেট ধরাল সে। বিরক্ত হলেও চেপে গেল ডিটেকটিভ। 'কেন খবর দিয়েছ?'

'ন্যাড়া গার্সিয়ার ব্যাপারে তথ্য চাইছিলেন না?' পাল্টা প্রশ্ন করল লুসি। 'আমি কিছু দিতে পারি।'

'যেমন?'

'আমার একটা শর্ত আছে,' সিগারেটের আগুনের ওপর চোখ রেখে বলল সে। 'আগে কথা দিতে হবে আপনি তা পূরণ করবেন।'

মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল ডান কোয়েলের। দাঁতে দাঁত চেপে কিছু বলতে গেল, কিন্তু তার আগে লুসিই আবার বলে উঠল, 'ভিলেনের মত মুখভঙ্গি করে কোন লাভ নেই, মিস্টার। আমি জানি, আপনি এখনও শহর ছেড়ে যাননি জানতে পেলে লেফটেন্যান্ট অ্যালবার্ট খুব খুশি হবে। তেড়িবেড়ি করলে তাকে খবর দেব আমি।'

মনে মনে চুপসে গেল ডিটেকটিভ। ভাবল, অন্তত বক্তব্য শোনার জন্যে হলেও আপাতত এর শর্ত মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মেজাজ দেখিয়ে সুযোগটা নষ্ট করা ঠিক হবে না। পরেরটা দেখা যাবে পরে। নরম হলো সে। 'কি শর্ত?'

'গার্সিয়া এর বোট ভাড়া নিয়েছিল দু'মাস আগে,' পাশে বসা টমাসকে দেখাল লুসি। 'মার্চের চব্বিশ তারিখ।'

'কেন?'

'জানি না। গার্সিয়া নগদ টাকা দিয়ে ভাড়া নিতে চেয়েছে, টমাস আপত্তি করেনি। ওটাই ওর ব্যবসা।'

'তোমার শর্তটা কি?' ঝুঁকে বসল কোয়েল।

'বোটটা ওকে ফিরিয়ে দেবেন আপনি।'

'সেটা কোথায়?'

'জানা যায়নি। সাতাশ তারিখ হাভানা থেকে ফেরার পথে দুই ক্রুসহ নেই হয়ে গেছে। জেসি আর হ্যানস ওদের নাম।'

লম্বা করে দম নিল ডিটেকটিভ। 'ফেরার পথে? স্মাগলিঙ?'

'সেরকমই শুনেছি। মাল নিয়ে যায়, টাকা নিয়ে ফেরে, এই করত গার্সিয়া।'

গুড লর্ড! ভাবল সে।

'বোটের কাগজপত্র সব লিগ্যাল হলেও যে কাজে ভাড়া দেয়া হয়েছিল, তা

বেআইনী। ওটার নিখোঁজ হওয়ার খবর রিপোর্ট করলে পুলিস বোট সীজ করবে; তাই চেপে গেছে টমাস। আমাদের ধারণা আপনি চেষ্টা করলে ওটাকে খুঁজে বের করতে পারবেন। বোট না পেলে পথে বসতে হবে টমাসকে।'

'বোটের বর্ণনা?' লোকটার দিকে তাকাল কোয়েল।

'চল্লিশ ফুট লম্বা। রঙ সাদা, ককপিটের রঙ লাল। নাম গ্লোরিয়া টু, ভেরো বীচে রেজিস্টার্ড। টুইন ডিজেল এঞ্জিন,' টমাস বলে গেল গড়গড় করে। সব তথ্য টুকে নিল কোয়েল দুই ক্রুর বর্ণনাসহ।

'আর কিছু?'

চোখ কুঁচকে কিছু ভাবল লুসি। 'ইদানীং কিছুদিন যাবৎ খুব ভয়ে ভয়ে থাকত ন্যাড়া গার্সিয়া। কারা যেন পিছু নিয়েছিল ওর।'

'কোন নাম?' নাকের গোড়া চুলকাল ডিটেকটিভ। মাথায় চিন্তা চলছে ঝড়ের বেগে। একই কথা হানাও বলেছে, অর্থাৎ খবরটা খাঁটি।

'না।'

'ওর ভয় পাওয়ার খবর তোমরা কি করে জানো?'

'হানার কাছে শুনেছি।'

'গার্সিয়া পাম বীচে যে আরেকটা বোট ভাড়া করতে গিয়েছিল, সে খবর জানো না তোমরা?'

মাথা দোলাল লুসি। 'জানি। সেই জন্যেই ভয়ে ভয়ে আছে টমাস,' ঘুরে তাকে দেখল সমব্যথার দৃষ্টিতে। 'শুনেছি ওর বোট ডুবে গেছে। কিন্তু আশা ছাড়তে রাজি নয় টমাস। হয়তো কথাটা মিথ্যে, বিশেষ কোন কারণে রটিয়েছে সে।'

চোখ কুঁচকে উঠল কোয়েলের। 'কেন অহেতুক এমন কিছু রটাবে?'

'জানি না।'

কিছু সময় ভাবল সে। 'বোট যদি ডুবে গিয়েই থাকে জানতে, তাহলে শর্ত কেন দিয়েছিলে?'

'আমরা ওটার আশা ছাড়িনি, তাই,' টমাস বলল।

'বেশ,' উঠে পড়ল কোয়েল। 'দেখব খুঁজে পাই কি না তোমাদের বোট। এদিকে তোমরাও চেষ্টা করে দেখো নতুন কোন তথ্য পাও কি না! যদি পাও, আমার হেড কোয়ার্টার্সে ফোন কোরো। আমাদের এই আলোচনার খবর যেন আর কেউ জানতে না পারে।'

'জানবে না,' জোর দিয়ে বলল লুসি হেস্টিংস।

'ও হ্যাঁ, গার্সিয়া কারও হয়ে কাজ করত, না নিজের, জানো এ ব্যাপারে কিছু?'

'না।'

'এ ব্যাপারেও খোঁজ নাও।'

চোখের পাতা এক ইঞ্চির দশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ মেলল মাসুদ রানা। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘুমের মানুষের মত ভারী। তন্দ্রা সবে লেগে এসেছিল, আচমকা কেটে গেছে। গভীর রাত, কোথাও কোন আওয়াজ নেই, তবু কেন…! ওর দিকে পিছন ফিরে শুয়ে থাকা নিনার নগ্ন, ফরসা পিঠের দিকে তাকাল। মনে হয় ঘুমিয়ে আছে

মেয়েটি, ও নিশ্চই পাশ ফিরেছে, নইলে আর কি কারণ থাকতে পারে?

ভাবতে ভাবতেই আওয়াজটা কানে এল—এঞ্জিনের গুঞ্জন। গাড়ি! এত চাপা, মনে হয় দূরে কোথাও আছে। নাকি কাছেই? শব্দ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে সন্তর্পণে চালাচ্ছে ড্রাইভার? চোখ পুরো খুলে গেছে আপনাআপনি, তবে নড়েনি ও। কান পেতে বোঝার চেষ্টা করছে কোন্‌টা ঠিক।

পরেরটাই, নিশ্চিত হলো রানা। ধীরগতিতে এদিকেই আসছে কোন গাড়ি। পয়লা চোটে যে সম্ভাবনা মনে জাগল, তা হলো, নিশ্চই পুলিস। ওকে ধরতে আসছে। আরও কাছিয়ে এল গুঞ্জন, বোঝা যায় কি যায় না। এক সময় থেমে গেল। দুটো দরজা বন্ধ হওয়ার হালকা ধুপ্‌ ধাপ্‌, তারপর সব নীরব। কিছু একটা করা দরকার, ব্যস্ত হয়ে ভাবল ও। যদি পুলিস হয়ে থাকে, এত সন্তর্পণে আসার একটাই কারণ আছে—রানাকে পাকড়াও করা।

নড়ে উঠল নিনা, চিত হলো খুব সাবধানে। ব্যাপার টের পেয়ে আগেই চোখ প্রায় বুজে ফেলেছে ও, পাতার সরু ফাঁক দিয়ে মেয়েটিকে দেখছে। জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় তাকে পুরো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে দেখল রানা, ওকেই দেখছে। চেহারায় ঘুমের লেশমাত্র নেই। কান খাড়া করতে গিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস হালকা হয়ে এসেছিল, চট্‌ করে ব্যাপারটা শুধরে নিল রানা। অনড় পড়ে থাকল। গাড়িটার কথা ভেবে মন অস্থির।

সতর্কতার সাথে মুখ আরও কাছে এনে ওকে দেখল কিছুক্ষণ নিনা, তারপর উঠে বসল। নেমে গেল বিছানা থেকে। পায়ের কাছে পড়ে থাকা নীল সিল্কের পাজামা ও টপস্‌ পরে নিয়ে পা টিপে দরজার দিকে এগোল। ব্যাপার ভাল করে বুঝে নেয়ার জন্যে নড়ে উঠল রানা, চিত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে ফের নিথর হয়ে গেল। নিয়মিত ছন্দে ওঠানামা করছে প্রশান্ত বুক, দম নিচ্ছে টানা, গভীর। যা বোঝার ছিল বুঝে নিয়েছে এর মধ্যে।

ওকে নড়তে দেখে জায়গায় জমে গিয়েছিল নিনা, দ্বিধায় পড়ে ফিরে আসতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেছে। ঝাড়া এক মিনিট ওখানেই থাকল সে, তারপর নিঃশব্দে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। ওর লঘু, দ্রুত পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে চট্‌ করে উঠে পড়ল রানা।

হাসল আপনমনে। এগারোটার একটু পর এসেছিল নিনা। ওকে ঘুমের ওষুধ দিতে নিশ্চই? ঘড়ি দেখল রানা—দুটো কুড়ি। পুলিস নয়, ভাবল ও, আর কেউ এসেছে। কে?

মেয়েটা চলে যাওয়ার দু'মিনিট পর উঠল রানা। ভিড়িয়ে রাখা দরজার ফাঁক দিয়ে সামনেটা দেখে নিল। নেই কেউ। একদম ফাঁকা। সাবধানে বেরিয়ে এল ও। ছায়ায় দাঁড়িয়ে আবার ভাল করে নজর বোলাল চারদিকে। ঘুমে বেহুঁশ রেস্ট। অন্ধকার। একমাত্র নিনার রুমে আলো জ্বলছে। জানালার পর্দায় কারও ছায়া। আরেকটা ছায়া হেঁটে গেল ওটার কাছ ঘেঁষে।

চিতার মত ক্ষিপ্র, নিঃশব্দ পায়ে এগোল ও। হাতে ওয়ালথার। রুম সার্চ করা হয়ে গেছে জানার পর জিনিসটা তুলে এনেছে, আর সব আগের জায়গায়। ওগুলো নয়, এখন অস্ত্রটার প্রয়োজন পড়তে পারে ওর যে কোন মহর্তে, তাই নিয়ে এসেছে।

এমনিতেও জিনিসটা সাথে না থাকলে স্বস্তি পায় না রানা।
গাছের ছায়ায় ছায়ায় এগোল ও। রেস্টের এয়ারকন্ডিশন্ড অংশের শেষ মাথায় চলে এল অনেকটা পথ ঘুরে। উঁকি দিয়ে সামনের গাড়িটা দেখল—নীলের ওপর সাদা স্ট্রাইপের শেভ্রোলে। ফের্নান্দো কোর্টেজ! ব্যাটা এতরাতে কি করছে এখানে? আরও সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল রানা, এক পা এক পা করে নিনার আলোকিত জানালার দিকে এগোল। এয়ার কন্ডিশনিং মেশিনের মৃদু গুঞ্জনে পায়ের আওয়াজ চাপা পড়ে গেল ওর।
জানালা ভেতর থেকে বন্ধ, ভারী পর্দা এমন ভাবে টানা যে ভেতরে কিছু দেখার উপায় নেই। কাঠের দেয়ালের কোথাও সামান্য ফাঁক, বা কমপক্ষে একটা ছিদ্র খুঁজতে লাগল ও মরিয়া হয়ে। নেই। দেয়ালে কান পাতল। কয়েকটা কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, নিচু গলায় কথা বলছে। মাঝের বাধা ও মেশিনের গুন্ গুন্ শব্দে কিছু বোঝা দায়। তবু, দেয়ালটা কাঠের বলেই এক আধটু শোনা যাচ্ছে।
'...ভুল হয়নি তো?' নিনার গলা শুনতে পেল ও।
'প্রশ্নই...' গলাটা কোর্টেজের। অমার্জিত, কর্কশ। খুব সম্ভব বলার সময় আরেকদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল ক্ষণিকের জন্যে, তাই পরের কিছু শব্দ শোনা গেল না। '... সোজা বুকে...দুটো। স্পট ডেড। হাঁ করে দেখা ছাড়া কিছু করার ছিল না কোয়েলের বাচ্চার।'
কার্লোর মোটা গলা একদম পরিষ্কার ভেসে এল এবার। 'কোয়েল হারামজাদা ওই পর্যন্ত পৌঁছল কি করে তাই ভাবছি। আইরিশ কুত্তার বাচ্চাটা মুখ খোলেনি তো?' শেষ বাক্যটা অন্যমনস্ক শোনাল।
'জালিয়াত ড্যানির কথা বলছ?'
'হ্যাঁ। মুখ খুলে থাকলে সর্বনাশ হবে আমার, সব জানাজানি হয়ে যাবে। কোর্টেজ, ওর একটা ব্যবস্থা করা যায় না?'
খানিক নীরবতা। 'শেষ করে দিতে বলছ?' মেয়েটার প্রশ্ন।
'নিশ্চই! এতদিন সব স্বাভাবিক ছিল, কারও অতীত নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া পড়েনি। গার্সিয়া হারামজাদা যে এভাবে মরবে, কে ভেবেছিল? ওকে বারবার বলেছি এত কঠিন নির্যাতন কোরো না। শুনল না। এখন...'
'তুমি শুধু শুধু ওকে দায়ী করছ, বাবা। পত্রিকায় পড়োনি ভয়ে হার্টফেল করে মরেছে লোকটা?' খানিক বিরতি। 'পা আগুনে ভরে দেয়ার ফলে কাজটা ঘটেছে, আর বুদ্ধিটা পলার। কোর্টেজ হুকুম পালন করেছে কেবল। তাতে কাজও হয়েছে। ব্যাটা মরলেও আমাদের সন্দেহ যে সত্যি ছিল, সে কথা তো স্বীকার করে গেছে।'
'বুঝলাম,' কার্লো বলে উঠল অসহিষ্ণু কণ্ঠে। 'কিন্তু এখন কি হবে যদি পুলিস কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করে বসে? আমার রেস্ট নিয়ে টান পড়ে? ড্যানি বুড়ো মানুষ, দলিল জাল...'
'চিন্তা নেই,' কোর্টেজ বলল। 'কাল রাতে ওর ব্যবস্থা করব আমি।'
'তাই করো দয়া করে। কালই করো।' পরক্ষণে গলা খাদে নেমে গেল তার। 'তারপর...হবে।...ঘাড়ে চাপানোর...মারা গেল।...হয়ে গেল।
'চেষ্টায় কোন ত্রুটি রাখা হয়নি,' কোর্টেজ বলল। 'সাথেরটা যে এত ধড়িবাজ

তা কে ভেবেছে? ও না হয়ে আর কেউ হলে দুটোকেই দিয়ে এখন দিনে দশবার করে আমার জুতো চাটাতাম।'

'একেবারে পথের শেষে না থেকে যদি আরেকটু এগিয়ে থাকতে তোমরা, তাহলে নিশ্চই ধরা যেত,' কার্লো বলল আফসোসের সুরে।

'কে ভেবেছে ব্যাপার বুঝে আগেই সটকে পড়বে ওরা?' গলাটা কোর্টেজের। 'লোকটাকে সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার। শেষ পর্যন্ত...'

চাপা হাসি দিল মেয়েটা। 'মাসুদ রানার কথা বলছ? ওর ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও, ও এখন আমার কথায় উঠবে-বসবে।'

'ছোকরা যাবে তো শেলডন? শেষ পর্যন্ত কাজটা করানো যাবে তো ওকে দিয়ে?' কার্লোর উদ্বিগ্ন প্রশ্ন।

'ও যাবে না ওর ঘাড়ে যাবে,' আবার হাসল নিনা।

'ঠিক আছে। ওখানকার কাজ সেরে ফিরে এসো। তারপর হারামজাদা...

সরে এল রানা, আর দাঁড়ানোর ঝুঁকি নেয়া যায় না। এতদিন হাতে কোন তথ্য ছিল না। এখন যা পাওয়া গেল, তাও এলোমেলো। সব জোড়া দিয়ে এক সুতোয় বাঁধতে হবে, তারপর...

নয়

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল রানার। চোখের সামনে হাত তুলে ঘড়ি দেখল, পাঁচটা বাজে। আরও খানিক ঘুমিয়ে নেয়ার জন্যে পাশ ফিরে শুলো। কাজ হলো না। চোখের পাতা ছেড়ে বহুদূর চলে গেছে ঘুমের রেশ।

উঠে পড়ল ও। অনর্থক শুয়ে শুয়ে পিঠ ব্যথা না করে সাঁতার কেটে আসা যাক, শরীর-মন দুটোই চাঙা হবে। বেদিঙ ট্রাঙ্ক পরে বেরিয়ে পড়ল রানা। কোথাও আলো জ্বলছে না, অঘোর ঘুমে তলিয়ে আছে রেস্টের সবাই। গরম বাতাসে পামের মৃদু সরসর ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। পুব আকাশে লাল আভা ফুটেছে কেবল।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে সাঁতার কাটল ও। উঠি উঠি করছে, এমন সময় তীরে দাঁড়িয়ে নিনাকে হাত নাড়তে দেখল। পরনে রক্ত লাল বিকিনি, কাঁধে টাওয়েল। সদ্য ফোটা দিনের আলোয় কাঁচা সোনার মত চকচক করছে মেয়েটির ফরসা, মসৃণ ত্বক। রানাও হাত নাড়ল। ধীরগতিতে তীরে এসে বুক সমান পানিতে দাঁড়াল।

'উঠে পড়ছ নাকি?' বলল নিনা। কোমরে হাত রেখে এক পা সামান্য ভাঁজ করে মোহনীয় ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দেহসৌষ্ঠব দেখল রানা। রক্তে দোলা লাগল। 'সেরকমই ইচ্ছে ছিল।'

'অর্থাৎ মত বদলেছ?' হাসল মেয়েটি।

'না বদলে করি কি? মালিকের মেয়ে পানিতে নামছে আর আমি লাইফগার্ড

হয়ে তার নিরাপত্তার কথা ভাবব না, তাই হয় নাকি? চাকরি নট্ হয়ে যাবে না?'

শব্দ করে হেসে উঠল ও। 'আচ্ছা! এসো তাহলে বাজি হয়ে যাক, দেখি তুমি কত ওস্তাদ সুইমার।' পানিতে নেমে পড়ল সে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দে পানি ছিটিয়ে ওর কাছে এসে দাঁড়াল।

রানা ভাবনায় পড়ে যাওয়ার ভান করল। 'কি বাজি?'

'ওই পর্যন্ত যাব আর আসব,' হাত তুলে রক ফরমেশন দেখাল ও। 'দশ ডলার বাজি, ওকে?'

'সাত সকালে দশটা ডলার না খোয়ালে বুঝি চলছিল না তোমার?' শ্রাগ করল রানা।

'কার খোয়া যায়, দেখাই যাক্ না!'

'বেশ। পঞ্চাশ গজ এগিয়ে থাকার সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে, যাও।'

বিস্মিত হলো নিনা। 'মানে?'

'তুমি পঞ্চাশ গজ সামনে থেকে শুরু করবে,' বলল রানা। 'আর আমি এখান থেকে।'

'মাই! মাই!' চোখ বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল সে। মনে হলো ভেতরে ভেতরে খুশি। 'এতবড় ঝুঁকি নেবে?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি ইওরোপের চ্যাম্পিয়ন ছিলাম,' অমায়িক হাসি দিল ও। 'তারওপর তুমি মেয়ে। আমার বরং একশো গজ এগিয়ে থাকার সুযোগ দেয়া উচিত ছিল।'

'দেখা যাক্!' চেহারায় চ্যালেঞ্জ ফোটাল সে। 'দেখি তুমি কেমন চ্যাম্প।'

ওকে প্রায় একশো গজ পিছনে ফেলে রেস জিতল রানা। তারপরও ওকে তেমন শ্রান্ত হতে না দেখে অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটল নিনার চোখে মুখে। ওর মধ্যে সামান্য হলেও উচ্ছ্বাস আছে দেখল রানা।

বালির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় পলকের জন্যে কার্লোকে দেখতে পেল ও। রেস্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এদিকেই তাকিয়ে ছিল, রানাকে দেখামাত্র খুব দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। ঢুকে পড়ল ভেতরে। মনে মনে চোখ কোঁচকাল ও। ব্যাপার কি?

'রোববার তো ছুটি,' বলল নিনা। 'দিনটা কাটানোর কোন প্ল্যান আছে তোমার?'

'না।'

'তাহলে আমার সাথে এক জায়গায় চলো। জায়গাটা চমৎকার। একেবারে নির্জন। মানুষজন নেই। নির্জনে দু'জন দু'জনকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে…' ইচ্ছে করে থেমে গেল নিনা। চেহারায় নির্দোষ ষড়যন্ত্রের ভঙ্গি ফোটাল।

'কোথায়?' ঘুরে তাকাল রানা।

'এই তো, কাছেই।'

'মানুষজন নেই মানে?'

'কেউ থাকে না ওখানে। শুধু তুমি আর আমি যাব, কেমন?'

চিন্তার ভান করল ও। 'কিন্তু কার্লো…'

'বাবা জানবে না, তোমার কথা আর কি! বলব আমি একা যাচ্ছি। খুব ভোরে

বোট নিয়ে রওনা হয়ে যাব আমরা।'

'বোট!'

'হ্যাঁ, বোটে যেতে হয় ওখানে।'

আবার ভাবল রানা। কোন সন্দেহ নেই শেলডন আইল্যান্ডের কথা বলছে মেয়েটি। গার্সিয়ার ব্রীফকেসে পাওয়া কার্ডে ২৭ মে লেখা ছিল। সে খবর নিশ্চই এরাও জানে, নির্যাতনের মুখে জানিয়ে গেছে গার্সিয়া। তাহলে আগে কেন? নাকি তারিখ সম্পর্কে ঠিক তথ্য দেয়নি সে? মিথ্যে বলে গেছে?

ওর ধারণা হয়েছিল ওই দিনই কিছু ঘটবে শেলডনে, কিন্তু নিনার প্ল্যান শুনে তা বদলে গেল। কারণ ও পরশু রোববারের কথা বলছে, ২০ তারিখ। সাত দিন আগেই কেন? কি ঘটতে চলেছে ওখানে? 'বেশ, চলো।'

'ওহ্, ডার্লিঙ!' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল নিনার। 'কিন্তু সাবধান! এ কথা কাউকে বোলো না। তুমি-আমি ছাড়া কেউ যেন না জানে।'

লোভীর চোখে ওর দেহের খাঁজ-ভাঁজ দেখল রানা। 'পাগল! কেউ জানবে না, নিশ্চিন্ত থাকো।'

আপনমনে নিজের কাজ করে যাচ্ছে রানা। সহজ, স্বাভাবিক আচরণ। বীচ থেকে দুশো গজ ভেতরে, খুদে দ্বীপের মত কোরাল ফর্মেশনের ওপর ডাইভিঙ বোর্ড সেট করার প্রাথমিক কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে।

ওর মত কার্লোরও মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই কি চলছে তার ভেতরে। কাল রাতের মীটিঙের পর লোকটা বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। দিন দুয়েক গম্ভীর থাকার পর আজ নাস্তা খাওয়ার সময় বেশ কিছুক্ষণ রানার সাথে হেসে হেসে গল্প করেছে, হাসি ঠাট্টাও করেছে, খোঁজ-খবর নিয়েছে ওর কাজের অগ্রগতির।

এগারোটার দিকে ক্ষ্যান্ত দিল রানা। গরম হয়ে গেছে রক, আর কাজ করা সম্ভব নয়। ছেলেদের সব গুছিয়ে রেখে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে লেগুনে নেমে পড়ল ও, ধীরগতিতে সাঁতরে এগোল বীচের দিকে। মাথার মধ্যে একটা ধাঁধা আর একটা সমস্যা ঘুরপাক খাচ্ছে।

অন্যদিনের তুলনায় বীচে আজ সূর্য স্নানার্থীদের সমাগম একটু কম। ওর মধ্যে পলা আছে কি না দেখতে দেখতে কোয়ার্টারের দিকে এগোল রানা। নেই, আসেনি। ব্যস্ত? শাওয়ার সেরে সবে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে ও, এমনসময় হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল রিকি। মরার মত ফ্যাকাসে মুখ ঘামে চকচক করছে। ওর হাতে দলা করা একটা খবরের কাগজ দেখতে পেল রানা। 'কি হয়েছে?'

নিঃশব্দে কাগজটা ওর চোখের সামনে মেলে ধরল যুবক। দুই কলাম চার ইঞ্চি একটা ছবি দেখাল আঙুল দিয়ে। কাঁপছে থর থর করে। চেহারা পুরো না মিললেও ওটা যে গার্সিয়া, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। ছবির নিচে ক্যাপশন বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে:

কেউ দেখেছেন একে?

নিচের খবরটা পড়ল রানা। উত্তেজনার আভাস পর্যন্ত নেই ওর মধ্যে। একদম শান্ত, স্বাভাবিক। খবরটা এরকম: *ওপরের ছবিধারীর নাম সিজার গার্সিয়া ওরফে ন্যাড়া গার্সিয়া। চিহ্নিত অপরাধী সে। মে মাসের ১২ অথবা ১৩ তারিখ একে যদি কেউ দেখে থাকেন, দয়া করে পাম বীচ পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর...*

চোখ তুলল ও। 'বুঝলাম। পুলিস তার কাজ করছে। কিন্তু তাতে তোমার এত ঘাবড়াবার কি হলো?'

'এবার নিশ্চই ধরা পড়ে যাব আমরা,' কাঁপা গলায় বলল যুবক। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'সম্ভাবনা আছে,' ধীরস্থির গলায় বলল রানা। 'আবার নেইও। পুলিসের যাতে লাশটা খুঁজে বের করতে বেশি অসুবিধে না হয়, আমি সে ব্যবস্থাই করেছি। এবং ওরা যাতে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে, সে ব্যবস্থাও। অবশ্য দুর্ভাগ্য যে এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার সময় অফিসার ডান কোয়েলের চোখে পড়ে গিয়েছি আমি ব্রীফকেসসহ। কিন্তু তা নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। রিল্যাক্স, ম্যান! আইনের মারপ্যাঁচ আমিও বুঝি কিছু কিছু। তাছাড়া এখানে যে জন্যে এসেছি, তাও প্রায় বোঝা হয়ে গেছে। পুলিস আমাদের কলার ধরার আগেই গার্সিয়ার আসল খুনীদের পরিচয় বেরিয়ে পড়বে। কাজেই তোমার ভয়ে ঘাম ছোটাবার কোন কারণ নেই। আসল খুনী যারা, তাদেরকে ঘামতে দাও। আমি যতক্ষণ আছি, কেউ তোমাকে স্পর্শও করতে পারবে না, বি শিওর।'

হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল যুবক। 'এত নিশ্চিত কি করে হলেন আপনি?'

'ভেতরের আস্থা, বিশ্বাস থেকে। ওসব এখন বাদ, আমার দুটো প্রশ্নের উত্তর দাও। ড্যানি নামে কাউকে জানো তুমি?' ওকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকতে দেখে যোগ করল, 'লোকটা আইরিশ। জালিয়াত।'

কিছু সময় ভাবল রিকি। 'চেনা চেনা মনে হচ্ছে...কিন্তু...' থেমে গাল চুলকাল ও।

'খুব সম্ভব তোমাদের রেস্টের জাল দলিল তৈরি করেছিল লোকটা কার্লোর নামে। তোমার বাবা মারা যাওয়ার পর।'

কপাল কুঁচকে উঠল ওর। চোখে বিস্ময় ও সন্দেহ। 'আপনি সে খবর জানলেন কি করে?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা।

'মনে হয় নামটা শুনেছি...মার মুখে,' থেমে থেমে বলল সে। 'এসব জো ভাল বলতে পারবে। কিন্তু কেন, কি করবেন তা জেনে?'

'জো?' কিছু ভাবল রানা। 'ও তোমার কতটা বিশ্বস্ত?'

'ছোটবেলা থেকে দেখেছি ওকে আমাদের বারম্যান হিসেবে। বাবাকে খুব ভালবাসত। আমাকেও ছেলের মত দেখে। ওর জন্যেই আজও এখানে টিকে আছি।'

'বেশ। এবার...'

‘কিন্তু আপনি এসব কেন জানতে চাইছেন?’ বাধা দিল রিকি। ‘জেনে কি করবেন? কার্লো যদি টের পায়, সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার, চ্যাম্প! ও মেরে ফেলবে আমাকে।’

দপ্ করে দু’চোখ জ্বলে উঠল রানার। ‘কার্লোর ভয়ে তুমি দিনের মধ্যে কতবার মনে মনে নিজেকে মারছ, রিকি? কেন একবার বুক টান্ করে সোজা হয়ে দাঁড়াবার কথা ভাব না? কেন নিজের অধিকার আদায় করে নেয়ার কথা একবার ভাবতে পর্যন্ত পারো না?’

স্তব্ধ বিস্ময়ে অনেকক্ষণ ধরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রিকি। আনমনে খবরের কাগজটা দলা পাকাচ্ছে। মনে হলো কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছে।

‘আপনাকে আমি বুঝে উঠতে পারছি না, চ্যাম্প,’ আরেকদিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বলল সে।

‘কদিন থেকে আপনার আচরণ উল্টোপাল্টা লাগছে। কার্লো আড়ে আড়ে আপনাকে দেখে, তার মেয়েও,’ শ্রাগ করল। ‘বুঝি না। তবে আমার ওপর যে ওরা খুবই বিরক্ত, তা বুঝি। সুযোগ পেলেই প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার করছে কার্লো। মনে হয় আমি মারাত্মক কোন অপরাধ করে ফেলেছি। আমাকে দেখলে ওর গায়ে জ্বালা ধরে যায়। ভুল বুঝেছিলাম আমি, আপনাকে পেয়ে মোটেই খুশি হয়নি লোকটা।’

ও উত্তর দিচ্ছে না দেখে আবার বলল, ‘খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অতীত কেন বের করছেন আপনি? কি লাভ তাতে? এখানে আসার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে আপনার? কি সেটা? গার্সিয়ার আসল খুনী কে, পুলিস তাকে কখন ধরে, এসব আপনি জানেন কি করে?’ খানিক নীরবতা। ‘আপনার সাথে মাত্র কয়েকদিনের পরিচয়। সামান্যই চিনি। কিন্তু এখানে আসার পর যে বিরাট এক পরিবর্তন এসেছে আপনার মধ্যে, তা বেশ বুঝতে পারছি। প্রায় সময়ই আপনাকে চিন্তিত দেখি।

‘গার্সিয়ার লাশ খুঁজে পেয়েছে পুলিস, পত্রিকায় তার ছবি বেরিয়েছে, অথচ আপনার মধ্যে ভয়ের চিহ্নও দেখি না। এরকম জটিল পরিস্থিতিতে যে কারও ভয় পাওয়ার কথা। ওই ব্রীফকেসসহ আর কেউ পুলিস অফিসারের চোখে পড়ে গেলে সেদিনই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেত, অথচ আপনি উল্টে আমাকে অধিকার আদায় করে নেয়ার কথা বলছেন…’

কথা খুঁজে না পেয়ে থেমে শ্রাগ করল। ‘কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। আপনি এখানে একেবারেই নতুন, চ্যাম্প। আজ আছেন, কাল নেই। যদি উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে যায়, শিয়াল-কুকুরে খাবে আমার লাশ। কার্লোকে আপনি চেনেন না। আমি চিনি, কোবরার থেকেও বিষাক্ত লোকটা।

‘প্লীজ, যা হওয়ার হয়েছে, দয়া করে এখান থেকে চলে যান আপনি। আর বিপদ বাড়াবেন না। আমিও চলে যাব।’

এতক্ষণে মুখ খুলল রানা। ‘কোথায়?’

‘যেখানে হোক, পাম বীচ থেকে অনেক দূরে কোথাও।’

‘সেটা ঠিক হবে না,’ মাথা দোলাল ও। শান্ত কণ্ঠে বলল, ‘তাতে বরং তুমিই পুলিসের সন্দেহের কারণ হবে, গার্সিয়ার আসল খুনীকে ছেড়ে পুলিস তোমার পিছু নেবে। কোথাও শান্তিতে থাকতে পারবে না তুমি। ওরা যদি একবার পিছু নেয়,

আজ হোক, কাল হোক, ধরা তোমাকে পড়তেই হবে, রিকি। পরে হয়তো কোনদিন প্রমাণ হবে খুন তুমি করোনি, কিন্তু ততদিনে জীবনের অনেকগুলো বছর হারিয়ে যাবে তোমার। সময়টা অপচয় হবে।'

চোখের পাতা কেঁপে গেল তার। 'তাহলে…তাহলে…'

'আমি তোমার বিপদ বাড়াতে আসিনি, রিকি। অনর্থক দুশ্চিন্তা করছ তুমি। বেশি ভয় পেলে মানুষের মাথা গুলিয়ে যায়, সবকিছুর মধ্যে বিপদের গন্ধ পায় সে তখন। তোমার তাই হয়েছে। দয়া করে মাথা ঠাণ্ডা রাখো, খুব শিগ্গিরই পরিস্থিতি পাল্টে যাবে। এবার,' বলে একটু থামল রানা। 'একটা প্রশ্নের উত্তর দাও আমার। এখানে আসার দিন…'

দুপুর দুটো। নাক ডাকাচ্ছে কার্লো। নিনা নিজের রুমে। হয়তো ঘুমাচ্ছে। জেগে থাকলেও এই সময়টা বের হয় না ও। সুযোগটা নিল রানা। বারে এসে কাউন্টারের সামনে টুলে বসল। জো ছাড়া কেউ নেই। ধোয়ামোছা সেরে সন্ধের জন্যে সব রেডি করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখছে লোকটা। ওকে দেখে হাসল। 'কি ব্যাপার, বস্, গরমে ঘুম এল না বুঝি? ঠাণ্ডা কিছু চলবে?'

'দাও একটা কোক,' বলল রানা। 'সত্যি খুব গরম পড়েছে।'

ডীপ ফ্রিজ থেকে দুটো ক্যান বের করে একটা ওকে দিল জো, অন্যটা খুলে নিজে চুমুক দিল।

'অনেকদিন থেকে চাকরি করছ এখানে, জো?'

'তা বলতে পারেন, বস্,' মাথা দোলাল বারম্যান। 'প্রায় চোদ্দ বছর।'

'গুড! তাহলে তুমি নিশ্চই জানবে,' কোকে চুমুক দিল ও।

'কি?'

'ড্যানির কথা। আইরিশ লোকটা…?'

মুখের কাছে হাত থেমে গেল লোকটার। 'ড্যানি ও' ব্রায়ান?' চোখ কুঁচকে উঠল।

'হবে বোধহয়।'

'এ নামে একজনকেই চিনি আমি, বস্। চিনতাম আর কি! কার্লোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।'

'থাকে কোথায়?'

'শহরেই কোথাও থাকে শুনেছি। কেন, বস্, কি দরকার? আপনি ওকে চেনেন কি করে?' চুমুক দেয়া ভুলে রানাকে দেখছে জো।

'এমনিই জানতে চাইলাম,' আরেক চুমুক দিল রানা। 'আজকাল এদিকে আসে না বোধহয়?'

'নাহ্! অনেকদিন হলো দেখি না।'

খানিক চুপ করে থাকল রানা। 'রিকি ছেলেটা ভালই, কি বলো?'

'নিশ্চই! বস্, আজ হলো কি আপনার? আগে তো কখনও এত উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করেননি!'

'আজ বিশেষ প্রয়োজন পড়েছে,' লোকটার চোখে চোখ রেখে বলল ও।

'সেটা কি জানতে পারি?'

'পারো। একটু পরেই বলছি। তার আগে বলো দেখি, রিকির মত এক ছেলে খুন-খারাবির মত জঘন্য কাজের সাথে জড়িত থাকতে পারে বলে মনে হয় তোমার?'

এমনভাবে চমকে উঠল লোকটা, যেন চোখ ছলকে পড়ল কান থেকে। অবশ্য পরমুহূর্তেই হেসে ফেলল ও ঠাট্টা করছে ভেবে। 'কী যে বলেন না, বস। এটা কোন প্রশ্ন হলো?'

'আমি সিরিয়াস, জো।' রানার গাম্ভীর্যে বিন্দুমাত্র চিড় ধরল না।

থমকাল বারম্যান। চোখ কুঁচকে ওর চেহারা দেখে কিছু বোঝার চেষ্টা করল হয়তো। 'ওয়েল, অন্যের কথা বলতে পারি না। তবে আমাকে যদি কেউ তেমন কিছু বিশ্বাস করাতে গিয়ে জবাই করেও ফেলেন, আমি করব না। ওকে আমার থেকে বেশি কেউ চেনে না। খুন তো হাজার আলোকবর্ষ মাইল দূরের কথা, ও কথা ভাবতেও পারে না রিকি।'

'মন থেকে বলছ?'

আন্তরিক হাসিই হাসল এবার লোকটা। 'একশোবার! হাজারবার! ওফ্, কী একখানা প্রশ্নই না করলেন, বস।'

'তোমার কতটা আস্থা ওর ওপর, তা বাজিয়ে দেখলাম,' রানাও হাসল ওকে উৎসাহ দেয়ার জন্যে। তারপর আরেকটা প্রশ্ন করল। পাঁচ মিনিট পর সন্তুষ্ট মনে বার থেকে বেরিয়ে এল ও। এদিকের হিসেব প্রায় মিলে গেছে। একটা খটকা অবশ্য রয়ে গেছে, তবে ওটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অন্য যে হিসেবটা মেলাতে হবে, সেটা শেলড্রনের।

সন্ধের আগে কার্লোর গাড়ি নিয়ে শহরে রওনা হলো মাসুদ রানা। ড্রাইভিং বোর্ডের ক্রোমিয়াম হ্যান্ড রেইল ডেলিভারি আনতে হবে। ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটিয়ে সূর্য ডোবার আগেই পৌঁছে গেল ও। ফোনবুকে পাওয়া ঠিকানা অনুযায়ী শহরের প্রান্তে এসে নির্দিষ্ট জায়গার খানিকটা দূরে একটা ছোট রাস্তায় এস্টেট কার পার্ক করল।

ছয় মিনিট পর ড্যানি ও' ব্রায়ানের বন্ধ দরজায় নক করল রানা। দরজা খুলে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল বৃদ্ধ। 'কাকে চাই?'

'ড্যানি ও' ব্রায়ানের জন্যে একটা খবর আছে,' শীতল, নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল ও। বৃদ্ধের মুখের পেশীর নড়াচড়ার দিকে তীক্ষ্ণ নজর।

'আমি ড্যানি। কে পাঠিয়েছে আপনাকে?'

'কেউ পাঠায়নি, আমি নিজেই এসেছি।'

'আপনাকে চিনতে পারছি না,' মুখ সামনে এগিয়ে দেখল ওকে বৃদ্ধ। 'আগে কখনও পরিচয় হয়েছিল আমাদের?'

'না।' একটু বিরক্তি দিল রানা। 'যদি প্রাণের মায়া থাকে, দু'চারদিনের জন্যে শহর ছেড়ে পালিয়ে যান এক্ষুণি। অন্তত এই এলাকা ছেড়ে। নইলে খুন হয়ে যাবেন।'

চমকে উঠল বৃদ্ধ। 'কি...মানে কেন, কে...?' ভয়ের চোটে প্রশ্ন শেষই

করতে পারল না।

'কার্লো,' গম্ভীর গলায় বলল ও। 'তার নিয়োগ করা খুনী আসছে আপনাকে শেষ করতে।'

ঝপ্ করে চোয়াল ঝুলে পড়ল লোকটার। চাউনিতে হিস্টিরিয়ার পূর্বলক্ষণ ফুটল। 'কেন?' বলতে গিয়ে গলা ভেঙে গেল। 'আমি ওর কি ক্ষতি করেছি?'

'ক্ষতি নয়, উপকার করেছিলেন, জোসেফ অস্টিনের সামার রেস্টের দলিল ওর নামে জাল করে দিয়ে। সেই উপকারের প্রতিদান দিতে আসছে সে।'

অভিজ্ঞতা থেকে জানে দেরি হয়ে গেছে, তবু অভিযোগ অস্বীকার করার শেষ চেষ্টা করতে ছাড়ল না বৃদ্ধ। 'এসব কি যা-তা বলছেন আপনি? যত আজেবাজে...'

ঠোঁট বেঁকে গেল রানার। লোকটার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিল। 'আপনার তাই মনে হচ্ছে? কার্লো যখন বেকার, পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফ্যা ফ্যা করে, অস্টিন বন্ধু বলে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল, চাকরি দিয়েছিল। তার প্রতিদান দিতে ভুল করেনি সে, গার্সিয়াকে দিয়ে তার সেফ খুলিয়ে ডকুমেন্ট গায়েব করে দিয়ে নিজে ওটার মালিক সেজে বসেছে। অস্টিনের সেই পাপের সাজা আজও তার ছেলে ভোগ করছে।

'তার এই উপকারটা গার্সিয়া করেছিল। প্রতিদানও পেয়েছে সে। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে হার্টফেল করে মরেছে, পড়েননি এখনও সে খবর? এবার আপনার পালা। নিকৃষ্ট ক্রিমিন্যালদের মধ্যেও আপনি নিকৃষ্টতম। আপনার জন্যে অস্টিনের বিধবা বউ অকথ্য নির্যাতন সহ্য করে অকালে মরেছে। আর তার ছেলে? সব থেকেও কিছুই নেই তার। কার্লোর লাথি-ঝাঁটা খেয়ে বেঁচে আছে কোনরকমে।'

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেল ও। রাগ একটু কমল। 'আপনার মত অমানুষকে সতর্ক করার ইচ্ছে ছিল না। তবু করে গেলাম এইজন্যে, যখন কার্লোর কেস কোর্টে উঠবে, তখন তার অপকর্মের অন্তত একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী পাওয়া যাবে ভেবে।'

ততক্ষণে চিকন ঘামে ভরে গেছে ড্যানির সারামুখ, অক্সিজেনের অভাবে রীতিমত হাঁসফাঁস করছে সে। অনেকবারই মুখ খুলল কিছু বলবে ভেবে, কিন্তু দুর্বোধ্য গোঙানি ছাড়া একটা শব্দও বের হলো না।

'কোথাও আরেকটা খুন হয়েছে ডিটেকটিভ ডান কোয়েলের উপস্থিতিতে,' বলল ও। 'আপনি মুখ খুলেছেন বলে কোয়েল সেখানে পৌঁছতে পেরেছে, এই সন্দেহে কার্লো খুনী পাঠাচ্ছে। দলিল জাল করার বিষয়টা ফাঁস হতে দিতে রাজি নয় লোকটা। কাজেই বাঁচতে চাইলে দু'চারদিনের জন্যে সরে পড়ুন।'

লোকটাকে বাক্‌রুদ্ধ, স্থবির করে রেখে বেরিয়ে এল রানা।

দশ

পাম বীচ পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে পিনতন নীরবতা। চীফের রুমে পা রেখেই

ডিটেকটিভ ডান কোয়েল টের পেল কিছু একটা ঘটেছে। ক্যাপ্টেন রিচার্ড অ্যাশক্রফট, সার্জেন্ট কেন হ্যারিস ও হোমিসাইড ইন-চার্জ ফ্রেড হেস, প্রত্যেকে গম্ভীর।

'এসব কি, কোয়েল?' প্রশ্ন করল চীফ তার সামনে পড়ে থাকা এক ফ্যাক্স মেসেজ দেখিয়ে। 'কি জট পাকিয়ে রেখে এলে সেইন্ট লুসিতে? জানো, লেফটেন্যান্ট অ্যালবার্ট তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট পাঠিয়েছে? এসব সত্যি হলে অনেক বড় সমস্যায় পড়বে তুমি বোঝো?'

বহুবার রিহার্সেল করে আসা কথাগুলো শেষবারের মত মনে মনে আউড়ে নিল সে। জানত এমন কিছু ঘটবে, সহজে তাকে রেহাই দেবে না হারামজাদা লেফটেন্যান্ট।

'চীফ, আমি জানি আপনার সাথে আলাপ না করে ওখানে আমার যাওয়া ঠিক হয়নি,' শুরু করল কোয়েল। 'কিন্তু ওই রিপোর্টে যা আছে তা সত্যি নয়।'

'মানে?' পাইপ টানা বন্ধ হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের।

'লোকটা অনর্থক বকাবকি করেছে আমাকে, পাম বীচের পুলিস উপকূলের সেরা অকম্মার ধাড়ী বলে এখানকার সবাইকে গাল দিয়েছে। এসব শুনে আমি তাকে সহযোগিতা করিনি, তাই রিপোর্ট করেছে লোকটা।'

সন্তুষ্ট হলো কোয়েল উপস্থিত প্রত্যেকের চেহারা লাল হয়ে উঠতে দেখে। সোজা হয়ে গেছে ক্যাপ্টেন, দু'চোখ রাগে জ্বলছে।

'কি!' খেঁকিয়ে উঠল সার্জেন্ট। 'আমরা উপকূলের সেরা অকম্মার ধাড়ী, এই কথা বলেছে অ্যালবার্ট?'

'হ্যাঁ,' চেহারায় দুঃখ দুঃখ ভাব ফোটাল ডিটেকটিভ।

'ব্যাটা অভদ্র!' ফ্রেড হেস প্রায় বিস্ফোরিত হলো। 'এতবড় সাহস! আমরা অকম্মার ধাড়ী, আর ও বুঝি আরকুল পোয়েরো? শালাকে বাথরূমে ছেড়ে দিলেও তো বের হওয়ার রাস্তা খুঁজে বের করতে পারবে না।'

'থামো!' বাধা দিল ক্যাপ্টেন। 'মাথা গরম করার প্রয়োজন নেই। অ্যালবার্ট বলেছে বলেই কথাটা সত্যি হয়ে যায়নি!' কোয়েলকে দেখল সে সন্দেহের চোখে। 'এ কথা বলল কেন সে?'

'আপনি বলেছিলেন হানা ল্যাঙলির খোঁজ বের করতে, তাই তাড়াতাড়ি কাজ সারা যাবে ভেবে আপনার পারমিশন না নিয়েই সেইন্ট লুসি চলে গিয়েছিলাম। ওদের এতসব জানাতে গেলে লেফটেন্যান্ট হয়তো তদন্তের অনুমতি না দিয়ে নিজেই কেসের দায়িত্ব নিত, কাজের কাজ কিছুই হত না, তাই...'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন। 'তারপর?'

পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে নিয়ে আসা গেছে বুঝতে পেরে খুশি হয়ে উঠল কোয়েল। ফের শুরু করল। যখন বলা শেষ হলো তার, আবার পিনপতন নীরবতা নেমে এল হেডকোয়ার্টার্সে। গভীর চিন্তায় ডুবে থাকল তিন শ্রোতা।

'কেন তখনই ওর ব্রীফকেসটা চেক করলে না?' বলে উঠল হোমিসাইড ইন-চার্জ। 'করলে তক্ষুণি...'

বাধা দিল ক্যাপ্টেন। 'ও যা করেছে ঠিকই করেছে। বিনা কারণে কি করে

একজনের ব্রীফকেস চেক করবে? হ্যারিস, তুমি কি ভাবছ?'

নড়ে বসল সার্জেন্ট। 'কোয়েল যা করেছে ঠিকই করেছে, চীফ। খুঁজে খুঁজে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোই বের করেছে। এরা সব কটা একেকটা জাত ক্রিমিন্যাল। বক্সিঙে মায়ামির এক্স চ্যাম্পিয়ন ছিল কার্লো। ও ড্রাগে আসক্ত হয়ে পড়েছে জানতে পেরে অ্যাসোসিয়েশন বের করে দিয়েছিল। সেই লোক এখানে এসে প্রথমে চাকরি নিল জোসেফ অস্টিনের সামার রেস্টে, পরে কার অ্যাক্সিডেন্টে অস্টিনের মৃত্যুর পর ওটার মালিক হয়ে গেল সে, মালিকের বউকে বিয়েও করল।

'অন্যদিকে মায়ামির আরেক ক্রিমিন্যাল, সিজার গার্সিয়া, সে-ও হঠাৎ করে ঘন ঘন সফর করতে লাগল এখানে। যতবার আসে, ততবারই দেখা করে কার্লোর সাথে। আগেও কয়েকবার এসেছে লোকটা, কম অবশ্য। এদের সাথে জুটল আরেক ক্রিমিন্যাল, ড্যানি ও ব্রায়ান। সবার কার্যকলাপের ওপর নজর ছিল আমাদের, কিন্তু সরাসরি কাউকে চার্জ করার মত অভিযোগ বা তথ্য প্রমাণ না পাওয়ায় কিছু করা সম্ভব হয়নি। মনে হচ্ছে এবার কাজটা করা যাবে। মাসুদ রানাই সে সুযোগ এনে দিয়েছে।

'আমার জানামতে গত মার্চের প্রথম সপ্তায় এক দিনের জন্যে এখানে এসেছিল গার্সিয়া। দেখা করেছিল কার্লোর সাথে। তার টানা ছ'মাস পর এই আসা। এল, বেরিয়ে গেল, তারপর লাশ হয়ে ফিরল।

'মনে হচ্ছে ওরা দু'জন বড় কোন স্মাগলিঙের কাজে হাত দিয়েছিল। কার্লো চতুর বলে নিজের বোট কাজে লাগায়নি, নিজে আড়ালে থেকে ভেরো বীচের টমাসের বোট ভাড়া করিয়েছিল গার্সিয়াকে দিয়ে। সাগরে গোলাগুলির কথা যখন উঠল, মনে হয় ওদের নিজেদের মধ্যেই ঘটেছে ব্যাপারটা। কোস্টাল গার্ড গত দুই মাসে স্মাগলারদের যত বোট সীজ করেছে, তার মধ্যে গ্লোরিয়া টু নামে কোন বোট নেই। দুই ক্রুর মৃত্যুও রিপোর্ট হয়নি। তার মানে এসব সম্পূর্ণটাই ওদের ভেতরের ব্যাপার। চেপে গেছে ওরা।'

পাইপ কামড়ে ধরে মাথা ঝাঁকাল চীফ। 'তোমার অনুমানই সঠিক মনে হচ্ছে আমার। বেশ মিলে যাচ্ছে।'

'কিন্তু তাহলে গার্সিয়া কেন মরল?' প্রশ্ন করল ফ্রেড হেস। 'কে টর্চার করল ওকে, কেন?'

'হয়তো কার্লো। বখরা নিয়ে গণ্ডগোলের জের হিসেবে প্রতিপক্ষকে মেরে রাস্তা সাফ করেছে।'

'গণ্ডগোল ঘটে থাকলে এখানে এসে তার সাথেই কেন প্রথম দেখা করল গার্সিয়া?' বলল ডান কোয়েল।

'আমার ধারণা,' চিবুক ডলতে ডলতে আনমনে বলল সার্জেন্ট। 'কার্লোকে শাসাতে গিয়েছিল লোকটা। বিপদ বুঝতে পেরে কার্লো নিজের ভাড়াটে খুনী মাসুদ রানাকে দিয়ে চিরতরে তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।'

'কিন্তু…তাই যদি হবে,' বলল ক্যাপ্টেন। 'সরাসরি গুলি করে মেরে ফেলল না কেন? নির্যাতন কেন করল? নিশ্চই গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য আদায় করার জন্যে। তাই হবে,' আপনমনে মাথা দোলাল সে।

'আরেকটা প্রশ্ন,' বলল ডান কোয়েল। 'অবস্থা দেখে মনে হয় হত্যাকাণ্ড ভেরো বীচেই ঘটেছে। যদি ধরে নেয়া হয় কার্লোই তার লোককে দিয়ে গার্সিয়াকে খুন করিয়েছে, তাহলে ওখানেই কেন ফেলে রাখা হলো না মৃতদেহটা? মারাত্মক ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও গাড়ি ভাড়া করে ওটাকে এতদূর কেন টেনে আনা হলো?'

'রাইট!' প্রশংসার চোখে ডিটেকটিভকে দেখল চীফ। 'দারুণ একটা পয়েন্ট। ঠিক।'

'চীফ, সেদিন কার্লো আমাকে সস্ত্রীক দাওয়াত করেছে তার জয়েন্টে যাওয়ার জন্যে। আপনি অনুমতি দিলে কাল যেতে চাই আমি। মাসুদ রানার কান মুচড়ে আরও কিছু তথ্য আদায় করা যায় কি না দেখতে চাই।'

'এমনি যেতে চাও যাও,' বলল ক্যাপ্টেন। 'কিন্তু ওসব করতে যেয়ো না। লোকটা আসলে কে, আগে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। কি যেন নাম লোকটার? কি পরিচয়?'

'ওর আইডি তো দেখিনি, চীফ,' বলল কোয়েল। 'তবে কার্লো বলেছে লোকটা নাকি সাঁতারে বিরানব্বই সালের ইওরোপীয় চ্যাম্প। ফ্রী স্টাইল। মাসুদ রানা নাম।'

'ও কে, চলবে,' সার্জেন্টের দিকে তাকাল চীফ। 'ওয়াশিংটনে মেসেজ পাঠাও, বলো, বিরানব্বইয়ের চ্যাম্পের নাম-বর্ণনা সব জেনে আমাদের ফ্যাক্স করতে। আর...' রুমের ফ্রস্টেড কাঁচের দরজা খুলে যেতে দেখে থেমে গেল সে।

ভেতরে ঢুকল আরেক ডিটেকটিভ থার্ড গ্রেড রেড রেটনিক। এ-ও বয়সে তরুণ, তবে মোটা। চুল প্রায় লাল। হাইওয়ে ওয়ান চেক করার দায়িত্ব পড়েছিল এর ওপর।

'খবর আছে?' প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ, চীফ,' মুখের ঘাম মুছে বলল যুবক।

'বোসো। বলো কি জানতে পেরেছ।'

ভারী দেহ নিয়ে ধপ্ করে বসল সে। 'গার্সিয়ার মাসটাঙের সাথে একটা ক্যারাভ্যানও ছিল জানা গেছে।'

'আচ্ছা,' সন্তুষ্ট দেখাল ক্যাপ্টেনকে। তার ধারণাই ঠিক হলো তাহলে। 'আর কিছু?'

'লাশ যেখানে ছিল, তার দুই মাইল এপাশে এক মার্কেটের পিছনে পড়ে ছিল ওটা। মার্কেটটা পরিত্যক্ত। ভেঙে নতুন করে তৈরি করা হবে বলে দোকানপাট সব মাসখানেক আগে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর, তেরো তারিখ ভোরে দু'জনকে দেখা গেছে মাসটাঙ চালিয়ে এদিকে আসতে। একজনের বয়স সাতাশ-আটাশ, অন্যজন অল্পবয়সী, আঠারো উনিশের মত। দু'জনই পুরুষ।'

'বর্ণনা দাও,' নোট নেয়ার জন্যে তৈরি হলো সার্জেন্ট।

নিজের নোট দেখে পড়ে যেতে থাকল সে, প্রথমজনেরটা শুনেই মাথা দোলাল ডান কোয়েল। 'মাসুদ রানা।' পরেরজনকে চিনল না। ঠিক হলো রানার মুখ থেকেই তার পরিচয় বের করা হবে সময়মত।

'প্রশ্নটা কনফার্ম হলো, চীফ,' মন্তব্য করল সার্জেন্ট। 'কেন এতদূর লাশটা বয়ে

নিয়ে এল ওয়েট্রেস।

মাথা দিয়ে ডেস্কের দিকে ফিরল সে। 'তারপর?'

'তেরো তারিখ, ভোর তিনটের দিকে এরা দু'জন মাস্টাঙ নিয়ে ভেরো বীচের দিক থেকে আসার পথে রাস্তার এক অল নাইট কাফেতে থেমেছিল কফি খেতে। এক ট্রাক ড্রাইভার দেখেছে এদের।' থেমে গেল যুবক।

'আর?'

'কফি সার্ভ হওয়ার আগেই বয়স্কজন হঠাৎ কি দেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে টেবিল থেকে, দরজার কাছে গিয়ে নিজের মাস্টাঙের দিকে তাকিয়ে ছিল সেকেন্ড কটা, বলেছে সে। তার দেখাদেখি ট্রাক ড্রাইভারও সেদিকে তাকিয়ে দেখে, একটা সাদা রঙের বড় কার এসে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে দাঁড়াল মাস্টাঙের ক্যারাভ্যানের কাছে। সাথে সাথে ওটা থেকে কে একজন নেমে লাফিয়ে বাইরে এসেই উঠে পড়ল সাদা গাড়িটায়। পরক্ষণে ওটা হাওয়া হয়ে যায়। এদিকেই এসেছে। ক্যারাভ্যান থেকে বের হওয়া লোকটিকে তার মেয়ে মনে হয়েছে। সাদা স্কার্ফ ছিল তার মাথায়। চেহারা দেখা সম্ভব হয়নি।'

'নিশ্চই পার্সিয়ার সেই সঙ্গিনী,' বলল সার্জেন্ট। 'মাস্টাঙ ভাড়া করার সময় হারযের অফিসে গিয়েছিল।'

ক্যাপ্টেনের চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ ফুটল। 'গাড়িটার নাম্বার?'

'দেখতে পায়নি সে। তবে ওটাকে তার মার্সিডিজ মনে হয়েছে।'

এর কি অর্থ হতে পারে? ভাবল ক্যাপ্টেন। 'আচ্ছা, তারপর?'

'তাড়াতাড়ি কফি খেয়ে গাড়িতে ফিরে যায় তারা, বয়স্কজন...'

'মাসুদ রানা,' বাধা দিল কোয়েল।

'হ্যাঁ,' রেড মৌখিক মাথা দোলাল। 'মাসুদ রানা ক্যারাভ্যানের ভেতরে উঁকি দিয়ে হয়তো চেক করতে থাকে কিছু। একটু পর অন্যজন যোগ দেয় তার সাথে, দু'জনে পাঁচ-দশ সেকেন্ড কথা বলে মাস্টাঙে ফিরে আসে। রওনা হয়ে পড়ে বেশ দ্রুত গতিতে।'

'এই ড্রাইভারের নাম ঠিকানা?'

'এনেছি, চীফ।'

'মামলা আরও জোরালো হয়ে উঠল,' মৃদু হেসে বলল আপনমনে।

'তাই তো দেখছি,' পাইপ ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ক্যাপ্টেন অ্যাশক্রফট। ডান কোয়েলের দিকে তাকাল। 'ক্যাল, যাও তুমি কার্লোর ওখানে। চারদিকে সতর্ক নজর রাখবে। নতুন কোন ঝামেলা বাধিয়ে বোসো না আবার।'

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে বউয়ের সাথে খটাখটি বেধে গেছে ডান কোয়েলের। তর্ক চলছে। এ অবশ্য নতুন কিছু নয়, নিত্যনৈমিত্তিক। তিন বছর হলো ক্যারলকে বিয়ে করেছে সে, মোটামুটি ১০৯৫ দিনের সংসার, গড়ে রোজ দু'বার করে তর্কাতর্কি—একদিনও বাদ যায়নি। কোয়েলের হিসেবে ২১৯০ বার তর্ক বা ঝগড়া হয়েছে ওর ক্যারলের সাথে, এর মাত্র ১৮০ টায় জিতেছে সে। অমীমাংসিত থাকেনি একটিও।

পাম বীচ সামার রেস্টে যাবে বলে সন্ধে ছটায় বাসায় ফিরেছে কোয়েল। এমনিতে রোজ ফেরে রাত এগারোটায়। আজ আগে এসেই বাধিয়েছে ঝামেলা। কিচেনে রাতের খাবার তৈরি করতে গিয়ে গরমে হাঁসফাঁস করছিল ক্যারল, সর্বত্র এটা-ওটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রীতিমত যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে ফেলেছে কিচেনটাকে। স্যান্ডউইচ, কি বড়জোর হ্যামবার্গার তৈরি করতে পারে সে মোটামুটি পরিবেশ সুস্থ রেখে, এর বাইরে কিছু হলেই সেরেছে। কাজ শেষে কিচেন গোছগাছ করতেই ঘণ্টা কাবার।

এমনিতে স্বামীর পছন্দ-অপছন্দের দিকে কড়া নজর ক্যারলের, তার প্রিয় খাবার রাঁধতে যত কষ্টই হোক, পিছপা হয়নি কখনও। শনিবারের ডিনারটা আজ একটু ভারী হওয়া চাই ভেবে রীতিমত মল্লযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল সে, কাজ অনেকদূর এগিয়েও গেছে, এমন সময় কোয়েল হাজির। কি না, আজ বাইরে ডিনার খাবে তারা।

'সকালে কেন বললে না সে কথা?' রেগে উঠল ঘর্মাক্ত ক্যারল। 'আমি শুধু শুধু এত কষ্ট করলাম!'

'দেখো, ডার্লিঙ,' হাত তুলে ওকে শান্ত করতে চাইল কোয়েল। 'আজকের দিনটা অন্তত বাদ দাও, তর্ক না করে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।'

'কি বলতে চাও তুমি?' ক্যারল ঝাঁঝিয়ে উঠল। 'রোজ আমি শুরু করি তর্ক?'

ভুলটা বুঝতে পারল সে। 'তর্ক' কথাটা মুখে আনাই ঠিক হয়নি। 'তর্ক করার কথা কখন বললাম? তুমি ভুল শুনেছ নিশ্চই।'

'তুমি বলেছ!'

'তাই বলেছি? আশ্চর্য! তাহলে বোধহয় ঠাট্টা করে বলেছি, সরি। ভুলে যাও। তৈরি হয়ে নাও জলদি। তোমাকে নিয়ে আজ আমি এখানকার সেরা সামার রেস্ট, এবং দ্বিতীয় সেরা রেস্টুরেন্টে ডিনার খেতে যাব। চমৎকার খাবার, সাগর, বীচ, সফট মিউজিক, আরও কত কিছু আছে ওখানে, না গেলে...'

'ওখানেই কেন?' সন্দেহ ফুটল ক্যারলের চেহারায়। 'ওখানে যেতে কত টাকা খরচ হবে? এত টাকা তুমি পেলে কোথায়?'

অস্থিরতা ঠেকাতে দু'হাতে কোটের ল্যাপেল ধরে নিচের দিকে টানতে লাগল কোয়েল। 'ওটার মালিক আমাকে পছন্দ করে। সে দাওয়াত করেছে আমাদের দু'জনকে। সব ফ্রী।'

সন্দেহ আরও ঘন হলো মেয়েটির। 'তোমাকে পছন্দ করে লোকটা? কেন? বিনে পয়সায় কেন খাওয়াবে?'

মাথা দোলাল হয়রান ডিটেকটিভ। জানে না।

'তার মানে কোন অপরাধ করেছে সে?'

কিচেনে চক্কর শুরু করল কোয়েল। নাক দিয়ে মৃদু গুনগুন শব্দ করছে, যেন হারানো চাক খুঁজে বেড়াচ্ছে পথহারা মৌমাছি। 'কিছুই করেনি,' বলল সে কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেয়ে। 'আমাকে লোকটা পছন্দ করে।'

'কেন?'

'মহা যন্ত্রণায় পড়লাম তো! আমি তার কি জানি? সে বলেছে পছন্দ করে, ব্যস্,

এত কথায় কি কাজ আমার?'

'চ্যাঁচাবে না, আস্তে কথা বলো।'

'চ্যাঁচালাম কখন আবার?' অভ্যেসবশে হাত ঝাঁকাল কোয়েল, চুলোর পাশে রাখা এক উত্তপ্ত সসপ্যানের ঢাকনায় ভয়ানক ছ্যাঁকা খেয়ে লাফিয়ে উঠল। অশ্লীল গালের তুবড়ি ছোটাল মুখ দিয়ে।

'একেক সময় তোমার নোংরা...'

'প্লীজ, ডার্লিঙ,' প্রায় হাতজোড় করে বলল সে। 'তৈরি হয়ে নাও। পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।' স্ত্রী শান্ত হয়েছে ভেবে যোগ করল, 'দু'চারটা ধোয়া শার্ট আছে? কি পরে যাব আমি?'

'একসাথে কয়টা শার্ট পরতে হবে তোমাকে?' চোখ কোঁচকাল ক্যারল।

অবশেষে শান্ত হলো পরিবেশ। ক্লজিট থেকে নিজের যাবতীয় ড্রেস বের করে বিছানার ওপর রেখে বাছাই করতে বসল ক্যারল। কোনটা পরবে ঠিক করতে পারছে না। 'সব ব্যাকডেটেড', 'একটাও মানুষের সামনে পরে যাওয়ার মত নয়,' বিড়বিড় করে বকে চলেছে।

বের হওয়ার সময় আরেক ঝামেলা বাধিয়ে বসল মেয়েটি কোয়েল গানবেল্ট পরে চলেছে দেখে। কিছুতেই ওটা নিতে দেবে না। তাকে সে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করল ওটাই নিয়ম, অফিসারদের সবসময় অস্ত্র সাথে রাখতে হয়, কে শোনে!

ক্যারলের এক কথা, অস্ত্র সঙ্গে নেয়া চলবে না।

যখন বোঝা গেল কথা বাড়ানো অনর্থক, বেল্ট খুলে সিটির ওপর ছুঁড়ে ফেলল ডিটেকটিভ। এরমধ্যেই সোয়া এক ঘণ্টা অপচয় হয়ে গেছে, আর উচিত হবে না। খিদেয় নাড়ীভুঁড়ি জ্বলছে তার। ওখানে যেতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে!

'বাচ্চা ছেলের মত আচরণ করছ তুমি,' গানবেল্টটার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল ক্যারল। 'ওটা ছুঁড়ে মারার কি হলো?'

'আমরা কি রওনা হতে পারি এখন?' আরেকদিকে তাকিয়ে বলল ডান কোয়েল।

'আমি অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি।'

শনিবার রাতে প্রচুর মানুষ ডিনার খেতে আসে পাম বীচ রেস্টুরেন্টে। বেশ রাত পর্যন্ত জমজমাট থাকে গোটা এলাকা, পার্কিং লট বোঝাই থাকে দামী গাড়িতে।

আজও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি, প্রচুর কাস্টমার ভেতরে। চীফ ওয়েটার ম্যানুয়েল দম ফেলার সময় পাচ্ছে না—তাদের অভ্যর্থনা জানানো, রিজার্ভ করা টেবিলে বসিয়ে হাতে মেন্যু ধরিয়ে দিয়ে আরেক দলকে অভ্যর্থনা জানাতে ছোটা, ফিরে এসে ঘুরে ঘুরে নোট প্যাডে অর্ডার লিখে নিয়ে কিচেনে ছোটা, সব মিলিয়ে মহাব্যস্ত সে।

আটাশ নম্বর যুগলকে রিসিভ করতে এন্ট্রান্সের দিকে এগোল লোকটা, কিন্তু অতিথি দু'জনের ওপর চোখ পড়তেই এমনভাবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, মনে হলো বুঝি নিরেট দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে। হাসি মুছে গেল মুখ থেকে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে

নিজেকে সামলে নিল।

'মিস্টার কোয়েল!' হাসল ম্যানুয়েল দাঁত বের করে। তার সঙ্গিনীর দিকে ফিরে লম্বা নড করল। 'মিসেস কোয়েল! আসুন, আসুন, কী সৌভাগ্য!'

পুলিসী দৃষ্টিতে লোকটাকে বিদ্ধ করল ডিটেকটিভ। 'কার্লোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি। কোথায় সে?'

'অবশ্যই!' এই ধরনের বিশেষ পরিস্থিতির কথা ভেবে তিনটে টেবিল রিজার্ভ রাখে ম্যানুয়েল, তার একটার দিকে ওদের দু'জনকে নিয়ে চলল সে। 'আপনারা আসায় খুব খুশি হয়েছি, আসুন। বসুন। দেখছেন তো কী ভিড়! কার্লো কিচেনে আছে। আপনারা বসুন, আমি খবর দিচ্ছি ওকে।' ছুটল সে ভেতর দিকে।

কিচেনে তখন দম ফেলারও সময় নেই কার্লোর। খবর শুনে বিরক্ত হওয়ার ভান করল সে। 'যা খেতে চায়, যা পান করতে চায়, সার্ভ করে যাও। সব সেরা, সব ফ্রী। আর চোখ রেখো ওর ওপর।'

সহকারীর হাতে আর সব টেবিলের ভার ছেড়ে দিয়ে কোয়েলের পানীয়ের অর্ডার নিতে এগোল ম্যানুয়েল। 'তোমাদের নতুন লাইফগার্ড, কি যেন নাম? মাসুদ রানা, সে কোথায়?' প্রশ্ন করল তাকে ডান কোয়েল।

'আছে, মিস্টার কোয়েল। মনে হয়…'

'তাকে ডেকে আনো। ও আমাদের সার্ভ করুক, তুমি অন্যদের সার্ভ করোগে।'

'ওকে, স্যার।'

খবর পেয়ে দু'মিনিট পর রেস্টুরেন্টে ঢুকল রানা। ম্যানুয়েলের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে সরাসরি ডিটেকটিভের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল। এন্ট্রান্সের কাছেই, বাঁ দিকের চার নম্বর টেবিলে বসে আছে সে এক দীর্ঘাঙ্গিনী সুন্দরী নিয়ে। হাত তুলে ওকে ডাকল ডিটেকটিভ। মুখে হাসি, অথচ চাউনি কঠোর।

'হ্যালো, মাসুদ রানা! চিনতে পারছ আমাকে?'

'নিশ্চই!' শুকনো কাঠের মত চেহারা ওর। ডিটেকটিভের সামনে বসা মেয়েটিকে দেখল। বেশ সুন্দরী মেয়েটি, ফিগার চমৎকার।

'আমিই ডেকেছি তোমাকে,' বলল কোয়েল। 'কেমন চলছে তোমার চাকরি?'

'ভাল।'

'শুধু ভাল, না খুব ভাল?'

স্বামীর গলায় অস্বাভাবিক কিছু আছে বুঝতে পেরে চট করে কপাল কুঁচকে উঠল ক্যারলের। সামনে দাঁড়ানো চমৎকার হ্যান্ডসাম যুবককে দেখামাত্র তার রক্তের চাপ সামান্য বেড়ে গেছে, কারণ এত আকর্ষণীয়, সুদর্শন ও সুপুরুষ এর আগে কখনও চোখে পড়েনি তার। এমন একজনের সাথে কোয়েলের খোঁচামারা কথা ভাল ঠেকেনি কানে। 'সময় নষ্ট না করলে চলছে না?' ঠাণ্ডা গলায় বলল সে। 'আমার গলা শুকিয়ে গেছে।'

ধারেকাছে কোন ওয়েটার নেই দেখে তার দিকে তাকাল রানা। 'কি দেব আপনাদের?'

রক্তের চাপ আরেকটু বাড়ল ক্যারলের। 'টম কলিন্স, প্লীজ!'

স্ত্রীর মুখে আশ্চর্য আবেদনময় হাসি দেখে বিস্মিত হলো ডান কোয়েল, এমন হাসি ও দিতে পারে তা আজই প্রথম দেখল। 'আমার জন্যে ডবল স্কচ, প্লীজ!' গম্ভীর গলায় বলল সে।

'একটু কড়া হয়ে গেল না?' বলল মেয়েটি। স্বামীর মুখ দেখেই মনের কথা বুঝে ফেলেছে। তাকে অন্য পুরুষের দিকে ঝুঁকতে দেখে কোয়েল ঈর্ষায় ভোগে, এ-ও কম আনন্দের কথা নয়। সে সব যে তার মধ্যে আছে, তিন বছরের মধ্যে ক্যারলও আজই প্রথম অনুভব করল। 'রওনা হওয়ার আগে যথেষ্ট পান করেছ তুমি,' বলে রানার দিকে ফিরল। 'অল্প দেবেন, প্লীজ, বরফ বেশি।'

চলে গেল রানা।

'দেখো, ডার্লিঙ,' বিরক্ত গলায় বলল ডিটেকটিভ। 'আমার অর্ডার তোমার সংশোধন করার দরকার নেই। আমি নিজের ক্যাপাসিটি ভালই জানি।'

'আমি চাই না তুমি বেসামাল হয়ে এত লোকের সামনে আমার মুখ হাসাও,' আরেকদিকে ফিরে বলল ক্যারল। 'আর দয়া করে কারও সাথে পুলিসী মেজাজও দেখিয়ো না। আমরা এখানে খেতে এসেছি, আসামীকে জেরা করতে নয়।'

শ্রাগ করল অফিসার। স্ত্রীকে সে কি করে বোঝাবে যে একজন ডিটেকটিভকে প্রতিটি মুহূর্ত ডিউটিতে থাকতে হয়? আজ তার এখানে আসার ব্যাপারটাও ডিউটির মধ্যে পড়ে?

ওদিকে বারে জোকে সাহায্য করছিল রিকি। তাকে নিয়ে দু'জনের মধ্যে দুপুরের পর থেকে বেশ কানাঘুষা চলছে, খেয়াল করেছে রানা। কি নিয়ে সে ওরাই জানে, তবে রানাকে যে দু'জনে নতুন চোখে দেখতে শুরু করেছে, তা পরিষ্কার। কোয়েল এসেছে শুনে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল রিকি, হাতের গ্লাস ছেড়েই দিচ্ছিল আরেকটু হলে।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'এখনই কিছু করতে যাচ্ছে না লোকটা। বউ নিয়ে খেতে এসেছে, রিল্যাক্স। আমি দেখছি ওদিকটা। তুমি কাজ করে যাও। বের হবে না এখান থেকে।'

কোয়েলকে দেখে ও নিজেও একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। ফাঁদ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে আরও কয়েক ঘণ্টা সময় প্রয়োজন, নিনার সাথে শেলডন যাওয়ার পরিকল্পনাও পাকা, এমন মুহূর্তে যদি ঝামেলা ঘটে যায়, তাহলে মুশকিল। তবে এখন রানা নিশ্চিন্ত। লোকটা যে খেতেই এসেছে, তাতে ওর সন্দেহ নেই।

'ও আপনাকে গার্সিয়ার সুটকেস হাতে দেখে ফেলেছিল, চ্যাম্প,' কাঁপা হাতে কোয়েল ক্যারলের পানীয় ঢালল রিকি। 'যদি...'

অদ্ভুত এক হাসি দিল রানা। 'দেখেছে নাকি? তুমি ঠিক জানো?'

বোকার মত তাকাল সে। 'মানে! আপনি না...'

'বলেছিলাম, তাই তো? হ্যাঁ, বলেছি। সে-ও দেখেছে, কিন্তু তাতে কি? ওকে তা প্রমাণ তো করতে হবে। সাক্ষী ছাড়া কি করে তা প্রমাণ করবে সে?'

'কিন্তু...'

'বলেছি তো ঘাবড়িয়ো না। আমাকে সামলাতে দাও।'

ড্রিঙ্ক নিয়ে ফিরে এল রানা। ম্যানুয়েল তখন ওদের দু'জনের অর্ডার নিচ্ছে।

রানার দিকে পাখির মত চকিত চাউনি দিয়ে টম কলিনসে চুমুক দিল ক্যারল। কোয়েল নিজের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে তেতো গেলা চেহারা করল।

'কার্লোর ইচ্ছে আপনি তার স্পেশাল ডিশ টেস্ট করবেন আজ, মিসেস কোয়েল,' ম্যানুয়েল বলল চওড়া হাসি দিয়ে। 'ডাক ক্যাসেরোল উইথ গ্রীন পিপার। শুরুতে অয়েস্টারস অন শ্রিম্প টোস্ট। কেমন মনে হয়?'

'আর বলতে হবে না,' ক্যারল বলল। 'তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো, প্লীজ!'

'আপনি, মিস্টার কোয়েল?'

'শুধু স্টেক।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি। 'ওহ্, ডান! স্টেক তো সবসময়ই খাওয়া হয়, আজ একদিন না হয়...'

'শুধু স্টেক!' দৃঢ় স্বরে বাধা দিল অফিসার।

'বেশ,' শ্রাগ করল সে।

সময় বুঝে আস্তে করে সরে পড়ল রানা। কার পার্কে কোর্টেজের ওপর চোখ পড়ল। পলার জন্যে মার্সিডিজের দরজা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝা গেল এইমাত্র পৌঁছেছে। কোর্টেজও রানাকে দেখল, কি যেন বিড়বিড় করে বলল পলার উদ্দেশে। খেয়াল না করার ভান করে আরেকদিকে হেঁটে গেল ও, যেন ব্যস্ত খুব। দেখলেই হয়তো খেজুরে আলাপ শুরু করে দিতে চাইবে মেয়েটি, কিন্তু রানার তাতে যোগ দেয়ার কোন ইচ্ছে নেই।

বীচের দিকে এগোল ও। জায়গাটা ফাঁকা এ মুহূর্তে। একটা গাছের আড়ালে বসে সিগারেট ধরাল ও। নজর রাখল কোর্টেজের ওপর। গাড়ির সাথে হেলান দিয়ে সে-ও সিগারেট টানছে।

এক ঘণ্টা বিশ মিনিট ধরে খেল ক্যারল-কোয়েল। কফির অর্ডার দিয়ে জয়েন্টটা একটু ঘুরেফিরে দেখার জন্যে উঠে পড়ল গোয়েন্দা। অবশ্য বউকে বলল অন্য কথা। 'আমি পেচ্ছাপ করতে যাচ্ছি।'

'ডান!' চরম বিরক্তি ফুটল মেয়েটির চেহারায়। 'আর কবে ভদ্র ভাষায় কথা বলা শিখবে তুমি? টয়লেটে যাচ্ছি বললে কি হত?'

'আমি তাইই বলেছি,' আরেকদিকে তাকিয়ে বলল সে। 'তুমি অন্যরকম শুনে থাকলে আমি কি করব? বোসো তুমি। কিছু দরকার হলে কাউকে ডেকে...' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

রেস্টুরেন্ট থেকে বের হতে হাতের বাঁয়ে কিচেন, বেশ একটু দূরে। ওখানে যাওয়ার শান বাঁধানো পথের শেষ মাথায় বড় পার্কিং লট। জায়গাটা আবছা অন্ধকারমত। কিচেনে যাওয়ার জন্যে পা চালিয়েছিল কোয়েল, কিন্তু পার্কের একটা গাড়ির ওপর চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল। ওটা সাদা মার্সিডিজ।

কপাল কুঁচকে উঠল ডিটেকটিভ ডান কোয়েলের। এরকম একটা গাড়ির কথাই না রেড রেটনিক...? ওটার পাশে খাটোমত এক লোককে দেখে রীতিমত চমকে উঠল। অনুমান, পাঁচ ফুট পাঁচ হবে সে, গাট্টাগোট্টা। চওড়া কাঁধ। মাথায় পানামা হ্যাট। দেখামাত্রই বুঝল এই লোকই হানা ল্যাঙলির খুনী। সেদিন একেই সে দেখেছে পালিয়ে যেতে। মুখে রুমাল বাঁধা ছিল বলে চেহারাটা দেখতে পায়নি বটে। কিন্তু এ

যে সেই লোক, তাতে কোন সন্দেহই নেই।

ব্যাটাকে কাছ থেকে দেখার জন্যে এগোল কোয়েল, অভ্যেসবশে হাত চলে গেল গানবেল্টের কাছে। শূন্য হাত ফিরে এল, মনে মনে ক্যারলের উদ্দেশে নোংরা কয়েকটা গালি দিল। দুই বগল দিয়ে ঘাম গড়িয়ে নামতে শুরু করল তার। কি করবে এখন সে? খুনীকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দেবে? নাকি হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করে সাহায্য চাইবে?

না, তা করা যাবে না। করলে জানাজানি হয়ে যাবে সে অস্ত্র ছাড়া বের হয়েছে। ব্যাপারটা বেআইনী। সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অস্থির চিত্তে পা বদল করল কোয়েল, কি করা যায়? হানার খুনী লোকটা, আর গাড়িটা...হয়তো ওটাই সেই গাড়ি, যেটাকে হাইওয়েতে সে রাতে দেখা গেছে মাসটাঙের ক্যারাভ্যান থেকে কাউকে তুলে নিতে। পুরো সেট আপটার কোথাও মস্ত এক ভজকট আছে, এখনও সব ক্লীয়ার নয়। কোনটার সাথে কোনটার সংযোগ আছে, বোঝা যাচ্ছে না পরিষ্কার।

বুঝতে হলে একে ধরতে হবে, ভাবল কোয়েল, ইন্টারোগেট করতে হবে। এগিয়ে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল সে। এ মুহূর্তে লোকটার কাছে অস্ত্র না থাকাই স্বাভাবিক। আর নিজে সে পুলিস অফিসার, পরিচয় দিলে তার কাছে অস্ত্র নিশ্চই আছে ভেবে বাড়াবাড়ি করার কথা ভাবতে পারবে না ব্যাটা, কাজেই সুযোগটা ছাড়া ঠিক হবে না।

এগিয়ে গেল ডান কোয়েল। লোকটার দশ হাত দূরে থেকে হাঁক ছাড়ল কড়া গলায়, 'অ্যাই!'

ঘুরে তাকাল কোর্টেজ, শক্ত হয়ে গেল তাকে চিনতে পেরে। ডান হাতে কোটের মাঝের বোতামটা চট্ করে খুলে ফেলল। প্রমাদ গুণল কোয়েল, ভুল ভেবেছিল সে। হারামজাদার সাথে অস্ত্র আছে! কিন্তু এখন পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তাছাড়া সঙ্গে জিনিস আছে বুঝিয়ে দিয়ে ও নিজেই কোয়েলের যে সামান্য সন্দেহ ছিল, তা দূর করে দিয়েছে। কয়েক পা এগোল কোয়েল। ভরসা করছে এত লোকের উপস্থিতিতে নিশ্চই লোকটা গুলি ছোঁড়ার সাহস করবে না।

'পুলিস!' হাঁক ছাড়ল সে। 'কে তুমি?'

'আমি মিসেস জোনসের শোফার,' অমার্জিত, কর্কশ গলায় বলল সে।

'কি নাম তোমার?' আরও কয়েক পা এগোল কোয়েল, আচমকা ঘুসি মেরে লোকটাকে পেড়ে ফেলার ইচ্ছে। কিন্তু ফাঁদে পা দিল না কোর্টেজ, পিছিয়ে গেল।

'ফের্নান্দো কোর্টেজ। মিসেস জোনসের শোফার আমি।'

'ওকে, কোর্টেজ। দু'হাত মাথার উপর তোলো, এগিয়ে এসো!' বলল বটে কোয়েল, তবে এ-ও বুঝল, ক্রিমিন্যাল তো দূরের কথা, একটা শিশুও নিরস্ত্র কারও এমন নির্দেশে প্রভাবিত হবে না।

হলোও তাই, পাত্তা দিল না কোর্টেজ, স্থির হয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। 'কেন? কি অপরাধ আমার?'

'তোমার গান বের করো!'

'মিসেস জোনসের নিরাপত্তার জন্যে গান ক্যারি করি আমি,' নির্ভীক কণ্ঠে বলল সে। 'কেন চাইছেন?'

'যা বলছি তাই করো!' কঠিন গলায় নির্দেশ দিল ডিটেকটিভ। ডান হাত সামনে বাড়াল। 'দাও!'

'কিন্তু...'

'শাডাপ্! বের করো গান!'

হতাশ ভঙ্গিতে ডানে-বাঁয়ে তাকাল কোর্টেজ, যখন বুঝল কেউ দেখছে না ওদের, অমনি বিদ্যুৎ খেলে গেল তার দেহে, একটানে অস্ত্র বের করে খেঁকিয়ে উঠল, 'আয়, ঠোলার বাচ্চা! নিয়ে যা!'

সভয়ে আঁতকে উঠল ডান কোয়েল। দেখামাত্র বুঝেছে ব্যাটার হাতের ওটা সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ, ওয়ালথার অটোম্যাটিক, কিন্তু কোন কাজে এল না তার সে বোঝা। দ্রুত এগোল ফের্নান্দো কোর্টেজ, অস্ত্র ঘুরিয়ে বাঁট দিয়ে দড়াম করে মারল ডিটেকটিভের মাথার তালুতে। ওটা আছড়ে পড়ার মুহূর্তের দশ ভাগের এক ভাগ সময় আগে কোয়েলের চোখ পড়ল মাসুদ রানার ওপর।

নিঃশব্দে শিকারী বাঘের মত কোর্টেজের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখল সে ওকে। শুধুই দেখল, কোর্টেজের গোঙানি কানে গেল না।

খবর শুনে শক্ত হয়ে গেল ক্যারল। বোকার মত ম্যানুয়েলের দিকে তাকিয়ে থাকল। ভেতরে অসহ্য রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। 'মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, মিসেস কোয়েল,' চাপা গলায় বলল লোকটা। 'তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই, গরমে এমন হতেই পারে। প্রায়ই ঘটে এমনটা। একটু রেস্ট পেলেই ঠিক হয়ে যাবেন উনি, কোন ভয় নেই।'

'ও কোথায়?' লোকটার একটা কথাও কানে গেল না তার।

'গাড়িতে শুইয়ে দিয়েছি। কোন ভয় নেই, মিসেস কোয়েল। দেখবেন, সকালেই ঠিক হয়ে যাবেন আপনার স্বামী। চলুন, আমাদের লোক বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবে আপনাদের।'

মুখ আঁধার করে উঠে পড়ল ক্যারল, ম্যানুয়েলের পিছন পিছন এগোল। নিজের ওয়াইল্ডক্যাটের পিছনের সীটে দলা হয়ে পড়ে থাকতে দেখল স্বামীকে। বিতৃষ্ণায় চেহারা বদলে গেল তার। হুইস্কির তীব্র গন্ধে ভরে আছে গাড়ির ভেতরটা। রানাকে গাড়ির পাশে কার্লোর সাথে দেখতে পেল ক্যারল। চোখাচোখি হতে মৃদু হাসল ও। 'উঠুন, মিসেস কোয়েল। আমি আসছি আপনার পিছন পিছন।'

রওনা হয়ে গেল ক্যারল, রানা কার্লোর এস্টেট কার নিয়ে অনুসরণ করছে তাকে। চিন্তিত মনে ড্রাইভ করছে মেয়েটি। মদ একটু বেশি খায় ঠিকই তার স্বামী, কিন্তু তাই বলে এমন অবস্থা তো কোনদিন হয়নি! স্ত্রীকে নিয়ে ডিনার খেতে এসে এমন এক কাজ করবে কোয়েল, ভাবাই যায় না।

বাসায় পৌঁছে অফিসারকে কাঁধে করে গেস্ট রুমে পৌঁছে দিল রানা। 'কোন দুশ্চিন্তা করবেন না, মিসেস কোয়েল। সকালে সেরে উঠবেন উনি।'

'দুশ্চিন্তা!' লিকার কেবিনেটের সামনে থেকে বলে উঠল ক্যারল, গ্লাসে জিন ঢালছে। 'ওর জন্যে? পাগল! হ্যাভ আ ড্রিঙ্ক, রানা...সরি, ক্যান আই...'

'নিশ্চই। কিন্তু আমাকে এখনই ফিরতে হবে, মিসেস কোয়েল। আজ

আমাদের কাজের চাপ খুব বেশি।'

হাসল ক্যারল। স্বামীর কারণে মন ভীষণ বিক্ষিপ্ত। তারও মন চাইছে কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে বসতে। 'একদিন না হয় আমার জন্যে কিছু সময় ব্যয় করলেই।'

এগোল রানা। সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল ঘরের। গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেল লিভিংরূম। কি ঘটতে যাচ্ছে ভেবে গলা শুকিয়ে গেল ক্যারলের, কোনমতে বলল, 'এদিকে, রানা!'

সিটিতে শুয়ে কখন লোকটা আসে, সেই অপেক্ষায় আছে ক্যারল। চোখ বন্ধ, গা কাঁপছে।

একটু পর বাইরে গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ উঠল।

চলে গেছে মাসুদ রানা।

এগারো

জ্ঞান ফিরতে ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকাতে লাগল ফের্নান্দো কোর্টেজ। কি ঘটেছিল বুঝতে একটু সময় লাগল, সঙ্গে সঙ্গে সজাগ, সতর্ক হয়ে উঠল দৃষ্টি, হিংস্র হায়েনার মত হয়ে উঠল চেহারা। ধড়মড় করে উঠে বসতে যাচ্ছিল, একটা নরম হাত বাধা দিল। ধরে শুইয়ে দিল আবার।

'শুয়ে থাকো। একটু বিশ্রাম করো, ভয় নেই।'

মুখ তুলে মাথার কাছে নিনাকে দেখতে পেল সে। খশখশে গলায় বলল, 'আমি তোমার রূমে কি করে এলাম?' বলেই 'উফ্‌ফ্‌!' করে কাতরে উঠল। ডান হাত আপনাআপনি মাথার দিকে উঠে গেল। কথা বলতে গিয়ে ঝাঁকি লেগে ঘিলু নড়ে গেছে যেন, যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়তে চাইছে মাথা। ঘাড় টন টন করছে। পাঁজরে প্রচণ্ড ব্যথা। দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে থাকল সে চোখ বুজে। বিড়বিড় করে বলল, 'কেউ মেরেছে আমাকে!'

'হ্যাঁ,' বলল নিনা।

'কে!' শুয়োরের মত ঘোঁৎ করে উঠল সে।

ম্যানুয়েলের মুখে বাইরে কি ঘটেছে জানতে পেরে হাতের কাজ ফেলে তীরের মত ছুটে এসেছিল কার্লো। মনিবের নির্দেশে ম্যানুয়েলের কড়া নজর ছিল ডান কোয়েলের ওপর। তাকে টেবিল ছেড়ে উঠতে দেখেই গোপন কলিংবেল টিপে কিচেনকে সতর্ক করে রেখেছিল সে।

কার-পার্কে কি ঘটেছে দু'জনেই দেখেছে ওরা। মাসুদ রানার ওড়ার ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিতও হয়েছে। কোত্থেকে যে উড়ে এল লোকটা আল্লাই মালুম! ঘাড় ঘুরিয়ে কোর্টেজ যে আক্রমণকারীকে দেখবে, সে সুযোগটা পর্যন্ত দেয়নি। কার্লোর মতে তিনবার, ম্যানুয়েলের মতে দু'বার বিদ্যুৎবেগে হাত চালিয়েছে রানা, মারের চোটে কাটা কলাগাছের মত আছড়ে পড়েছে কোর্টেজ, বাবা কি মা, কাউকেই ডাকার

'যা বলছি তাই করো!' কঠিন গলায় নির্দেশ দিল ডিটেকটিভ। ডান হাত সামনে বাড়াল। 'দাও!'

'কিন্তু...'

'শাডাপ্! বের করো গান!'

হতাশ ভঙ্গিতে ডানে-বাঁয়ে তাকাল কোর্টেজ, যখন বুঝল কেউ দেখছে না ওদের, অমনি বিদ্যুৎ খেলে গেল তার দেহে, একটানে অস্ত্র বের করে খেঁকিয়ে উঠল, 'আয়, ঠোলার বাচ্চা! নিয়ে যা!'

সভয়ে আঁতকে উঠল ডান কোয়েল। দেখামাত্র বুঝেছে ব্যাটার হাতের ওটা সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ, ওয়ালথার অটোম্যাটিক, কিন্তু কোন কাজে এল না তার সে বোঝা। দ্রুত এগোল ফের্নান্দো কোর্টেজ, অস্ত্র ঘুরিয়ে বাঁট দিয়ে দড়াম করে মারল ডিটেকটিভের মাথার তালুতে। ওটা আছড়ে পড়ার মুহূর্তের দশ ভাগের এক ভাগ সময় আগে কোয়েলের চোখ পড়ল মাসুদ রানার ওপর।

নিঃশব্দে শিকারী বাঘের মত কোর্টেজের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখল সে ওকে। শুধুই দেখল, কোর্টেজের গোঙানি কানে গেল না।

খবর শুনে শক্ত হয়ে গেল ক্যারল। বোকার মত ম্যানুয়েলের দিকে তাকিয়ে থাকল। ভেতরে অসহ্য রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। 'মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, মিসেস কোয়েল,' চাপা গলায় বলল লোকটা। 'তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই, গরমে এমন হতেই পারে। প্রায়ই ঘটে এমনটা। একটু রেস্ট পেলেই ঠিক হয়ে যাবেন উনি, কোন ভয় নেই।'

'ও কোথায়?' লোকটার একটা কথাও কানে গেল না তার।

'গাড়িতে শুইয়ে দিয়েছি। কোন ভয় নেই, মিসেস কোয়েল। দেখবেন, সকালেই ঠিক হয়ে যাবেন আপনার স্বামী। চলুন, আমাদের লোক বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবে আপনাদের।'

মুখ আঁধার করে উঠে পড়ল ক্যারল, ম্যানুয়েলের পিছন পিছন এগোল। নিজের ওয়াইল্ডক্যাটের পিছনের সীটে দলা হয়ে পড়ে থাকতে দেখল স্বামীকে। বিতৃষ্ণায় চেহারা বদলে গেল তার। হুইস্কির তীব্র গন্ধে ভরে আছে গাড়ির ভেতরটা। রানাকে গাড়ির পাশে কার্লোর সাথে দেখতে পেল ক্যারল। চোখাচোখি হতে মৃদু হাসল ও। 'উঠুন, মিসেস কোয়েল। আমি আসছি আপনার পিছন পিছন।'

রওনা হয়ে গেল ক্যারল, রানা কার্লোর এস্টেট কার নিয়ে অনুসরণ করছে তাকে। চিন্তিত মনে ড্রাইভ করছে মেয়েটি। মদ একটু বেশি খায় ঠিকই তার স্বামী, কিন্তু তাই বলে এমন অবস্থা তো কোনদিন হয়নি! স্ত্রীকে নিয়ে ডিনার খেতে এসে এমন এক কাজ করবে কোয়েল, ভাবাই যায় না।

বাসায় পৌঁছে অফিসারকে কাঁধে করে গেস্ট রুমে পৌঁছে দিল রানা। 'কোন দুশ্চিন্তা করবেন না, মিসেস কোয়েল। সকালে সেরে উঠবেন উনি।'

'দুশ্চিন্তা!' লিকার কেবিনেটের সামনে থেকে বলে উঠল ক্যারল, গ্লাসে জিন ঢালছে। 'ওর জন্যে? পাগল! হ্যাভ আ ড্রিঙ্ক, রানা...সরি, ক্যান আই...'

'নিশ্চই। কিন্তু আমাকে এখনই ফিরতে হবে, মিসেস কোয়েল। আজ

আমাদের কাজের চাপ খুব বেশি।'

হাসল ক্যারল। স্বামীর কারণে মন ভীষণ বিক্ষিপ্ত। তারও মন চাইছে কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে বসতে। 'একদিন না হয় আমার জন্যে কিছু সময় ব্যয় করলেই।'

এগোল রানা। সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল ঘরের। গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেল লিভিংরুম। কি ঘটতে যাচ্ছে ভেবে গলা শুকিয়ে গেল ক্যারলের, কোনমতে বলল, 'এদিকে, রানা!'

সিটিতে শুয়ে কখন লোকটা আসে, সেই অপেক্ষায় আছে ক্যারল। চোখ বন্ধ, গা কাঁপছে।

একটু পর বাইরে গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ উঠল।

চলে গেছে মাসুদ রানা।

এগারো

জ্ঞান ফিরতে ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকাতে লাগল ফের্নান্দো কোর্টেজ। কি ঘটেছিল বুঝতে একটু সময় লাগল, সঙ্গে সঙ্গে সজাগ, সতর্ক হয়ে উঠল দৃষ্টি, হিংস্র হায়েনার মত হয়ে উঠল চেহারা। ধড়মড় করে উঠে বসতে যাচ্ছিল, একটা নরম হাত বাধা দিল। ধরে শুইয়ে দিল আবার।

'শুয়ে থাকো। একটু বিশ্রাম করো, ভয় নেই।'

মুখ তুলে মাথার কাছে নিনাকে দেখতে পেল সে। খশখশে গলায় বলল, 'আমি তোমার রুমে কি করে এলাম?' বলেই 'উফ্ফ্!' করে কাতরে উঠল। ডান হাত আপনাআপনি মাথার দিকে উঠে গেল। কথা বলতে গিয়ে ঝাঁকি লেগে ঘিলু নড়ে গেছে যেন, যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়তে চাইছে মাথা। ঘাড় টন্ টন্ করছে। পাঁজরে প্রচণ্ড ব্যথা। দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে থাকল সে চোখ বুজে। বিড়বিড় করে বলল, 'কেউ মেরেছে আমাকে!'

'হ্যাঁ,' বলল নিনা।

'কে!' শুয়োরের মত ঘোঁৎ করে উঠল সে।

ম্যানুয়েলের মুখে বাইরে কি ঘটেছে জানতে পেরে হাতের কাজ ফেলে তীরের মত ছুটে এসেছিল কার্লো। মনিবের নির্দেশে ম্যানুয়েলের কড়া নজর ছিল ডান কোয়েলের ওপর। তাকে টেবিল ছেড়ে উঠতে দেখেই গোপন কলিংবেল টিপে কিচেনকে সতর্ক করে রেখেছিল সে।

কার-পার্কে কি ঘটেছে দু'জনেই দেখেছে ওরা। মাসুদ রানার ওড়ার ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিতও হয়েছে। কোত্থেকে যে উড়ে এল লোকটা আল্লাই মালুম! ঘাড় ঘুরিয়ে কোর্টেজ যে আক্রমণকারীকে দেখবে, সে সুযোগটা পর্যন্ত দেয়নি। কার্লোর মতে তিনবার, ম্যানুয়েলের মতে দু'বার বিদ্যুৎবেগে হাত চালিয়েছে রানা, মারের চোটে কাটা কলাগাছের মত আছড়ে পড়েছে কোর্টেজ, বাবা কি মা, কাউকেই ডাকার

সময় পায়নি। অনেকটা পড়ল আর মরল ধরনের কেস। ডিটেকটিভ ও কোর্টেজ, দু'জন একইসঙ্গে মাটি ছুঁয়েছে।

অফিসারকে পরীক্ষা করছিল রানা, কার্লোকে দেখে তাড়াতাড়ি এক বোতল হুইস্কি নিয়ে আসতে বলল। কেন? গায়ের ঝাল মেটাতে অজ্ঞান কোর্টেজের পাঁজরে কষে এক লাথি মেরে জবাব দিল রানা, 'কে এই শুয়োরের বাচ্চা? আরেকটু হলে তো মেরেই ফেলেছিল অফিসারকে! কি দশা হত তখন তোমার ব্যবসার? এমনিতেই তোমার পিছু লেগে আছে এই লোক। জলদি যাও, হুইস্কি এনে অফিসারের মুখে গলায় ঢেলে দাও।'

কোর্টেজকে মেরেছে বলে ওর ওপর রেগে ছিল কার্লো, কিন্তু যখন রানা বুঝিয়ে বলল, চেপে গেল। সত্যি তো, হারামজাদা আরেকটু হলে নির্ঘাত ডোবাত ওকে।

নিনা জানে সবই, কিন্তু কোর্টেজকে তা এখনই বলা বারণ আছে। তাই বলল, 'কেউ দেখতে পায়নি। অফিসারের পাশে তোমাকেও অজ্ঞান পড়ে থাকতে দেখেছি আমরা।'

শাওয়ার-শেভ সেরে পুরো তৈরি হয়ে নিল মাসুদ রানা। পাঁচটা বাজে তখন। বাইরে আলো ফুটেছে একটু একটু। আলো নিভিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও। কাঁধে স্রেফ একটা বীচ ব্যাগ। বেদিঙ ট্রাঙ্ক, তোয়ালে, সিগারেট ইত্যাদি আছে।

সামনেই অন্ধকারে রিকিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। চোখমুখ ফোলা। মনে হয় সারারাত ঘুমায়নি। 'চললেন?' বলল সে।

'হ্যাঁ,' মুচকে হাসল ও। 'সময় হয়ে গেছে।'

'কখন ফিরবেন, চ্যাম্প?'

ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হলো রানার। ভয়ে অস্থির। কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল। 'আশা করি বেশি দেরি হবে না।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল রিকি।

বেরিয়ে পড়ল রানা। বাঁধানো পথ ধরে হেঁটে মূল রেস্ট ভবনের পাশ দিয়ে বীচে চলে এল। দ্রুত পা চালাল জেটির দিকে। বোটের সামনের ডেকে অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছিল নিনা, ওকে দেখে ব্রেক কষল। হাত নাড়ল। ব্যস্ত হাতে বাঁধন খুলে দিল বোটের। রানা বোটে পা রাখতে না রাখতে এঞ্জিন স্টার্ট দিল সে।

চাপা হুঙ্কার ছেড়ে সাড়া দিল একজোড়া জনসন অ্যান্ড জনসন। বীচ ব্যাগ রেখে বোটটা দেখল রানা। চব্বিশ ফুট লম্বা এক বিলাসতরী—ককপিটের পিছনে বড় এক কেবিন। যাত্রীদের জন্যে চারটা ছোট ছোট খোপ আছে ওটায়, সবগুলোর আলাদা দরজা। দরজার ওপরের অংশে গোল কাঁচের জানালা, ভেতর থেকে পর্দা টানা সবগুলোর।

চাপা গুঞ্জন ছেড়ে জেটি থেকে সরে এল বোট, বাঁধের খোলা মুখের দিকে রওনা হলো নাক উঁচু করে। খোলা সাগরে পড়তেই গতি বাড়িয়ে দিল নিনা, ঢেউয়ের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে ছুটল গভীর সাগরের দিকে। রানাকে ককপিটে ঢুকতে দেখে হাসল। লাল বিকিনি পরে আছে মেয়েটি।

'কফি খাবে, রানা?'

'অবশ্যই!' পাল্টা হাসি দিল ও।

পায়ের কাছে বড় এক ঝুড়ি দেখাল নিনা। 'এরমধ্যে নাস্তাও আছে, চাইলে খেয়ে নিতে পারো।'

'কতক্ষণ লাগবে আমাদের জায়গামত পৌঁছতে?'

'তা ঘণ্টা দেড়েক,' ড্যাশবোর্ডের ইলেক্ট্রোনিক ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিল সে।

'তাহলে এখন থাক,' বলল রানা। 'ওখানে গিয়ে একসাথেই খাব।'

'আচ্ছা,' খুশি হওয়ার ভান করল মেয়েটি। 'কফি খাও তাহলে.' ইঙ্গিতে ড্যাশবোর্ডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বড় এক থার্মোস দেখাল। 'হেলপ ইওরসেলফ।'

গরম কফিতে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। নিনাকেও একটা দিল। কয়েক মিনিট নীরবে বোট চালাল মেয়েটি, চোখ সামনে স্থির। 'শেলডন তোমার খুব পছন্দ হবে, রানা। দারুণ জায়গা।'

'শেলডন? কোন দ্বীপ নাকি?'

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল সে। 'তুমি একটা বুদ্ধু! সাগরের মধ্যে দ্বীপ ছাড়া আর কি থাকতে পারে?'

রানাও হাসল মুখ টিপে। চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, যে কারণেই হোক, মনের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারছে না নিনা। চেহারায়, ভাবে-ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছে মনের ভাব। এত খুশি কেন? কি আছে শেলডনে, গুপ্তধন? ভাল সাঁতারুর কি প্রয়োজন পড়েছিল এদের?

'দুটো দিন যে কী অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে কেটেছে আমার, কি বলব!' এক হাত দিয়ে ওর হাত চেপে ধরল নিনা। 'বিশ্বাস করো, দু'রাতের একরাতও ঘুমাইনি।'

'কেন?' বোকার চোখে তাকাল রানা।

হতাশ হয়েছে যেন, এমন ভঙ্গি করল ও। 'তোমরা পুরুষগুলো যে কী না! এই সোজা কথাটাও বোঝো না? কখন তোমাকে শেলডনে একান্তে পাব, সেই চিন্তায়, আবার কেন? শুধু তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না ওখানে, কারও নাক গলাবার সুযোগ থাকবে না আমাদের··· উফ! অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। মনে হয়েছে রোববার বুঝি কোনদিন আসবে না।'

'আমারও,' বলে ওর আপাদমস্তক চোখ বোলাল ও। অভিনয়টা আরও নিখুঁত করার জন্যে ছোট একটা ঢোক গিলল। কিসের ছায়া খেলে গেল ওর চোখে? টিট্‌কিরির?

'সত্যি!'

মুচকে হাসল রানা। 'শেলডনে গিয়ে বলব।' আরেকবার ওর প্রায় নগ্ন দেহের ওপর নির্লজ্জ দৃষ্টি বুলিয়ে উঠে পড়ল ও। সঙ্গে সঙ্গে নিনার চাউনি সতর্ক, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'বোটটা ঘুরে দেখতে,' বলল ও। 'দারুণ বোট!'

'হ্যাঁ,' এমনভাবে শব্দটা ও উচ্চারণ করল, মাধুর্য, আবেগ, কিছুরই আভাস পর্যন্ত পাওয়া গেল না তাতে।

খেয়াল না করার ভান করে ককপিট থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা। পিছনে

ততক্ষণে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে পাম বীচ, নীলের মধ্যে ছোট্ট এক বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। ধীরপায়ে পিছনদিকে এগোল ও, কেবিনের বন্ধ দরজার ওপর চোখ বোলাল। প্রত্যেকটার পোর্টহোলের পর্দা টানা ভেতর থেকে। হাতল ধরে ঘোরাল ও, তালামারা—সবগুলো। চোখ কুঁচকে উঠল রানার। চিন্তিত। আনমনে কিছুক্ষণ দরজাগুলোর দিকে চেয়ে থাকল। তারপর ফিরে এল।

'কেবিন সব বন্ধ দেখলাম!' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল ও।

'হ্যাঁ! বাবা সব সময় লক্ করে রাখে।'

'কেন? কি আছে ভেতরে?'

মাথা দোলাল সে। 'থাকে না কিছু, এমনিই সব সময় তালা মেরে রাখে। পুরনো অভ্যেস।'

'আচ্ছা।'

শ্রাগ করল নিনা। 'আমার কেবিন প্রয়োজন হয় না, ও নিয়ে তাই মাথাও ঘামাই না কখনও।'

ওর চাউনিতে হঠাৎ ফুটে ওঠা কাঠিন্য চোখ এড়াল না রানার। মেয়েটির পাশে বসে পড়ল। এক হাতে কোমর পেঁচিয়ে ধরে গালে আলতো চুমু খেলো। 'শেলডন কেমন জায়গা?'

মুখের পেশী শিথিল হলো মেয়েটির। 'জায়গা হিসেবে তেমন নয়, তবে আসল হলো ওখানকার নির্জনতা, খুব ভাল লাগে আমার। পাখি ছাড়া কিছু নেই। হাজার হাজার পাখি। অদ্ভুত শান্ত পরিবেশ। কোলাহল ছেড়ে ওখানে গেলে মনটা অন্যরকম হয়ে যায়।'

'প্রায়ই যাও নাকি তুমি?' বলল রানা।

'মাঝেমধ্যে। মন বেশি খারাপ লাগলে আর কি!'

সামনে চোখ রেখে আনমনে বলল ও, 'শেলডন···নামটা মনে হয় আগেও শুনেছি আমি।' টের পেল, হাতের মধ্যে নিনার দেহটা আড়ষ্ট হয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে।

'কোথায়?' অজান্তেই হয়তো গলা কর্কশ হয়ে উঠল তার।

'ঠিক মনে নেই। বোধহয় ট্যুরিস্ট গাইডে···'

পেশীতে ঢিল পড়ল। 'তা হতে পারে,' বলে হাসল একটু। 'গাইডে আছে ওটার নাম। আমাদের ওখানেই আছে।'

'তাই হবে। ওখানেই দেখেছি বোধহয়।' একটু বিরতি। 'কিন্তু ও দ্বীপে তো কিছু নেই বললে, তাহলে গাইডে নাম কেন? ট্যুরিস্টরা যায় ওখানে?'

'আমি দেখিনি কখনও।'

'কফি খাবে?' বলল রানা।

'শিওর! থ্যাঙ্কস।'

থার্মোসের জোড়া ঢাকনার একটায় কফি ঢেলে মেয়েটিকে দিল রানা, অন্যটায় নিজে চুমুক দিল। 'ওখানে অদ্ভুত একটা জিনিস আছে,' পর পর কয়েকটা চুমুক দিয়ে বলল নিনা। 'ভারি অদ্ভুত!'

'কি জিনিস?'

'একটা ফানেল।'

এতক্ষণে লাইনে এসেছ তাহলে! ভাবল ও। 'ফানেল? সেটা কি?'

'চওড়া মুখের বড় এক গুহা, ভেতরে বেশ লম্বা টানেল। ক্রমে সরু হয়ে ঢুকে গেছে ওটা। টানেল ধরে কিছুদূর গেলে আরেকটা গুহা পড়ে, ওটার দেয়াল ফসফরেসেন্ট। একদম আলো করে রাখে গুহার ভেতরটা।'

'আচ্ছা!' আগ্রহী হয়ে উঠল রানা। 'ঢোকা যায় তাহলে?'

'তা যায়, তবে কাজটা একটু কঠিন। সবাই পারে না,' বঙ্কিম কটাক্ষ হানল নিনা। 'কারণ ঢোকার মুখের টানেলে স্রোত একটু বেশি, জোরাল আই মীন। স্রোত ঠেলে ঢুকতে একটু কষ্ট হয়।'

বুঝলাম! 'ভেতরের গুহা কত ভেতরে?'

'ষাট-সত্তর গজ সম্ভবত।' খানিক বিরতি। 'পুরোটা ডুব সাঁতার দিয়ে যেতে হয়।'

'তাই?'

'প্রতি তিন মাস পর পর কয়েক মিনিটের জন্যে গুহামুখের পানি সবচে' নিচু পর্যায়ে নেমে যায়, তখন এই বোট বা এরচে' একটু বড় বোটও খিলানের মত মুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। অবশ্য পনেরো কি বিশ মিনিটের বেশি থাকার উপায় নেই। পানি বেড়ে গেলে বের হওয়ার উপায় থাকে না।'

'তিন মাসের জন্যে আটকে যেতে হবে?' বলল রানা।

'হ্যাঁ, পুরো তিন মাস। ফের যখন পানি সবচে' নিচু পর্যায়ে নামবে, তখন বের হওয়ার সুযোগ জুটবে।'

একটু ভাবল রানা। 'সাঁতরে ঢুকলে অসুবিধে নেই?'

'না। সাঁতরে বারো মাসই আসা-যাওয়া করা যায়। একটু কষ্ট হয় আর কি!' বলল নিনা। 'যেমন-তেমন সাঁতারু পারে না।'

'ধূর!' বলল ও। 'এই সামান্য পথ যেতে আবার কষ্ট কিসের? এ তো পানির মত সোজা!'

'আমি জানতাম,' বিজয়ীর হাসি ফুটল নিনার মুখে। 'এ কাজ কঠিন হতে পারে না তোমার জন্যে।'

সিগারেট ধরাল রানা। একটু একটু উত্তেজিত। জানে রহস্যের সমাধানে পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই। গার্সিয়াকে খুন করার আসল কারণ এবার জানা যাবে। 'পানি কমবে কবে? বোট নিয়ে কবে ঢোকা যাবে ভেতরে, জানো তুমি?'

'জানি। আগামী সাতাশ তারিখ, সন্ধের পর।'

'যাহ্!' বলল ও। 'সে তো আবার অসময় হয়ে গেল।'

মাথা ঝাঁকাল নিনা। 'হ্যাঁ। তাছাড়া তার এখনও সাত দিন বাকি। এত দেরি করতে মনও চাইছিল না, তাই আজই এসে পড়লাম।'

পাশ থেকে মেয়েটির হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'দেরি মানে? কিসের দেরি?'

'এখনই সব জানতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ?' শব্দ করে হাসল সে। 'চলোই না। ওখানে পৌঁছে বলব।'

'আগে কখনও ঢুকেছ তুমি ফানেলে?'
'হ্যাঁ, ঢুকেছি। দু'বার।'
'সাঁতরে?'
'ওরে বাবা!' চোখ বড় করে তাকাল নিনা। 'বলো কি, আমি ভেতরে যাব সাঁতরে? তবে তো হয়েছিল।'
'ও। বোট নিয়ে?'
'হুঁম!' চিন্তার ভান করল মেয়েটি। 'তবে আজ তোমার সাথে ঢুকব ঠিক করে এসেছি। তুমি যখন রয়েছ···'
আঁতকে উঠল রানা। 'বলো কি! আমি একা স্বচ্ছন্দে যেতে পারি, কিন্তু তোমাকে নিয়ে? অসম্ভব! অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যেতে প্যারে, দম বন্ধ হয়ে মরে যেতে পারো তুমি, তখন কি হবে?'
'আরে না! আমি তৈরি না হয়েই এসেছি নাকি?'
'মানে?'
'ট্যুরিস্টদের জন্যে স্টোরে কয়েকটা অ্যাকুয়ালাঙ আছে আমাদের, ওখান থেকে দুটো গোপনে নিয়ে এসেছি,' হাসিতে ষড়যন্ত্র ফুটল তার। 'কোমরের সাথে দড়ি দিয়ে আমাকে বেঁধে নেবে, আমিও সাঁতরাব তোমার সাথে।'
ওর চোখে প্রচণ্ড আগ্রহ দেখল রানা। 'সেটা কি ঠিক হবে?' চিন্তিত কণ্ঠে বলল। 'তাছাড়া ওখানে আছেটাই বা কি ঘোড়ার ডিম যে এত রিস্ক নিতে চাইছ তুমি?'
'নিয়ে চলোই না, দেখবে নিজের চোখে কি আছে। তোমাকে যদি তাক লাগিয়ে দিতে না পেরেছি, তো কি বলছি!'
কিছুক্ষণ চিন্তার ভান করল ও, যেন কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। 'কার্লো যদি কোন মতে টের পায় আমি তোমার সাথে এখানে এসেছি, ভীষণ রেগে যাবে। আমাকে হয়তো মেরেই ফেলবে।'
আচমকা ওর গলা জড়িয়ে ধরল মেয়েটি, আগ্রাসী চুমু খেলো লম্বা সময় ধরে। 'বাবা আমাদের পেলে তো!'
মনে মনে আস্ত এক ডিগবাজি দিয়ে উঠল ও। রাজ্যের বিস্ময় ফোটাল চেহারায়। 'তার মানে?'
'মানে? মানে হলো এখান থেকে অনেক দূরে কোথাও চলে যাব আমরা,' রানার মাথা নরম বুকে চেপে ধরল সে। 'তুমি আর আমি—অনেক, অ-নে-ক দূরে কোথাও,' ভাবাবেগে গলা কেঁপেই গেল নিনার। 'কেউ জানবে না। মনের মত করে সংসার পাতব আমরা, সেখানে শুধু তুমি আর আমি···'
'সত্যি?' মনে মনে হেসে খুন রানা। কিন্তু পোষাচ্ছে না, দূরে কোথাও ছুটে গিয়ে একচোট অট্টহাসি দিয়ে আসা গেলে শান্তি হত মনে।
'হুঁম!' উঠে সামনে নজর দিল সে। যেটার ওপর বসা ছিল ওরা, সেটা দেখিয়ে বলল, 'লকারের ঢাকনা তুলে ভেতর থেকে অ্যাকুয়ালাঙ দুটো বের করো, রানা। পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই, চেক করা দরকার ওগুলো।'
এই সামান্য সময়ের মধ্যে গলার স্বর সম্পূর্ণ বদলে গেছে মেয়েটির, কথাগুলো

বলল অনেকটা নির্দেশের সুরে। এইমাত্র আবেগে গলা কাঁপাচ্ছিল ভাবাই যায় না। বের করল রানা ওগুলো, পরীক্ষা করে দেখল ঠিকই আছে। খবরটা জানাল ও।

'লকারে খানিকটা নাইলন দড়ি আর কয়েকটা বেল্ট আছে, ওগুলোও বের করো।'

ঢাকনা তুলে দড়ি খুঁজতে লেগে গেল ও। সামনের দিকে নানান যন্ত্রপাতি আর লোহালক্কড়। আরও ঝুঁকে লকারের গভীরে হাতড়াতে লাগল। একটা কিছু বাধল হাতে, খড়মড় আওয়াজ উঠল। জিনিসটা সামনে টেনে আনল ও—একটা প্লাস্টিক ব্যাগ। মুখ খুলে ভেতরে উঁকি দিল।

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে হাত থেমে গেল। ঠোঁট গোল করে নিঃশব্দে শিস বাজাল রানা। একটা কালো ওপেন শার্ট, একটা সাদা স্কার্ফ এবং একটা গাঢ় হলুদ রঙের অ্যান্টি-ড্যাযল গগলস্ রয়েছে ওর মধ্যে। ব্যাগ জায়গামত রেখে খুঁজে আসল জিনিসগুলো বের করল ও।

'হলো তোমার?'

'হ্যাঁ।' সোজা হলো রানা। পাশ থেকে মেয়েটিকে দেখল। সে রাতের মাসটাঙের সেই রহস্যময় চালককে দেখতে পেল স্পষ্ট।

'কফি খাবে, রানা?'

জবাব দিল না ও। সামনের দিগন্তে একটা বিন্দু দেখে তাকিয়ে থাকল। ওটার দিকেই এগোচ্ছে বোট।

নিনা ঘুরে তাকাল। 'কি ভাবছ, রানা?'

'কিছু না। ওটাই শেলডন?' বিন্দুটা নির্দেশ করল ও।

'হ্যাঁ, ওটাই,' চেহারায় খুশির ঝিলিক ফুটল মেয়েটির।

আরও দশ মিনিট পর দ্বীপটা পুরোপুরি দৃষ্টিসীমার মধ্যে এল। ভলকানিক রক আসলে ওটা, দেখেই বুঝল রানা। ভীষণরকম এবড়োখেবড়ো, কর্কশ। সী লেভেলের অনেকখানি ওপরে মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রচুর সামুদ্রিক পাখি দেখা গেল দ্বীপে—গাল, করমোরান্ট, পেলিক্যান ইত্যাদি।

বিশ মিনিট পর শেলডনের পাথুরে দেয়ালের চওড়া এক ফাটল দিয়ে ভেতরে বোট ঢুকিয়ে দিল নিনা। তুলনায় বেশ সরু ওটা, তবে নিরাপদেই ঢুকল বোট ওর পাকা হাতের পরিচালনায়। খানিকটা এগোতে সামনে একটা হারবার মত দেখতে পেল রানা, তার ও মাথায় ছোট এক ল্যান্ডিং জেটি। দুদিকে পাহাড় সমান উঁচু দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এঞ্জিনের গুম গুম আওয়াজ। একটু একটু করে জেটির দিকে এগিয়ে চলল ওরা।

জেটির সাথে বাফার হিসেবে ঝোলানো পুরানো কিছু টায়ারের সাথে মৃদু বাম্প করে থেমে পড়ল বোট, এঞ্জিন অফ করে দিল নিনা। হঠাৎ করে অশুভ নীরবতা নেমে এল পরিবেশে। টো লাইন নিয়ে লাফ দিয়ে জেটিতে নামল রানা, বোট বেঁধে ফেলল। সাড়ে সাতটা বাজে তখন। মনের মধ্যে বোটের বন্ধ দরজার চিন্তা।

'খিদেয় পেট জ্বলছে,' বলল নিনা। 'এসো, আগে নাস্তা খেয়েনি, তারপর অন্য কাজ। ওপরে উঠতে হবে আগে।'

আধঘণ্টা পর, পাথরের গা বেয়ে ফাটলের একদিকের প্রায় চুড়োয় এসে দাঁড়াল

ওরা। আঙুল তুলে রানাকে একটা জায়গা দেখাল মেয়েটা। ওটাকেও একটা ফাটল বলেই মনে হলো ওর, অনেক সরু। ভেতর থেকে বেশ তোড়ে বের হচ্ছে পানি। তবে গুহাটুহা কিছু দেখা গেল না ওখানে।

'বুঝলাম না,' বলল ও। 'তুমি না বললে ওর মধ্যে দিয়ে বোট নিয়ে ঢোকা যায় ভেতরে?'

'এটা সেটা নয়। ফানেল দ্বীপের ওপাশে। এটা দিয়ে বের হব আমরা। চলো, দেখাচ্ছি।'

আবার এগোল দু'জনে। একেবারে চুড়োয় পৌঁছে থামল নিনা। নিচে তাকিয়ে একটা লেগুন ছাড়া কিছুই দেখল না রানা। তবে লেগুনের ও মাথার পানিতে সূর্যের আলো দেখে বোঝা যায় ওখানে ফাঁকা আছে খানিকটা জায়গা।

'ওটা হচ্ছে ফানেল,' বলল নিনা। 'এখন অবশ্য দেখা যাবে না। তিনমাস পরপর ওখানকার পানি প্রায় বিশ ফুটের মত নেমে যায়, তখন জেগে ওঠে ফানেল। ওই ফাঁক দিয়েই ঢুকব আমরা, বেরোব যেদিক দিয়ে এলাম সেদিক দিয়ে।'

প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেলা, ভাবল মাসুদ রানা, পানি ওদিক থেকেও বের হচ্ছে, এদিক থেকেও বের হচ্ছে। অথচ লেগুনে বা হারবারে সামান্যতম স্রোত আছে দেখে অন্তত মনে হয় না।

'ফানেল দিয়ে ঢুকে ষাট-সত্তর গজমত স্রোত ঠেলে এগোতে হবে আমাদের,' ব্যাখ্যা করল নিনা। 'তারপর হাতের বাঁয়ে পড়বে সেই ফসফরেসেন্ট গুহা।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল রানা। নিচের কোথাও থেকে ক্ষীণ একটা শব্দ কানে এসেছে, খুবই ক্ষীণ। স্নায়ু টান টান হয়ে আছে বলেই হয়তো শুনতে পেয়েছে ও। ফাটলের দুই দেয়ালে বাড়ি খেয়ে উঠে এসেছে শব্দটা—লোহার সাথে লোহা ঠুকে গেছে যেন, অনেকটা সেইরকম। চোখ কুঁচকে উঠল রানার। কিসের শব্দ হলো?

ওদিকে বোটের প্রথম কেবিনের ভেতর আধ হাত জিভ বের করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফের্নান্দো কোর্টেজ। দরজার বোল্ট আস্তে টেনে খুলতে ব্যর্থ হয়ে একটু জোরেই টেনে বসেছিল সে, লোহার বোল্ট ছুটে গিয়ে 'ঠং' করে আছড়ে পড়েছে লোহার সাপোর্টারের ওপর। আওয়াজটা একটু বেশিই হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পর সন্তর্পণে দরজা খুলল সে। হাতে একটা পয়েন্ট টুটু টার্গেট রাইফেল। মাথা, ঘাড় ও পাঁজর এখনও টনটন করছে তার ব্যথায়।

চোখ মেলল ডিটেকটিভ ডান কোয়েল। পায়ের কাছের পর্দা টানা জানালার দিকে ইতস্তত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঢুকছে। কোথায় আমি? ভাবল সে, ঘরটা চেনা চেনা লাগছে না? ওই পর্দা...! জোর এক ঝাঁকির সাথে বিষয়টা অনুধাবন করল কোয়েল, লাফ দিয়ে উঠে বসতে গিয়ে মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় জোরে গুঙিয়ে উঠল।

মাথা যেন ছিঁড়ে পড়ে যেতে চাইছে। দুই হাতে মাথা চেপে ধরে বসে থাকল সে চেহারা বিকৃত করে, ব্যথা না কমা পর্যন্ত মুখ তুলল না। তারপর আস্তে করে নামল বিছানা থেকে। ড্রেসিঙ টেবিলের ওপর রাখা ঘড়িটা দেখল—সাড়ে ছয়টা।

পরনের পাজামার ওপর চোখ পড়তে হতভম্ব হয়ে গেল। এটা এল কোত্থেকে? হালকা ধোঁয়ার মত একটু একটু করে স্মৃতি ফিরে আসতে শুরু করল তার।

রেস্টুরেন্ট···ডিনার···পার্কিঙ লট···মার্সিডিজ···সেই খুনীটা··· কি নাম? কোর্টেজ। তারপর? একটা সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ওয়ালথার···আর···কি যেন? ও হ্যাঁ, আরেক খুনী! মাসুদ রানা! চোখ কুঁচকে উঠল তার চিন্তার গভীরে ঢোকার চেষ্টা করতে গিয়ে। কোর্টেজ অস্ত্র বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর··· তারপর···তারপর মাসুদ রানা লোকটা···কোর্টেজের ওপর···দূর! তা হয় কি করে? দাঁড়াও দাঁড়াও, আরেকটু চিন্তা করতে দাও। ব্যাপারটা কেমন এলোমেলো লাগছে না?

ক্যারল গেল কোথায়? আমি গেস্ট রুমে কেন? অতীত সমস্যা ছেড়ে বর্তমান সমস্যা নিয়ে ভাবল সে. এলোমেলো পায়ে প্যাসেজ ধরে মেইন বেডরুমের দিকে এগোল। খোলা দরজায় ওকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল ক্যারল ভেতর থেকে। 'খবরদার! আমার কাছে আসবে না তুমি, অসভ্য মাতাল!'

থমকে দাঁড়াল কোয়েল। মাথার তালুর ফুলে থাকা জায়গাটায় আঙুল বোলাল। 'কি হয়েছিল? আমি বাসায় এলাম কি করে?'

'আরেকজনের কোলে করে!' খেঁকিয়ে উঠল মেয়েটি। 'মাতাল···'

'চোপ্!' প্রচণ্ড এক দাবড়ি লাগাল কোয়েল, সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল মাথার যন্ত্রণায়। সামলে নিয়ে বাঘের চোখে তাকাল। 'কি হয়েছিল কাল ভদ্র ভাষায় খুলে বলো!'

বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যারল। তার সাথে এভাবে ধমকের সুরে আগে কখনও কথা বলেনি সে। তার মানে মাতলামি এখনও যায়নি ওর!

'বলো. কি হয়েছিল কাল!' সম্পূর্ণ অপরিচিত গলায় বলল কোয়েল। 'মানুষের কোলে চড়ে বাসায় আসার মত মাতাল আমি হতে পারি, এই ধারণা কবে থেকে জন্মাল তোমার! এতবড় আহাম্মক কবে থেকে হলে তুমি!'

চোখ বড় করে তাকে দেখছে মেয়েটি। বিস্ময় বাঁধ মানছে না। একে অন্যায় করেছে, মানুষের সামনে তার মুখ হাসিয়েছে, তারওপর আবার ওর সাথে উল্টো মেজাজ দেখানো! নোংরা গাল দেয়া! এত জ্বালা সহ্য করার মেয়ে নয় সে। 'কি বললে তুমি আমাকে? আমি কি?'

'দেখো, মুখ খুলিয়ো না আমার! তাড়াতাড়ি বলো সব ঘটনা, নইলে দুনিয়ার যত নোংরা সম্বোধন আছে, সব এক এক করে তোমার নামের আগে জুড়ব আমি। হারি আপ!'

ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যারল আহাম্মক হয়ে। স্বামীর এই চেহারা তার সম্পূর্ণ অচেনা। এত ভয়ঙ্কর হতে পারে কোয়েলের চেহারা, স্বপ্নেও ভাবেনি সে। রাগে. দুঃখে কিছুক্ষণ কাঁদল, তারপর আরেকদিকে তাকিয়ে বলল সব।

'তুমি এখনও ভাবছ আমি ওরকম জঘন্য মাতাল···' রাগের চোটে কথাটা শেষ করতে পারল না কোয়েল।

'তো কি ভাবব, তুমি সেইন্ট কোয়েল? প্রার্থনা করতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে

গিয়েছিলে? সারা গা থেকে হুইস্কির গন্ধ বের হচ্ছিল তোমার, ওখানকার প্রত্যেকে জানে তুমি…'

'চোপ্, বেআক্কেলে মেয়েছেলে! ব্যাপারটা সাজানো, আমাকে ওখান থেকে সরানোর জন্যে ঘটানো হয়েছে। তিন বছর পুলিসের সাথে সংসার করেও এই সহজ একটা ব্যাপার বোঝার মত বুদ্ধি তোমার হলো না? এতই গাধী তুমি?'

স্ত্রীর প্রতিক্রিয়ার জন্যে অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এল কোয়েল। ঘটনাটাকে চীফ আর সার্জেন্ট কি ভাবে নেবে ভাবতে গিয়ে মনটা তেতো হয়ে গেল। লিভিং রূমে এসে হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করল সে। আধঘণ্টা পর তৈরি হয়ে নিয়ে হাইওয়ে ধরে তুমুল গতিতে গাড়ি ছোটাল, দশ মিনিটে পৌঁছে গেল অফিসে। মন ভার। ফোন করেই বুঝেছে কপালে আজ দুর্ভোগ আছে, প্রমোশনের আশা-ভরসা তো গেছেই। চীফ সতর্ক করে দিয়েছিল কার্লোর ওখানে যেন কোন নতুন ঝামেলা না বাধিয়ে বসে সে। অথচ…

কিন্তু অফিসে পা রাখামাত্র ভুল ভাঙল কোয়েলের। সার্জেন্ট কেন হ্যারিস উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল। 'তুমি ঠিক আছ, কোয়েল? আঘাত মারাত্মক কিছু নয় তো?'

'না, ঠিক আছি আমি।'

'চলো, চীফ বসে আছে ঘটনা শোনার জন্যে।'

আধঘণ্টার মধ্যে পরিবেশ বদলে গেল হেডকোয়ার্টার্সের। 'তোমার কথায় বোঝা যাচ্ছে মাসুদ রানা লোকটা তোমাকে সাহায্যই করেছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ক্যাপ্টেন অ্যাশক্রফট। 'সময়মত ও এসে না পড়লে কোর্টেজ হয়তো মেরেই ফেলত তোমাকে, কি বলো?'

'বুঝতে পারছি না কি বলব, চীফ। ওপর থেকে দেখলে তাই মনে হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু কেন লোকটা আমাকে বাঁচাবে? আমি মরলে তো ওরই লাভ হত।'

'হয়তো। ভেরি স্ট্রেঞ্জ!'

'রাইট, চীফ। এসবের মধ্যে লোকটার উপস্থিতি অদ্ভুতরকম গোলমেলে।'

'ওর পরিচয়টাও,' একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল ক্যাপ্টেন। অন্যমনস্ক।

'মানে?' চোখ কোঁচকাল কোয়েল।

সার্জেন্টের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল চীফ। 'দেখাও ওকে।'

একটা ফ্যাক্স মেসেজ ডিটেকটিভের হাতে তুলে দিল সে। 'পড়ো।'

পড়ল কোয়েল। আহাম্মক হয়ে গেল। 'সে কি!' আবার পড়ল সে। মেসেজটা খুবই সংক্ষিপ্ত, যা বলা হয়েছে ওতে, তার সারমর্ম এরকম: '৯২ সালের ইওরোপীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় মাসুদ রানা নামে কোন প্রতিযোগী ছিলই না। বার্তার শেষে নামটা কনফার্ম করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে 'ব্লাস্ট!' আপনমনে বলল কোয়েল। 'তাহলে কে মাসুদ রানা?'

'ওটাই তার নাম কি না তাই বা কে জানে?' বলল সার্জেন্ট। 'এতবড় এক গুল যখন মারতে পেরেছে, নামের ব্যাপারেও মেরে থাকতে পারে। হয়তো আর কারও নামে নিজেকে চালাচ্ছে ও পাম বীচে। প্রথমেই ওর আইডি চেক করা উচিত ছিল তোমার।'

'তাহলে!' নাকের গোড়া চুলকাল সে। কাগজটা দোলাল। 'আরেকটা মেসেজ পাঠিয়ে মাসুদ রানা কে, জানার চেষ্টা করলে...'

'কোথায় পাঠাবে?' প্রশ্ন করল সার্জেন্ট।

'কেন, ওয়াশিংটনে?'

'ওদের কাছে মাসুদ রানার রেকর্ড আছে জানছ কি করে তুমি?' বলল পুলিস চীফ। 'মানুষটা কে, কোন্ দেশী নাগরিক, কিছু জানা নেই আমাদের। আন্দাজে মেসেজ একটা পাঠালেই হলো?'

'তাহলে লোকটাকে এখানে ধরে আনলেই তো পারি আমরা, চীফ!' আশান্বিত চোখে তাকাল কোয়েল। 'ওর মুখ থেকেই জানা যাবে সব, কি বলেন?'

'অপেক্ষা করো। সার্জেন্টও যাবে তোমার সঙ্গে। সার্জেন্ট, মাসুদ রানা আর কোর্টেজের নামে ওয়ারেন্ট রেডি করো। হেসকে বলো, মিস্টার জোনসের সাথে তার মার্সিডিজ আর শোফার কোর্টেজের ব্যাপারে কথা বলতে।' কোয়েলের দিকে ফিরল চীফ। 'কার্লোর নামেও ওয়ারেন্ট নিয়ে যাও। যদি কাজে লাগে, লাগাবে।'

কি যেন ভাবল কোয়েল। 'চীফ, ফ্যাক্স মেসেজটা আমাকে দিন। ওখান থেকে এসে ফেরত দেব।'

'কেন?'

'একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়, সেটাও ফিরে এসে জানাব।'

'ঠিক আছে, নিয়ে যাও।'

বারো

'এখনও ভেবে দেখো থেকে যাবে কি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল মাসুদ রানা। 'আমার মনে হয় তোমার ঝুঁকি নেয়াই উচিত হবে না।' মেয়েটিকে দমাতে নয়, বরং উৎসাহিত করতে চাইছে ও। জানা কথা, এখন ওর পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

'ভেবেছি!' বিরক্তিতে প্রায় খ্যাঁকানি মেরে উঠল নিনা। ওকে নিয়ে অন্ধ প্রেমিকের এত মাথাব্যথা ভাল ঠেকছে না বোধহয়। অধৈর্য কণ্ঠে আবার বলল, 'বলেছি তো ভয়ের কিছু নেই। কিছু হবে না আমার। শুধু শুধু ভাবছ তুমি।'

'বেশ, চলো তাহলে।' রানা নির্বিকার।

কাপড় ছেড়ে বেদিঙ ট্রাঙ্ক পরল ও। নিনা বিকিনি পরেই এসেছে। এরপর কয়েক মিনিট ব্যয় হলো অ্যাকুয়ালাঙ পরে তৈরি হতে। মেয়েটার ইকুইপমেন্ট সেট হয়েছে কি না দেখে নিয়ে নিজেরটা চেক করল রানা। হয়েছে। একটা করে বেল্ট পরে নিল ওরা এবার, বেশ টাইট করে। নাইলনের কর্ড দিয়ে নিজেদের জুড়ে নিল। রানা বুঝে নিয়েছে, শেষ পর্যন্ত ওকেই টেনে নিয়ে যেতে হবে নিনাকে।

স্রোত কতখানি জোরাল, এভাবে ভেতরের গুহায় পৌঁছানো যাবে কি না, সে প্রশ্ন নিয়ে এখন মাথা ঘামাতে রাজি নয় রানা। জানে, যে করে হোক ওকে

পৌঁছতেই হবে ওখানে। পৌঁছতেই হবে। কেন গার্সিয়ার লাশ ঘাড়ে তুলে দিয়ে ওদের ফাঁসাতে চেয়েছিল নিনা, জানতে হবে।

'কখন উঠতে হবে বুঝব কি করে?' প্রশ্ন করল ও।

'সময় হলে মাথার ওপর আলো দেখতে পাবে,' ফেস মাস্ক বসিয়ে অক্সিজেনের পাইপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেয়েটি।

লেগুনের কয়েক ফুট ওপরের এক রক প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল ওরা পাশাপাশি, দুই কোমরে বাঁধা দড়ির মাঝখানটা ঝুলে থাকল 'V'র মত।

'রেডি?' বলল রানা।

এতক্ষণে হাসি ফুটল মেয়েটার মুখে—পিচ্চি হাসি। মাথা ঝাঁকাল।

পাইপ কামড়ে ধরে সঙ্কেত দিল ও, দু'জন একসাথে ডাইভ দিল লেগুনে। পুরো ব্যাপারটা আড়াল থেকে দেখছিল কোর্টেজ, নোংরা হাসি ফুটল এবার তার মুখে। ধীরপায়ে এগিয়ে চলল সে ওরা যেখানে ছিল এতক্ষণ, সেদিকে। প্রতীক্ষার নতুন পালা শুরু হলো তার।

প্রথম দেখা ফাটলের কাছে পৌঁছে গেল রানা। টের পেল শুধু জোরাল নয়, বেশ জোরাল স্রোত। হতাশ না হয়ে এগিয়ে চলল ও, যথাসম্ভব আস্তে, পেশীর ওপর বেশি চাপ না দিয়ে। পয়লা চোটেই অতিরিক্ত শক্তি খরচ করে ফেললে জায়গামত পৌঁছানো সম্ভব হবে না কোনদিন। পিছনদিক তাকাল না ও। কোমরের রশিতে টান নেই, তার মানে নিনাও গতির সাথে তাল রেখে আসছে। কাজেই চিন্তা নেই।

ফাটলের মুখ যত এগিয়ে আসছে, স্রোতও ততই বাড়ছে। কাঁধে টোকা পড়তে পিছনে তাকাল ও, দেখল হাত ইশারায় ডুব দিতে বলছে নিনা। ডুব দিল রানা, প্রায় সাথে সাথে চোখ পড়ল বড় এক ফাটলের ওপর, সারফেসের বেশ নিচে। প্রথমে যেটা দেখিয়েছে নিনা, সেই ফাটলটাই। পানির নিচের মুখটা অনেক প্রশস্ত ওপরের মুখ থেকে।

স্রোত আরও বেড়ে গেছে টের পেয়ে সতর্ক হলো ও, ছোট ছোট স্ট্রোক কাজে আসবে না বুঝতে পেরে কিছুটা দীর্ঘ, প্রলম্বিত করল। তারপর আরও, আরও। হাত পায়ের কাজ দ্রুততর করল, কিন্তু গতি তেমন বেড়েছে বলে মনে হলো না। তবে এগোচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই, কারণ পানির তাপমাত্রা ক্রমেই কমছে। বেশ ঠাণ্ডা এখন পানি।

হঠাৎ সন্দেহ জাগল রানার নিনা আছে কি না ভেবে। দড়ি এখনও ঢিলা, তার সাঁতারের যে গতি দেখেছে ও সেদিন, তাতে এতক্ষণে টান পড়া উচিত ছিল। হাত দিয়ে দড়ির টান পরীক্ষা করা যাবে না, এক হাত থেমে গেলে স্রোত সামাল দেয়া যাবে না, তাই ঘুরে তাকাল ও। আছে মেয়েটা, তবে খারাপ অবস্থা। এখনই প্রাণপণ সংগ্রাম করছে দাঁত মুখ খিঁচে, তার মানে হার মানতে বেশি দেরি নেই ওর। তাকাতে গিয়ে যে সামান্য এনার্জি ব্যয় হলো, তাতেই স্রোত পেয়ে বসল রানাকে, এক ধাক্কায় প্রায় চার ফুট পিছিয়ে দিল। প্রায় নিনার পাশে এনে ফেলল।

এরমধ্যেও কাঁচের ওপাশে মেয়েটির দু'চোখে মুহূর্তের জন্যে তীব্র হতাশা ফুটতে দেখল রানা। হয়তো ভেবেছে হাল ছেড়ে দিয়েছে ও।

ঘুরে সামনে নজর দিল রানা। বুঝে ফেলেছে টানেল পেরোতে হলে এখন

থেকেই সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। তাই করল ও। পানি কাটতে শুরু করল মরিয়া হয়ে। এগিয়ে চলল একটু একটু করে। বাহু, কাঁধ আর উরুতে পানির চাপ ক্রমে বাড়ছে এখন, একই সাথে দড়িতেও টান পড়ছে। তার মানে নিনার দম ফুরিয়ে যেতে আর বেশি দেরি নেই।

ওকে টেনে নিয়ে চলল রানা, দেহের পুরো শক্তি ব্যয় করছে প্রতিটি স্ট্রোকের পিছনে। বুকের খাঁচায় হাতুড়ির মত ঘা মারছে হৃৎপিণ্ড, কানের কাছে দপ্ দপ্ করছে রক্তবাহী শিরা। সময় যত যাচ্ছে, রানার গতিও তত পড়ে আসছে, পেশীর চাপ শিথিল হয়ে পড়ছে। পিছনে যদি নিনার টান না থাকত, অনেক আগেই জায়গামত পৌঁছে যেতে পারত, জানে রানা।

দড়ি টান্ টান্ হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে মেয়েটা। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আছে এখন রানা, কিচ্ছু দেখা যায় না। অসাধারণ মানসিক শক্তি ঠেলে নিয়ে চলেছে ওকে, অটোম্যাটিক রিফ্লেক্স হাত-পা চালনা করছে, হার মানতে রাজি নয় মাসুদ রানা। ওকে জানতেই হবে ভেতরের ঘটনা, এবং সে জন্যে সামনে এগোনো ছাড়া উপায় নেই।

হারামজাদী মিথ্যে বলেছে ওকে, ভাবছে রানা, ষাট-সত্তর গজের দ্বিগুণেরও বড় হবে এ টানেল। হতেই হবে। জরুরী মুহূর্তের জন্যে সঞ্চিত শেষ শক্তিটুকু কাজে লাগাল ও এবার, রোবটের মত অনুসরণ করতে থাকল মস্তিষ্কের নির্দেশ। একেক সময় ইচ্ছে করছে হাল ছেড়ে দিতে, স্রোতে ভেসে যেতে। কিন্তু ওই পর্যন্তই, যুদ্ধ জয়ের চিন্তা ইচ্ছেটাকে মস্তিষ্কের কম্যান্ড সেলে ঢুকতে দিতে রাজি নয়, পথ আগলে বসে আছে। সামনেই পানি আলো হয়ে আছে দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে এগোল রানা, এবং চাপ কমতে কমতে আচমকা একেবারে নেই হয়ে গেল স্রোত।

সারফেসের দিকে ছুটল ও, বুকের ভেতর চাপা উল্লাস বোধ করছে এই অবস্থায়ও। ভুশ করে মাথা তুলল। চোখ বুজে হাঁ করে হাঁপাচ্ছে চিত হয়ে, পৃথিবীর সমস্ত অক্সিজেন টেনে নিতে চাইছে ওর নির্যাতিত ফুসফুস। ফুট দুয়েক দূরে ভাসছে নিনা, রানার থেকে কিছুটা ভাল অবস্থায় আছে সে। হাঁপাচ্ছে ঠিকই, তবে একই সাথে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেও।

মাথার ওপর মৃদু নীল আলো দেখতে পেল রানা। গগলস আর মাউথপীস খুলে ফেলল। এখনও ঝড়ের বেগে দম নিচ্ছে।

'ভেবেছিলাম বুঝি ব্যর্থ হতে যাচ্ছি আমরা,' কোনমতে বলল নিনা। 'পৌঁছতে পারব না।'

'আমিও,' মাথা ঝাড়া দিয়ে চোখের পানি সরাল রানা। তখনই চোখে পড়ল জিনিসটা। ওর ডানে, শ'খানেক গজ দূরে স্থির হয়ে ভেসে আছে একটা বোট। লম্বায় চল্লিশ ফুটমত হবে, ধপধপে সাদা। লাল রঙের ককপিট। ওটার নাকের কাছে বড় করে লেখা আছে: গ্লোরিয়া টু, ভেরো বীচ।

'এটা এখানে কি করে এল?' চেহারায় অকৃত্রিম বিস্ময় ফোটাবার চেষ্টা করল ও। 'আশ্চর্য তো!' মেয়েটি কিছু বলছে না দেখে ওর দিকে ঘুরল। 'তুমি জানতে?'

মুখে জবাব না দিয়ে মাথা দোলাল সে। হ্যাঁ কি না বোঝা গেল না।

কোমরের বাঁধন খুলে দিল রানা, ধীর বেগে এগোল বোটটার দিকে। কড়া নজর

ঝোলাচ্ছে ওটার নাক থেকে লেজ পর্যন্ত। প্রাণের কোন সাড়া নেই। খালি বোট! ঘুরে আরেক পাশে চলে এল ও, স্থির হয়ে গেল। এদিকটা গুলিতে প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে আছে। পোর্টহোল আস্ত নেই একটাও, সব চুরমার হয়ে গেছে। কেবিনের দেয়ালে কয়েক সারি বুলেটের গর্ত, দেখে মনে হয় সেলাইয়ের ফোঁড়। গানেলের অবস্থাও এক।

স্টার্নে একটা দড়ি ঝুলছে দেখে এগোল রানা। ওটা ধরে উঠে পড়ল বোটে। নিনাকেও টেনে তুলল। কথা নেই কারও মুখে। ডেকের এখানে-ওখানে কালচে ছোপ ছোপ দাগ দেখল রানা, ওগুলো এড়িয়ে ককপিটে এল। একই রকমের ছোপ এখানেও—সবখানে।

'রক্ত!' মৃদু গলায় বলল রানা।

'তাই তো মনে হয়,' নিনার কণ্ঠ নির্বিকার।

'আমি কেবিনের ভেতরে কি অবস্থা দেখে আসি।'

'আমিও যাব তোমার সাথে।'

নতুন দৃষ্টিতে ওকে দেখল রানা। 'তোমার যাওয়া কি ঠিক হবে? ভেতরে হয়তো রক্তারক্তি কাণ্ড...'

অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। 'রক্ত আমি ভয় পাই না, রানা।' একটু বিরতি। 'যদি তাই বোঝাতে চেয়ে থাকো তুমি।'

ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে, কেবিনে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল, পিছন থেকে শক্ত মুঠোয় ওর বাহু চেপে ধরল রানা। 'কিন্তু তোমার যে কিছু কথা ছিল, নিনা।' ওর বলার মধ্যে যে একটা কিছু ছিল, ধরতেই পারল না ব্যস্ত মেয়েটা।

'পরে,' মাথা ঝাঁকাল। 'আগে কাজ...'

'তুমি বুঝতে পারছ না। আমার কাজটা বেশি জরুরী।'

ঝট করে ঘুরে তাকাল নিনা, চরম বিরক্তিতে বিচ্ছিরিরকম বিকৃত হয়ে আছে সুন্দর মুখটা। 'কিসের তোমার...' এবারও কথা শেষ করতে পারল না। থেমে গেল ওর ঠাণ্ডা দুই চোখের দিকে তাকিয়ে। 'কি! অমন করে কি দেখছ?'

'তোমাকে,' হাসল রানা। কিন্তু এ অন্যরকম হাসি, পরিচয় নেই মেয়েটির এর সাথে। 'এই বোটের খোঁজ বের করার জন্যেই ন্যাড়া গার্সিয়ার পা আগুনে ভরে দিয়েছিলে তোমরা, তাই না?'

শক্ত হয়ে গেল মেয়েটি। পলকের জন্যে চোখের তারায় ভয়ঙ্কর ক্রোধের আগুন ঝলসে উঠল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক হয়ে গেল সে। 'তার মানে? কিসের কথা বলছ তুমি?'

'নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে লোকটা তোমাদের জানিয়ে গেছে এটা কোথায় আছে, কেমন?' শান্ত, অনুত্তেজিত গলায় বলল ও।

ভেতরের চরম বিস্ময় আর চেপে রাখতে পারল না নিনা। কিন্তু রানার লক্ষ নেই সেদিকে। 'পুরোটা খুলে বলো তো! শুনতে খুব ইচ্ছে করছে। গার্সিয়াকে নির্যাতন করার সময় তোমরা চারজনই ছিলে, না আরও কেউ ছিল?'

মনস্থির করে লম্বা দম টানল ও। শীতল, হিসহিসে গলায় বলল, 'তুমি অন্যের

ব্যাপারে হাত গলাচ্ছ, রানা!'

'ঠিক,' মাথা দোলাল রানা। 'রিকিও আকারে ইঙ্গিতে ঠিক এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিল আমাকে,' হাসল নিনার বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে। 'আমি কি জবাব দিয়েছি, জানো? বলেছি, যদি এসবের সাথে আমাকে জড়ানো না হত, যদি আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা না করা হত, আমি নাক গলাতাম না। করা হয়েছে বলেই গলিয়েছি।'

ডেক রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও। ট্রাঙ্কের ইনার পকেট থেকে ওয়াটার প্রুফ সিগারেট কেস ও লাইটার বের করে সিগারেট ধরাল। নিনাকেও সাধল। খানিক ইতস্তত করে শ্রাগ করল ও, নিল। গাল ভরে ধোঁয়া টেনে একটু একটু করে ছাড়তে লাগল। কপালে চিন্তার ভাঁজ।

'খুলে বলবে ঘটনাটা?' অমায়িক কণ্ঠে প্রশ্ন করল ও।

'কিছু বলার নেই আমার।'

'তাহলে আমি বলি, যতদূর জানি। ভুল হলে তুমি শুধরে দিয়ো।' টোকা দিয়ে পানিতে সিগারেটের ছাই ফেলল রানা। 'বারো তারিখ সন্ধের পর কেনসভিল নামে এক ফার্মিঙ টাউনে রিকির সাথে হঠাৎ করে দেখা আমার। শুনলাম, অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ উইনার কোন এক সুইমারের খোঁজে সে ওদিকে গিয়েছিল, কিন্তু পায়নি তাকে।

'আমি জানতে চাইলাম কেন সাঁতারু খুঁজছে সে? বলল, সে নয়, কার্লো খুঁজছে। কিছুদিন থেকে একজন ভাল সাঁতারু খুঁজছে সে। কি নাকি বিশেষ একটা কাজ আছে, যে কাজটা করে দিতে পারবে, তাকে প্রচুর টাকা দেবে কার্লো। লোকটাকে না পেয়ে রিকি দেখলাম বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। একা ফিরে গেলে কার্লো কি করে না করে, এই ভয়ে খুব অস্থির সে।'

সিগারেটে টান দিল রানা। 'ওর অবস্থা দেখে খারাপ লাগল। বললাম, আমিও সাঁতারে ইওরোপের চ্যাম্পিয়ন, গোল্ড উইনার, তুমি চাইলে আমি তোমার সাথে যেতে পারি। হয়তো আমাকে দিয়ে কাজ হতেও পারে তার। আসলে কিন্তু চাপা। চাপা মানে বোঝো? না, তুমি বুঝবে না, ঢাকাইয়া কথা কি না! এর মানে হলো গুল। পদক পাওয়া তো পরের কথা, চোখেও দেখিনি কখনও। সে যা হোক, ও রাজি হলো। শুধু রাজি নয়, এমন খুশিই হলো যে ফোনে কার্লোকে খবরটা জানাবার লোভ সামলাতে পারল না। এবং তাই করতে গিয়েই ফেঁসে গেল সরল-সোজা ছেলেটা।'

এমনভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল নিনা, দু'চোখ এতই স্থির, মনে হলো চোখ নয়, জমাট বাঁধা দু'টুকরো বরফ।

'কি ভাবে ফাঁসল জানতে চাইলে না?' আরেক টান দিল রানা। মেয়েটির কথা বলার লক্ষণ নেই দেখে আবার শুরু করল। 'প্রথমবার রিকি ফোন করল রেস্টে, কার্লোর সাথে কথা বলতে চেয়ে জানল সে ওখানে নেই। আর কোথাও আছে। জায়গাটার নাম বলতে পারল না রিসিভার জো। তবে ওর কাছে তোমার বাবার রেখে যাওয়া অন্য একটা ফোন নম্বর ছিল, তাকে যদি খুব জরুরী কোন প্রয়োজন পড়ে, ওই নম্বরে যোগাযোগ করার কথা বলে গিয়েছিল সে।

'ওই নম্বরে দ্বিতীয়বার ফোন করল রিকি, তোমার বাবার সাথে কথা বলল। নম্বরটা ছিল ভেরো বীচের। পলার স্বামীর ফার্ম হাউসের। পরে কষ্ট করে জেনে নিতে হয়েছে আমাকে। আমার বিশ্বাস, ওই সময় গার্সিয়ার লাশটা কার্লোর সামনেই পড়ে ছিল। ওটার কি ব্যবস্থা করা যায় ভেবে পাচ্ছিল না। রিকির ফোন পেয়েই দ্রুত হিসেব কষে ফেলল সে, জেনে নিল কোন পথে পাম বীচ ফিরছে রিকি। ব্যস্, তারপর এক ঢিলে দুই পাখি মারার বুদ্ধি বের করে ফেলল।

'ক্যারাভ্যানে লাশটা তুলে দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দিল। তুমি ওটা রিকির ঘাড়ে চাপিয়ে কোর্টেজের সাথে মার্সিডিজে চড়ে পালিয়ে গেলে। আর কার্লো, সে সম্ভবত প্লেনে তোমার আগেই ফিরে আসে পাম বীচে।'

'তুমি এসব…এসব কি বলছ, রানা?' অবিশ্বাসে চোখ বড় হয়ে উঠেছে নিনার। সিগারেট টানার কথা মনে নেই, পুড়ে চলেছে ওটা। 'কেন আমরা ফাঁসাতে যাব? তাতে আমাদের কি লাভ?'

'প্রথম লাভ হচ্ছে গার্সিয়ার লাশ দূর করে নিশ্চিন্ত হওয়া, অন্যটা পাম বীচ সামার রেস্ট চিরতরে গ্রাস করার পথের ছোট্ট বাধা, ওটার আসল মালিক রিকি অস্টিনকে খুনের দায়ে ফাঁসিয়ে দেয়া। ওর বয়স যত বাড়ছিল, ততই বাড়ছিল কার্লোর দুশ্চিন্তা। কবে ছেলেটা রেস্টের মালিকানা দাবি করে বসে, তার দলিলপত্র ভুয়া বলে দাবি করে বসে, সেই চিন্তায় ঘুম হচ্ছিল না তার।'

'কি আবোল-তাবোল বকছ? মাথা ঠিক আছে তো তোমার?'

'হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। কদিন আগে অবশ্য ছিল না। চেনা নেই শোনা নেই, পথের মাঝে রাইড চাইলাম, অমনি একজন আমাদের ঘাড়ে লাশ তুলে দিয়ে পালাল কেন? এই কেন'র উত্তর বের করতে পারিছিলাম না বলে কয়েকদিন মাথা ঠিক ছিল না আমার, উত্তর জানার পর ঠিক হয়ে গেছে। পথের মধ্যে গাড়ি থামিয়ে যখন কফি খেতে নামলাম, তুমি পালালে কোর্টেজ, আর সম্ভবত পলার সাথে। গাড়িটা যে অনেকক্ষণ থেকেই পিছু লেগেছিল, খেয়াল করেছি আমি। হাইওয়ের গাড়ি, পথে কাফে থাকা সত্ত্বেও দাঁড়াল না, হুশ্ করে চলে গেল ভেল্‌কি দেখিয়ে, সন্দেহের কথা অবশ্যই।

'ওটা যখন ক্যারাভ্যানের কাছে একটু থেমেই দৌড় শুরু করল, তখনই খট্‌কা লেগেছে আমার। অবশ্য যখন তোমাকে প্রথম দেখলাম মাসটাঙে, খটকা তখনই লেগেছিল। তোমার স্কার্ফ দিয়ে চুল ঢেকে রাখা, অ্যান্টি ড্যাযল গগলস দিয়ে চোখ ঢেকে রাখা, আর সবচে' বড় কথা, হিপ্‌পিদের ভয়ে পুরুষ ড্রাইভাররাই যেখানে একা পথে বের হতে সাহস পায় না, সেখানে একা একটা মেয়ের ওই সময়ে ওরকম নাটকীয় ভঙ্গিতে এসে হাজির হওয়া, হাত তুলতেই থেমে পড়া, সবই একেকটা বড় খটকা। সেই গগলস্, স্কার্ফ, সব আছে বোটের লকারে। আমি দেখেছি। ওগুলো তোমার নষ্ট করে ফেলা উচিত ছিল, নিনা। না করে ভুল করেছ।

'অবশ্য তখন এত কিছু হিসেব করিনি। গাড়ির কাগজপত্রে নাম ছিল জোয়েল ব্লাচ। পরে যখন দেখলাম তোমার একটানা আঠারো ঘণ্টা ড্রাইভ করার থিওরির সাথে মাসটাঙের মাইলেজের হিসেব মেলে না, তখন ভাবলাম তুমি গাড়ি চোর।' আপনমনে মাথা দোলাল রানা। 'রিকি সেদিন জোর দেয়া নম্বরটা টুকে রেখেছিল

বলেই ওটার খোঁজ বের করতে পেরেছিলাম, নইলে বড় সমস্যা হত এ থেকে রেহাই পেতে।'

'আশ্চর্য! তুমি…'

'আগেভাগে পৌঁছে নিশ্চই পাম বীচের কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করছিলে তোমরা, না? আমাদের জন্যে রিসেপশন পার্টির আয়োজন করেছিলে? তুমি আমাদের নিষেধ করেছিলে পাম বীচের আগে তোমার ঘুম না ভাঙাতে, ও পর্যন্ত যাতে নিশ্চিন্তে যাই আমরা, এবং তুমি বা তোমাদের সাঙ্গপাঙ্গরা যাতে লাশসহ পাকড়াও করতে পারো আমাদের, তাই না? ধরতে পারলে কি করতে তুমি আমাদের বলো তো? কি প্ল্যান ছিল? আমাকে ব্ল্যাকমেইল করে এখানে সাঁতরে আসতে বাধ্য করতে, তাই তো? আর রিকিকে? জুজুর ভয় দেখিয়ে দেশ ছাড়া করতে? নাকি এতদিন যেভাবে তোমাদের পায়ের নিচে মাথা দিয়ে, পেটেভাতে ছিল, আজীবন সে ভাবেই থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ওর, কোন্‌টা?'

'অনেক হয়েছে!' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল নিনা। 'বন্ধ করো তোমার এসব আষাঢ়ে গল্প! মাথা ধরে গেছে আমার।'

শুনতে পায়নি ও মনে হলো। অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল, 'তোমাদের সন্দেহ করার ব্যাপারে মূল ক্রেডিট অবশ্য রিকির। কারণ আমরা যখন তোমার সাথে কথা বলে গাড়িতে উঠলাম, তখনই ও বলেছিল তোমার গলা ওর চেনা চেনা লেগেছে। সঠিক বলতে পারেনি অবশ্য, বলেছে, গলাটা তোমার মতই লেগেছে।'

ঝট্‌ করে ঘুরে তাকাল মেয়েটা। আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে যেন চোখ দিয়ে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে নিজের ওপর। 'কি! রিকি এই কথা বলেছে? কুত্তার বাচ্চাকে আমি এমন শিক্ষা দেব…'

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল ও। 'সে সুযোগ তোমরা কেউ আর পাবে না, নিনা। এতক্ষণে ও-ই হয়তো তোমার বাবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। হয়তো কার্লোর কোমরে দড়ি পড়েও গেছে।'

'মানে!'

'মানে জেনে লাভ কি? তুমি তো আর ফিরে যাচ্ছ না বীচে।'

দু'হাত মুঠো পাকাল নিনা। মনে হলো এখনই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে রানার ওপর। 'বলো, রানা, কি করেছে রিকি?'

না শোনার ভান করে কেবিনের দিকে এগোল ও। দরজা খুলে আধা অন্ধকার কেবিনের ভেতরে চোখ বোলাল। চোখ সয়ে আসতে একটা বার্থের ওপর চারটা কাঠের বাক্স দেখতে পেল ও। দুই ফুট বাই দুই ফুট প্রতিটা। এক ফুট উঁচু। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে কেবিনে নেমে পড়ল ও, দেখল ওগুলো একটার সাথে একটা বাঁধা কর্ড দিয়ে। রানা কর্ড খোলার উদ্যোগ নিয়েছে দেখে দ্রুত বলে উঠল মেয়েটি, 'খুলো না! ওগুলো ওয়াটার টাইট বক্স।'

'কি আছে ভেতরে?' মুখ তুলে তাকাল ও।

'আমরা দু'জন ওগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারি,' সরাসরি জবাব পাশ কাটিয়ে গেল সে।

'কি আছে এতে?'

জবাব নেই।

'কি আছে বাক্সে, নিনা?' আবার বলল ও।

'টাকা। ডলার।'

'কত?'

'চা-চার মিলিয়ন!' প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল সে। 'অর্ধেক তোমার, অর্ধেক আমার।'

'শুনে খুশি হলাম। কিসের টাকা?'

'আমি জানি না। বাবা জানে।'

একটা বাক্স তুলে দেখল রানা, খুব ভারী। মাথা দোলাল। 'ডুবে যাবে।'

'যাবে না। লকারে লাইফ জ্যাকেট আছে, ওগুলোর সাথে বেঁধে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারব আমরা।'

হাসল রানা। 'বেশ। সমস্ত চিন্তা-ভাবনা করেই এসেছ দেখছি।'

'হ্যাঁ, তাই। টাকাসহ তোমাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাব ভেবে সব জেনেশুনে, প্ল্যান করেই এসেছি। তুমি নিশ্চই ভাবছ না তোমাকে ভালবেসে অন্যায় করেছি আমি? সব পায়ে দলে চলে এসেছি বলে নিশ্চই তুমি দোষী ভাবছ না আমাকে? নাকি ভাবছ, রানা?' ভেতরের অস্থিরতা চেপে রাখার চেষ্টা করছে নিনা প্রাণপণে।

'রানা, না হয় মানলাম আমি ভুল করেছি। তোমাদের ফাঁসাবার চেষ্টা করে অন্যায় করেছি। কিন্তু তখন তো আমার জানা ছিল না একদিন তোমার প্রেমে পড়ব আমি। যা করেছি বাবার কথামত করেছি, না বুঝে। সেদিক থেকে চিন্তা করে ব্যাপারটা ভুলে যেতে পারো না? রিকির ব্যাপারে বাবা যা করেছে, সে দায়িত্ব তার, প্রায়শ্চিত্ত করতে হলে সে করবে, আমি কেন ভুগব তার অপরাধে? ওসব ভেবে আমরা কেন আমাদের সময় অপচয় করব, বলো? এখানে টাকা আছে, বাইরে বোট আছে, আমি আছি-তুমি আছ, চলো না আর কোথাও চলে যাই আমরা, যেখানে কেউ কোনদিন আমাদের নাগাল পাবে না, তেমন কোথাও!'

কিছু বলল না ও। ভাবছে।

'রানা!'

'বলো।'

'চলো, চলে যাই আমরা,' কেবিনে নেমে এল নিনা। রানার বুকের সাথে সেঁটে দাঁড়াল। 'এখনই যাবে, না একটু পরে?' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দৃষ্টির অর্থ বোঝার চেষ্টা করল সে মুখের কাছে মুখ এনে।

'হ্যাঁ, যাব,' এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে হাসল রানা। 'কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তোমাকে।'

'কি?'

'আমাদের সাথে বোটে আরেকজন কে ছিল? কোর্টেজ, না কার্লো?'

তেরো

ম্যানুয়েলের মুখে পুলিস আসার খবর পেয়ে মোটেই অবাক হলো না কার্লো। সে বরং ওদের আরও আগেই আশা করেছিল। জানে, কোর্টেজকে কোয়েল দেখেছে, তবে সেই ঘটনার সাথে কার্লোকে পুলিস জড়াতে পারবে না কোনমতেই। কার সাথে কোয়েলের কি সমস্যা বেধেছে, কে তাকে মেরেছে, সে তার কি জানে?

বড়জোর ঘটনার একটা তদন্ত করবে পুলিস, কোর্টেজ সম্পর্কে এক আধটা প্রশ্ন করবে। এর বেশি আর কি করবে? কাজেই ওদের তার ভয় করার কোন কারণ নেই।

'ওঁদের নিয়ে এসো,' ম্যানুয়েলকে নির্দেশ দিল সে।

একটু পরই মশ্ মশ্ করে অফিসে ঢুকল বিশালদেহী সার্জেন্ট কেন হ্যারিস ও ডিটেকটিভ ডান কোয়েল।

'আসুন আসুন!' চওড়া হাসি দিল কার্লো, অফিসারদের সম্মান দেখানোর জন্যে উঠে দাঁড়াল। 'মিস্টার কোয়েল! আমি খুব দুঃখিত কালকের ঘটনায়। এখন কেমন বোধ করছেন? প্লীজ, বসুন! সত্যি, খুব দুঃখিত আমি...'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কোয়েল। 'আরও অনেক দুঃখ আছে তোমার কপালে। অনেক দুঃখ, কার্লো।'

'দেখুন, মিস্টার কোয়েল, আপনি জানেন কালকের ঘটনার জন্যে আমি দায়ী নই। আমি তো বরং...'

'শাটাপ্, কার্লো! বোসো চুপ করে!'

হাসির বেড় ছোট হয়ে গেল গরিলার, সাহায্যের আশায় সার্জেন্টের দিকে তাকাল। কিন্তু ভরসা পেল না। কাজেই ভাল মানুষের মত টুপ্ করে বসে পড়ল।

'মাসুদ রানা কোথায়, কার্লো?' প্রশ্ন করল কোয়েল। সার্জেন্ট কথা বলছে না। ওদের নিজেদের মধ্যে কথা হয়েই আছে, কেসটা ডিটেকটিভ একাই সামলাবে। তাই চুপ করে পায়ের ওপর পা রেখে দোলাচ্ছে সে।

'মাসুদ রানা? ওর রুমেই আছে বোধহয়। আজ ছুটির দিন...'

'খবর পাঠাও। আমি জানতে পেরেছি ও নেই।'

'নেই? তাহলে হয়তো বাইরে কোথাও গেছে। আচ্ছা, দেখছি আমি।' বেল বাজিয়ে রানাকে ডেকে আনতে বলল সে ম্যানুয়েলকে। দু'মিনিট পর ফিরে এল লোকটা, জানাল নেই রানা ঘরে। 'তাহলে বাইরেই কোথাও গেছে,' বলল কার্লো 'কেন, ওকে কি দরকার, মিস্টার কোয়েল?'

'প্রশ্ন আমি করব, কার্লো,' কড়া চোখে তাকাল সে। 'তুমি কেবল জবাব দিয়ে যাবে, বুঝেছ?'

'বেশ।' চুপ্‌সে গেল লোকটা।

'মাসুদ রানা আসলে কে, তুমি জানো?'

ভুরু কোঁচকাল সে। 'বুঝলাম না।'
'বলতে চাইছি লোকটা যে আসলে মাসুদ রানা নয়, তা তুমি জানো কি না? ও যে সাঁতারে পদক পাওয়ার কথা বলে, তা ডাহা মিথ্যে, সে খবর রাখো কি না?'
'সে কি!' চোখ পিটপিট্ করে উঠল কার্লোর। 'তাহলে কে ও?'
'জানো না, কেমন?'
'না, ঠিক সেভাবে তো ওর খোঁজ-খবর নেইনি,' আমতা আমতা করতে লাগল সে। 'শুনেছি পদক পাওয়া সাঁতারু, তাই··· কে তাহলে লোকটা?'
পকেট থেকে ফ্যাক্স মেসেজটা বের করল ডিটেকটিভ। 'এটা পড়ো।'
পড়ল সে। তারপর ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'তার মানে? ও আমাকে মিথ্যে বলেছে তাহলে? মাসুদ রানা···'
'ও যে মাসুদ রানা, তাই বা তুমি জানলে কি করে? অন্য কেউ হতে পারে না, মাসুদ রানার নাম ভাঙিয়ে চলছে?'
অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল কার্লো। ভাবছে। 'কে হতে পারে তাহলে, জানেন কিছু আপনি?'
ওপরে-নিচে মাথা দোলাল কোয়েল। 'জানি।'
'কে?'
'প্যারাডাইস সিটির মানসিক হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসা এক ভয়ঙ্কর সেক্স ম্যানিয়াক। লেডিকিলার মার্কা চেহারা বলে মেয়েরা পতঙ্গের মত ওর দিকে ছোটে, ওকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। আর ও ইচ্ছেমত মজা লুটে নিয়ে ওদের খুন করে। ওখানে এই রোগেরই চিকিৎসা চলছিল তার, কিন্তু দুই গার্ডকে ঘায়েল করে পালিয়ে এসেছে ব্যাটা।' কথার ফাঁকে কার্লোর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে কোয়েল, তার মুখের প্রতিটি ভাব-ভঙ্গি লক্ষ করছে তীক্ষ্ণ চোখে।
অবাক হয়ে গেল সে লোকটাকে ঘামতে দেখে, কাঁপছে থর থর করে। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। 'কি-কি বলছেন আপনি!'
'ঠিকই বলছি। ওখান থেকে বেরিয়ে এর মধ্যেই একটা মেয়েকে খুন করেছে সে। কেটে টুকরো টুকরো করেছে।'
'আমার মেয়ে! আ-আমার মেয়ে···' কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল কার্লো।
'কি হয়েছে তোমার মেয়ের?' ঝুঁকে এল কোয়েল।
'ও আমার মেয়ের সাথে সা-সাগরে গেছে!'
'কেন?'
'এমনি, ঘুরতে গেছে! কিন্তু··· মিস্টার কোয়েল! জলদি চলুন, নইলে ও আমার মেয়েকে··· ওকেও হয়তো মেরে ফেলবে।'
একটু ভাবল ডিটেকটিভ। ভেবেছিল আগে কায়দা করে মাসুদ রানাকে ধরবে, ওর মুখ থেকে সব খবর আদায় করে তারপর ধরবে কার্লোকে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কেস অন্যরকম হয়ে গেছে। সুযোগটা চিনতে ভুল হলো না তার।
'হ্যাঁ, তা সুযোগ পেলে তো মারবেই,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল সে, যেন কথার কথা বলছে। 'লোকটা এমন সুযোগ ছাড়বে কেন?'
'কি বলছেন আপনি!' প্রায় চিৎকার করে উঠল কার্লো। অবস্থার মারপ্যাঁচে

পড়ে অসহায় রাগে ফুঁসছে। 'আমার মেয়েকে লোকটা মেরে ফেলবে, আর আপনি বসে বসে…'

'আরে না! এখনই মারবে না। আগে কম করেও ঘন্টা দুয়েক প্রেম করবে ও তার সাথে। তারপর না খুন-টুন যা করার করবে।'

দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো লোকটার। মনে হলো এখনই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে কোয়েলের ঘাড়ে। 'আপনি মশকরা করছেন নাকি, সাহেব? একটা নিরীহ মেয়ে মরতে বসেছে, আর আপনি…'

'মেয়েকে তুমি খুব ভালবাস, কার্লো?' রাগের চিহ্নই নেই ডিটেকটিভের চেহারায়, বরং এখন আগের চেয়ে অনেক শান্ত।

'কি? হ্যাঁ, অবশ্যই! ও আমার একমাত্র সন্তান, মা মরা মেয়ে। ওকে আমি ভালবাসব না?'

'এবার তাহলে বলে ফেলো।'

চোখ কুঁচকে উঠল কার্লোর। 'কি বলব?'

'ওই যে, গার্সিয়ার ঘটনাটা,' মৃদু কণ্ঠে বলল কোয়েল।

'সে তো আপনাকে সেদিনই…'

'না, কার্লো, বলোনি। পরে আমি ড্যানি ও' ব্রায়ানের সাথে কথা বলেছি, সে বলেছে গার্সিয়া তোমার কাছেই প্রথম এসেছিল তোমার বোট ধার নিতে। তুমি দাওনি। এখন আর কথা চেপে রেখে লাভ নেই, কার্লো। তুমি এমনিও শেষ, অমনিও শেষ। যদি সত্যি স্বীকার করো, আমরা তোমার মেয়েকে বাঁচাবার চেষ্টা করব, আর যদি না করো,' শ্রাগ করল ডিটেকটিভ। 'এক ক্রিমিন্যালের মেয়েকে বাঁচাবার তেমন গরজ নেই আমাদের।'

'আমার জন্যে আমার নিরপরাধ মেয়েকে কেন…'

'নিরপরাধ!' নাটুকে ভঙ্গিতে বলল সে। 'তাই যদি হবে, তাহলে গার্সিয়ার সাথে ভেরো বীচে হারযের অফিসে কে গিয়েছিল, কার্লো?' আন্দাজে ঢিল মারল। 'কে ক্যারাভ্যান থেকে লাফিয়ে পড়ে পলা জোনসের মার্সিডিজে উঠেছিল? তুমি ভেবেছ আমরা কিছু জানি না?'

ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল কার্লোর ঠোঁট। থর-থর নয়, রীতিমত ঠক্ ঠক করে কাঁপছে। ওদিকে হাসি ঠেকাতে না পেরে আরেকদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে সার্জেন্ট।

'মুখ না খুললে তোমার মেয়ের কোন চান্স নেই, কার্লো। যদি সব স্বীকার করো, আমাদের বোট নিয়ে এখনই রওনা হব আমরা। পাম বীচে আমাদের বোটই সবচে' ফাস্ট। এবার বলো, মুখ খুলবে?'

মনে মনে হার স্বীকার করেই রেখেছিল লোকটা, কোয়েলের প্রশ্নের জবাবে খুব দ্রুত, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল 'করব। পথে যেতে যেতে জানাব সব, প্লীজ, তাড়াতাড়ি করুন।'

পনেরো মিনিট পর জেটি ছাড়ল পুলিসের বোট। কেবিনে বসে কার্লো জবানবন্দী দিতে শুরু করল। একবারও বাধা না দিয়ে শুনে গেল সার্জেন্ট ও ডিটেকটিভ। সার্জেন্ট শুধু শুনলই না, বিস্তারিত নোটও নিল।

'গার্সিয়া আমার বহুদিনের পুরনো বন্ধু,' বলে চলল লোকটা। 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একসময় এ অঞ্চলের সেরা পিটারম্যান ছিল। একবার ধরা পড়ে জেল খাটে পাঁচ বছর। ছাড়া পেয়ে আর ও কাজ করেনি সে, অন্য কাজে হাত দেয়। চোরাচালানীর কাজে ওকে নিয়োগ করে চাক জোনস। কিউবায় মাল পাঠাত জোনস, ওরা দাম শোধ করত নগদ ডলারে। ঝুঁকি আছে বলে জোনস নিজে কোন বোট তৈরি করেনি, অন্যের বোট ভাড়া করে কাজ চালাত। সিজার গার্সিয়া মাল আর টাকা আনা-নেয়া করত।

'জোনসের বউ পলা খুব লোভী মেয়ে মানুষ। একবার যখন সে জানতে পারল মালের বিপরীতে কিউবা থেকে চার মিলিয়ন ডলার ক্যাশ আসছে, লোভ সামলাতে পারল না। জোনসের শোফার কোর্টেজ আসলে পলার প্রেমিক, অনেকদিনের অবৈধ সম্পর্ক। টাকাটা মাঝপথে হাইজ্যাক করার প্রস্তাব দিল সে কোর্টেজকে, ও রাজি হলো, তবে একা এতবড় কাজ করা সম্ভব নয় ভেবে আমাকেও সঙ্গে নেবে বলল। রাজি হয়ে পলা আমাকে জানাল, আমি রাজি হলাম, অবশ্য অন্য কারণে।

'কথা হলো, আমি আর কোর্টেজ পাব এক মিলিয়ন করে, বাকি টাকা পলার। আমার বোটে আমি আর কোর্টেজ খাপ পেতে সাগরে বসে থাকলাম, সন্ধের একটু পর শেলডন আইল্যান্ডের কাছে বাধা দিলাম গার্সিয়াকে। কিন্তু ধরতে পারলাম না। অন্ধকারে পালিয়ে গেল। আমরা ফিরে এলাম ব্যর্থ হয়ে। এরপর দু'মাসেরও বেশি হয়ে গেল খোঁজ নেই গার্সিয়ার। সেদিন সাগরে কোর্টেজ বেশ গোলাগুলি করে ওর বোট সই করে, ভাবলাম গুলি খেয়ে মরে-টরে গেছে বুঝি।

'তারপর, ক'দিন আগে হঠাৎ করে হাজির গার্সিয়া। বোট ধার চাইল আমার, আমি দিলাম না। ও চলে যাওয়ার একটু পর পলা এল রেস্টুরেন্টে ডিনার খেতে, তখন তাকে গার্সিয়ার কথা জানালাম। সে জানত ওই চার মিলিয়ন ডলার আমরা তো নই-ই, তার স্বামীও পায়নি, সেই টাকার শোকে কাতর জোনস। ধরে নিল গার্সিয়াকে ধরলে সে টাকার খোঁজ পাওয়া যাবে। মনে করলাম যেতেও পারে।

'ভেরো বীচে গেলাম ওর খোঁজে। পেলাম না প্রথমবার, পরেরবার ধরলাম। তখন জানতাম না ও আমার সাথে দেখা করতে আসার আগে থেকেই পলা আর কোর্টেজ গোপনে খুঁজে বেড়াচ্ছিল ওকে। ওরা কিভাবে নাকি আগেই জানতে পেরেছিল ও বেঁচে আছে। আমাকে বলেনি, হয়তো শেষ পর্যন্ত আমাকেও ডবল ক্রস করতে চেয়েছিল কি জানি! এসব গার্সিয়ার মুখেই জেনেছি পরে, যখন ওর ওপর ভেরো বীচে টর্চার চালাচ্ছিল কোর্টেজ। জানতে চাইলাম, কেন আমাকে বলা হয়নি? পলা বলল, পরে জানাবে ভেবেছিল সে। আমি বিশ্বাস করিনি, তবে কিছু বলিওনি। কারণ ওই চার মিলিয়ন নিয়ে অন্যরকম পরিকল্পনা ছিল আমার আগে থেকেই।

'কোর্টেজের নির্যাতনে হার্টফেল করল গার্সিয়া। আমি অনেক নিষেধ করেছি, কানেই তুলল না পলা। ওর কথামতই কোর্টেজ গার্সিয়ার পা চুলোয় ভরে দিয়েছিল। সহ্য করতে না পেরে মরার আগে স্বীকার করে গেল, সেই চার মিলিয়ন তার কাছেই আছে শেলডন আইল্যান্ডের ফানেলে।

'আমাদের তাড়া খেয়ে পথ না পেয়ে ওর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সে বোট নিয়ে।

সে সময়ে সাগরের পানি সর্বনিম্ন পর্যায়ে ছিল। পরে আর বের হতে পারেনি ও বোটে যতদিন খাবার ছিল, বের হওয়ার চেষ্টাও করেনি। ওখানে যখন ছিল গার্সিয়া, তখন টাকাটা নিজেই মেরে দেবে বলে ঠিক করে।

'পরে কি ভাবে যেন মেইন ল্যান্ডে ফিরে আসে ও আগামী সাতাশ তারিখ পানি আবার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামবে, তখন আমার বোট নিয়ে এসে টাকাটা সরিয়ে ফেলার ইচ্ছে ছিল। ও জানত না সাগরে আমরাই আক্রমণ করেছিলাম ওর বোট, জানলে নিশ্চই আমার কাছে আসত না।

'আমার আগে থেকেই সন্দেহ ছিল বোটটা শেলডনেই আছে ওখানেই হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল ওটা, তারপর আর কোন খবর নেই, তাহলে গেল কোথায়? কিন্তু চেক করার জন্যে বোট নিয়ে ভেতরে ঢোকার উপায় তখনও ছিল না, এখনও নেই। তাই একজন ভাল সাঁতারু খুঁজছিলাম আমি, যে স্রোত ঠেলে ফানেলে ঢুকে বোটটা সত্যি আছে কি না চেক করতে পারবে এরমধ্যে গার্সিয়ার কথায় বুঝলাম আমার অনুমানই ঠিক। বোট ওখানেই আছে।'

'টাকাটাও?' এতক্ষণে প্রথম প্রশ্ন করল কোয়েল।

'হ্যাঁ।'

'এবং তা বের করে আনতে গেছে মাসুদ রানা আর তোমার মেয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'টাকাটা নিয়ে তোমার কি বিশেষ পরিকল্পনা ছিল বলছিলে যেন?'

'চেয়েছিলাম টাকাটা হাতে পেলে কাস্টমস অথরিটির হাতে তুলে দেব।'

'হ্যাঁ,' বলল কোয়েল। 'আমিও সেরকমই অনুমান করেছি।'

তার টিটকিরি গায়ে মাখল না কার্লো। সাগরের দিকে তাকিয়ে আনমনে বলল, 'হারামজাদা বোটটা আর জোরে চলে না?'

নোট বইটা তার হাতে তুলে দিল সার্জেন্ট। 'প্রথম পাতাগুলোয় ইনিশিয়াল দাও, শেষেরটায় সই করো।'

ঝটপট নির্দেশ পালন করল কার্লো। একবার দেখলও না কি লিখেছে সার্জেন্ট। কিসের নিচে সই করছে।

বইটা পকেটে পুরে সার্জেন্ট বলল, 'ধৈর্য ধরো। টপ স্পীডেই যাচ্ছি আমরা এটার চেয়ে ফাস্ট বোট পাম বীচে নেই।'

চোদ্দ

চেহারা বিগড়ে গেল নিনার। 'আরেকজন কে ছিল মানে? কে আবার থাকবে?'

'তা তো জানি না!' নিরীহ মুখভঙ্গি করল রানা। 'কেবিনের দরজা সব বন্ধ দেখে মনে হলো কেউ হয়তো আছে।'

'কেউ নেই। শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি আমরা, রানা। বাক্সগুলো তোলো, ডেকে নিয়ে চলো, প্লীজ!

'তুমি ঠিকমত ভেবেচিন্তে বলছ তো!'

'নিশ্চই! চলো।'

কয়েক মুহূর্ত ওকে দেখল রানা, শ্রাগ করে কাজে লেগে পড়ল। বাক্সগুলো ফোরডেকে রাখল, নিনা চারটা লাইফ জ্যাকেট নিয়ে এল। মহাব্যস্ত। থেকে থেকে রানা যে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে, খেয়ালই নেই। প্রতিটা জ্যাকেটের সাথে একটা করে বাক্স খুব যত্নের সাথে বাঁধল সে। রানা একটুকরো দড়ি খুঁজে এনে বাক্সগুলো এক করে বেঁধে দিল টাইট করে।

যে যার অ্যাকুয়ালাঙ পরে তৈরি হয়ে নিল। 'রওনা হতে চাও?' বলল ও।

'শিওর!' হাসল নিনা। 'আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

ওর কাঁধে আলতো করে হাত রাখল রানা। 'আরেকবার ভেবে দেখো।'

'কি?'

'একটু আগে যা বলছিলাম।'

'তোমার সন্দেহের বাতিক আছে, রানা। এসো তো! বাক্সগুলো ধরো আমার সাথে, পানিতে ফেলেদি'।'

দু'মিনিট পর টেনে ওগুলোকে কিনারায় নিয়ে এল দু'জনে মিলে। ফেলে দিল ধাক্কা দিয়ে, জোর ঝপাৎ শব্দে আছড়ে পড়ল বাক্সগুলো, প্রায় একই সাথে ওরাও লাফ দিল। আগে আগে দড়ি ধরে ওগুলোকে টেনে নিয়ে চলেছে রানা। দ্রুত ওর পাশে চলে এল নিনা, হাসছে দাঁত বের করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্রোতের মধ্যে পড়ল ওরা, বুলেটের বেগে ছুটে চলল ঘোর অন্ধকার টানেলের ভেতর দিয়ে। প্রয়োজন ছিল না, তবু ডুব দিল রানা।

ওদিকে বাইরে এক ঝটকা মেরে উঠে বসল ফের্নান্দো কোর্টেজ—চোখের সামনে লাইফ জ্যাকেটের সাথে বাঁধা চারটা কাঠের বাক্স দেখতে পাচ্ছে সে। তুমুল বেগে এদিকেই আসছে।

এইবার!

দ্রুত রাইফেল কক্ করল সে, এক হাঁটু মাটিতে রেখে ওটা কাঁধে ঠেকাল। জানে এখনই হারামজাদা বের হবে। বাক্সগুলো তার সঙ্কেত। এখন যে কোন মুহূর্তে ভেসে উঠবে মাসুদ রানা, সঙ্গে সঙ্গে এক গুলিতে তার মাথা চৌচির করে দেবে কোর্টেজ। ভাবতে না ভাবতে একটা মাথা সারফেস ভেদ করল, বাক্সগুলোর মাত্র কয়েক গজ পিছনে।

খুব দ্রুত লক্ষ্য বদল করেই ট্রিগার টিপে দিল সে। এবং দিয়েই বুঝল ভুল হয়ে গেছে। ওটা রানার নয়, নিনার মাথা। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই, সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে গেছে। ঠিক জায়গামতই লেগেছে শক্তিশালী বুলেট, ঝাঁকি মেরে পানি থেকে বেশ খানিকটা ওপরে তুলে ফেলেছে নিনার হালকা-পাতলা দেহটা। প্রচণ্ড আক্ষেপে দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ল সে, বেকুবের মত তার মুঠো পাকানো সুন্দর হাত দুটো দেখল কোর্টেজ। মাস্ক ঢাকা রক্তাক্ত মুখটা দেখল।

এক কি দুই মুহূর্ত, তারপরই আছড়ে পড়ে চিত হয়ে গেল নিনা। তার চারদিকে বড় এক বৃত্ত সৃষ্টি করতে লাগল রক্ত।

দীর্ঘ সময় অনড় বসেই থাকল লোকটা, তারপর চিৎকার করে কি যেন

বলল—মনের অসহায় ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনা প্রকাশ করল। পরক্ষণে তৎপর হয়ে উঠল, দ্বিতীয় মাথাটার খোঁজে হন্যে হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। লেগুনের পানিতে ভেসে থাকা বাক্স চারটার দিকে হাবার মত তাকাল, তার নাগালের বাইরে রয়েছে ওগুলো।

ও নিয়ে সমস্যা নেই। পরেও ব্যবস্থা করা যাবে বাক্সগুলো, কিন্তু হারামজাদা মাসুদ রানা গেল কোথায়?

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় পিছন থেকে একটা বাজখাঁই কণ্ঠ হুঙ্কার ছেড়ে উঠল, 'হোল্ড ইট, কোর্টেজ! অস্ত্র ফেলে দাও!'

কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল লোকটা, প্রচণ্ড রাগে কুকুরের মত দাঁত বেরিয়ে পড়ল। ঠিক তার পিছনে, সামান্য ওপরে দাঁড়িয়ে আছে ডান কোয়েল, তার ডানদিকে সার্জেন্ট হ্যারিস। দু'জনের হাতেই অস্ত্র রেডি।

ফাঁদে পড়া জানোয়ারের মত গুঙিয়ে উঠল কোর্টেজ, বিদ্যুৎবেগে রাইফেলের নল ঘুরিয়েই গুলি করল। পরপর কয়েকটা। প্রথমটা করেছে সে নিজের ইচ্ছেয়, পরেরগুলো আপনাআপনি বেরিয়ে গেছে আঙুলের টানে। কারণ প্রথম গুলিটা ছোঁড়ার সাথে সাথে কোয়েলের ছোঁড়া বুলেট তার দুই চোখের মাঝখানে সেঁধিয়ে গেছে। একটা পাক্ খেয়ে লেগুনের পানিতে আছড়ে পড়ল সে।

এমনসময় বাক্সগুলোর ওপাশে মাথা তুলল মাসুদ রানা।

পাম বীচ পুলিস হেডকোয়ার্টার্স। একই দিন সন্ধের কথা।

চীফ ক্যাপ্টেন অ্যাশক্রফটের রুমে রীতিমত ভিড় পড়ে গেছে। মাসুদ রানা বসে আছে চীফের মুখোমুখি। ওর পাশে রিকি। অভিভূতের মত চ্যাম্পকে দেখছে ও নতুন দৃষ্টিতে। জানা হয়ে গেছে, ওর জীবনের দুঃখ-বঞ্চনার কাহিনী শুনে ওকে স্রেফ সাহায্য করতেই পাম বীচে এসেছিল মানুষটা। তাও মিথ্যে পরিচয়ে।

জোসেফ অস্টিনের অনেক পরিশ্রমে গড়া সামার রেস্ট তার ছেলে যাতে ফিরে পায়, সে জন্যে জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিতে পিছ পা হয়নি। একেবারে অজানা অচেনা একজনের জন্যে মানুষ এতকিছু করতে পারে, সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে এসে এমন ঝড় তুলতে পারে, এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে রিকির। আজ দুপুর পর্যন্ত খুনী ভেবে পুলিস যার পিছু লেগে ছিল, এ মুহূর্তে সেই মানুষটিই কেমন নির্বিকার চেহারায় স্বয়ং পুলিস চীফের সামনে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে।

ওপাশে বসা ডিটেকটিভ ডান কোয়েলকে ভেজা বেড়ালের মত দেখাচ্ছে। হাসি পেল ওর। প্রায় হাঁ করে চ্যাম্পকে দেখছে সে। ঝোড়ো কাকের মত চেহারা। সার্জেন্ট, হোমিসাইড-ইন-চার্জ, ডিটেকটিভ থার্ড গ্রেড রবিন কুক, কারও চোখের পলক পড়ছে না। ওদের দু'জনের ফাঁদে পড়ার ঘটনা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সবটা অল্প কথায় ক্যাপ্টেনকে বুঝিয়ে বলেছে রানা।

'আপনিই তাহলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন ও' ব্রায়ানকে?' অনেকক্ষণ পর বলে উঠল ক্যাপ্টেন অ্যাশক্রফট। 'সেই জন্যেই গা ঢাকা দিয়েছে ও?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ওর ওপর আক্রমণ আসবে আপনি জানতেন?'

হাসল ও। 'না। অ্যাক্সিডেন্টালি এদের আলোচনা শুনে জানতে পারি,' ইঙ্গিতে কার্লোর সেল দেখাল।

ভেতরে মূর্তির মত বসে আছে গরিলা। ধ্যান করছে যেন। মেয়ের লাশ দেখার পর সেই যে নীরব হয়ে গেছে, এ পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। শোকে পাথর হয়ে গেছে। দৃষ্টি অন্তঃসারশূন্য।

'কিন্তু আপনি মিথ্যে সুইমারের পরিচয় কেন দিয়েছিলেন?'

'কেন?' মৃদু হাসি ফুটল রানার মুখে। 'আমি কি সুইমার নই?'

'অফকোর্স! একশোবার! শেলডনের ওই গুহায় সাঁতরে ঢুকতে পারা, তাও আরেক জনকে টেনে নিয়ে, আমার মতে অসম্ভব একটা কাজ। কিন্তু আপনি তা সম্ভব করেছেন আমি তা বলছি না, জানতে চাইছি ইওরোপের চ্যাম্পিয়ন বলে পরিচয় কেন দিয়েছিলেন?'

'শুধুই কার্লোকে কনভিন্স করার জন্যে। এর মুখে,' রিকির কাঁধে হাত রাখল ও 'লোকটার কাজকর্মের ফিরিস্তি শুনে মনে হয়েছে ওর নিচে সন্তুষ্ট হবে না কার্লো, তাই।'

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা।

'সবই হলো, মিস্টার রানা,' অপ্রস্তুতের মত হাসল ক্যাপ্টেন। 'এবার দয়া করে যদি আপনার আসল পরিচয় জানান আমাদের, খুশি হব।'

'আমি আমার আসল নামই বলেছি, ক্যাপ্টেন,' বলল ও।

'নাম নয় শুধু। আপনার পরিচয়ও জানতে চাই আমি।'

'আমার মত সাধারণ...'

'আপনি সাধারণ নন, মিস্টার রানা, আমি বুঝতে পারছি। তাছাড়া আপনার নাম আমার চেনা চেনা লেগেছে প্রথম দিন থেকেই। প্লীজ, আমাদের এই ধাঁধা থেকে মুক্তি দিন।'

'বড় বিপদে ফেলে দিলেন,' সত্যি সত্যি লজ্জা পেয়ে গেল ও। 'শুনতেই হবে?'

'প্লীজ!' অনুনয় করল ক্যাপ্টেন।

'আমি মাসুদ রানা, বাংলাদেশী। একটা ছোটখাট গোয়েন্দা সংস্থা আছে আমার, এ দেশে তার শাখা আছে...'

'ব্যস্ ব্যস্!' চট্ করে একটা হাত তুলল সে, চোখ বুজে আছে। 'আর বলতে হবে না, বুঝে ফেলেছি। রানা এজেন্সি? সুইট মেরি!' চোখ গোল করে দেখতে লাগল ওকে। আবার অস্ফুটে বলল, 'সুইট মেরি!'

ঘরের মধ্যে আস্ত এক নাপাম বোমা পড়েছে যেন, কথা নেই কারও মুখে। বজ্রাহত হয়ে বসে আছে সবাই। চোখ কপালে তুলে ওকে দেখছে তো দেখছেই।

এত মানুষের একাগ্র মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে বেদম অস্বস্তিতে পড়ল রানা, তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কান লাল হয়ে উঠেছে লজ্জায়। পালাতে পারলে বাঁচে।

ডিটেকটিভ কোয়েল সচকিত হলো সবার আগে। দ্রুত কাছে চলে এল। 'কালকের দুর্ব্যবহারের জন্যে আমি খুব লজ্জিত, মিস্টার রানা!' বলল সে। 'সত্যি, খুবই দুঃখিত। ক্ষমা করে দেবেন, প্লীজ! আপনি না থাকলে কাল হয়তো কোর্টেজ

লোকটা মেরেই ফেলত আমাকে।'

'আমি কিছু মনে করিনি, অফিসার। শুধু শুধূ লজ্জা দিচ্ছেন,' চট করে উঠে পড়ল ও। পালাতে হয় এবার। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল। 'রিকির রেস্টের ব্যাপারটা...'

'কিচ্ছু ভাববেন না,' সে-ও আসন ছাড়ল। 'আমি কথা দিচ্ছি, কাল সকালে আমি নিজে গিয়ে ওকে ওর রেস্টের পজেশন বুঝিয়ে দেব। ভেতরে এইসব চলছে, আগে যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতাম...' থেমে রিকির দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল আফসোস প্রকাশের ভঙ্গিতে।

'ছেলেমানুষ!' সস্নেহে যুবকের কাঁধে এক হাত রাখল রানা, মৃদু ঝাঁকি দিল। 'মুখ খুলতে সাহস পায়নি। ওর ধারণা ছিল বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন। 'বুঝি। তবু, আমারই নাকের ডগায় এতবছর এমন এক অনাচার ঘটল, আমি কিছুই জানলাম না, ভাবতে বড় দুঃখ হচ্ছে। ওকে, রিকি বয়,' মুচকে হাসল সে। ইঙ্গিতে কার্লোকে দেখাল। 'উন্মাদ হয়ে গেলে তো গেল, তা না হলে তোমার মাকে হত্যার চার্জ ফ্রেম করতে যাচ্ছি আমি ওর বিরুদ্ধে।'

একটুপর, পুলিস হেডকোয়ার্টার্স থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা ও রিকি অস্টিন। জো আসছে পিছন পিছন। মার হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়তো হবে, সেই আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় নীরবে কাঁদছে রিকি।

হয়তো মনের ভাব বোঝাতেই চ্যাম্পের এক হাত শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছে ও।

* * *

সীমা লঙ্ঘন

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

এক

আম্মান এয়ারপোর্ট। সোমবার, রাত সাড়ে বারোটা।

ট্রাক থেকে নামিয়ে বিশাল কার্গোপ্লেন হারকিউলিসে বড় আকৃতির কন্টেইনার তোলা হচ্ছে। হারকিউলিসের এটা নিয়মিত সাপ্তাহিক ফ্লাইট, গন্তব্য তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা। রফতানিযোগ্য পণ্য তেমন কিছু নেই জর্দানের. বিভিন্ন দেশ থেকে সস্তায় কিনে এনে সেগুলোই অন্যান্য দেশে কিছু বেশি দামে বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা। আজকের ফ্লাইটে বাংলাদেশী কিছু পাটজাতদ্রব্য তুরস্কে পাঠাচ্ছে তারা।

ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার আগে ইসরায়েলি আকাশ পার হতে হবে পাইলটকে, আর সেই সুযোগটাই কাজে লাগাচ্ছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। ঢাকা থেকে আসা একটা কন্টেইনারে চটের ব্যাগ থাকার কথা, কিন্তু তা নেই, তার বদলে ভেতরে বসে আছে বিসিআই-এর তিনজন দুর্ধর্ষ এজেন্ট। ব্যাগ বের করে ভেতরে মানুষ ঢোকানো হয়েছে একটা অয়্যারহাউসে জর্দানী ইন্টেলিজেন্সের সহায়তায়।

বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান স্বয়ং ওদেরকে ব্রিফিং করেছেন। প্রথমেই তিনি জানিয়ে দেন, 'ধরে নিতে পারো এটা ওয়ান-ওয়ে-জার্নি। কে ফিরতে পারবে বলা যায় না। সেজন্যেই স্বেচ্ছাসেবক হতে বলা হচ্ছে তোমাদের।'

বিসিআই হেডকোয়ার্টারের সেই মীটিঙে উপস্থিত ছিল নয়জন এজেন্ট, সবাই তারা হাত তোলে। বাছাই করা হয় মাত্র দু'জনকে—মেজর শেখ শামিম আর মেজর সৈয়দ হাসান। মাসুদ রানাকে হাত তুলতে হয়নি, কারণ রাহাত খান আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ওর নেতৃত্বেই দলটাকে ইসরায়েলে পাঠানো হবে।

অ্যাসাইনমেন্টের নাম 'শান্তি মিশন'। মোট সদস্য সংখ্যা ছয়। বাকি তিনজনের নাম শাফি, নাসের আর রিয়াজ। জর্দান-ইসরায়েলি সীমান্তের কাছাকাছি ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু শিবিরে থাকে ওরা, প্রত্যেকে হিযবুল্লাহ মিলিশিয়া বাহিনীর সদস্য, প্যালেস্টাইনের নিঃশর্ত ও পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, ইসরায়েলের ভেতর তৎপর উগ্রপন্থী ফিলিস্তিনীদের গোপন সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুড-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। এদেরকে মিশনের সদস্য করা হয়েছে লেবানিজ ইন্টেলিজেন্স চীফ-এর সুপারিশে। সময়ের অভাবে বিসিআই এজেন্টরা এদের সম্পর্কে এখনও তেমন কিছু জানার সুযোগ পায়নি। একই কৌশলে হারকিউলিসে উঠবে তারা, কন্টেইনার থেকে বেরিয়ে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবে। পাইলট আর কো-পাইলট জর্দানী, মোটা টাকা পুরস্কার পাবে ওরা এ কাজের জন্যে। কার্গো প্লেন ভূমধ্যসাগরে পৌঁছুবার এক

কি আধ মিনিট আগে ইসরায়েলের উপকূল সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় প্যারাস্যুটের সাহায্যে নেমে যাবে মিশনের সদস্যরা। উপত্যকায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে মুসলিম ব্রাদারহুড-এর সদস্যদের রিসেপশন কমিটি।

তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে একজন জেলের কাছে। লোকটার নাম ফায়েদ। সে জানে ইসরায়েলের তিনটে সাবমেরিন কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। রানার নেতৃত্বে মিশনের কাজ হবে ওগুলোকে আগামী বুধবার দুপুরের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়া। তা না হলে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে যুদ্ধের আগুন।

আগুন নিয়ে এই ভয়াবহ খেলাটা শুরু করতে যাচ্ছে মোসাড, ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স।

ইসরায়েল সরকার আশা করেছিল, আনসকম-এর সাহায্যে আমেরিকা ও ব্রিটেন ইরাকের বায়োলজিকাল, কেমিকেল ও নিউক্লিয়ার স্থাপনাগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারবে। কিন্তু ইরাক জাতিসংঘের আদেশ অমান্য করে বাটলার সহ আনসকম-এর সব সদস্যকে দেশ থেকে বহিষ্কার করায় তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। আমেরিকা ও ব্রিটেন ইরাক আক্রমণ করলেও, তাতে সাদ্দামের তেমন ক্ষতি হয়নি, বিশ্ব জনমতেরও সমর্থন পাওয়া যায়নি। এরকম পরিস্থিতিতে ইসরায়েল সরকারকে এক ঢিলে একাধিক পাখি মারার একটা বুদ্ধি যোগায় মোসাড। সরল একটা প্ল্যান, সফল হলে ইসরায়েল তো বটেই, অস্ত্র প্রস্তুতকারক পশ্চিমা বিশ্বও যার-পর-নাই উপকৃত হবে।

ইরাকের কুর্দীপ্রধান এলাকায় ইসরায়েলের অনেক চর আছে, তারা কয়েকটা মোবাইল রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে সৌদি আরব আর কুয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে পনেরো দিন পর মধ্যরাতে। সেটা এমনভাবে প্রচার করা হবে, সবাই যাতে পরিষ্কার বুঝতে পারে যুদ্ধটা ইরাকই ঘোষণা করেছে। তার আগে, ওই দিনই দুপুর একটায়, ইসরায়েলের উপকূলে লুকিয়ে রাখা তিনটে সাবমেরিন রওনা হবে। গন্তব্য জানা যায়নি, শুধু জানা গেছে মাঝরাতে মোবাইল রেডিওতে ইরাকের নামে যুদ্ধ ঘোষণা করার পরপরই সাবমেরিনগুলো থেকে ঝাঁক ঝাঁক কনভেনশনাল ওঅরহেডসহ মিসাইল ছোঁড়া হবে। মিসাইলগুলো এমন এক দিক বা গতিপথ ধরে আসবে, সৌদি ও কুয়েতি রেডারে দেখা যাবে ইরাক থেকেই আসছে ওগুলো।

ওই দুই দেশের প্রতিক্রিয়া হবে তাৎক্ষণিক, তারাও আমেরিকার সাহায্য নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করবে ইরাককে। এভাবে একটা গোলমাল শুরু করে দেয়া গেলে সিরিয়া, জর্দান ও মিশর সহ অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলোও জড়িয়ে পড়বে যুদ্ধে। এক পর্যায়ে ফলাফল দাঁড়াবে, ইসরায়েলের চারপাশে শক্তিশালী প্রতিবেশী আর একটাও থাকবে না। ইতোমধ্যে যুদ্ধরত আরব দেশগুলোকে অস্ত্র আর গোলাবারুদ সরবরাহ করে কয়েক হাজার বিলিয়ন ডলার কামিয়ে নেবে আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ। অস্ত্র বিক্রির এই সুযোগ পাওয়ায় উন্নত বিশ্ব ইসরায়েলি ষড়যন্ত্র যদি ধরতেও পারে, টুঁ-শব্দটি করবে না, বরং মৌন সমর্থন জানাবে।

ইসরায়েলের পরম মিত্র আমেরিকা। মোসাড-এর সঙ্গে সিআইএ আর পেন্টাগনের গলায় গলায় ভাব। ঠিক অনুমোদন লাভের জন্যে নয়, বরং আনন্দটা

ভাগাভাগি করে উপভোগ করার ইচ্ছা থেকেই প্ল্যানটা সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়া হয় সিআইএ ও পেন্টাগনকে। ওই দুই প্রতিষ্ঠান নির্লিপ্ত থাকবে বলে কথা দেয়, তবে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে ব্যাপারটা অবহিত করে। হোয়াইট হাউস থেকে খবরটা লিক হয়নি, প্রেসিডেন্ট স্বয়ং তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে সতর্ক করে দেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইহুদি, তিনি কংগ্রেসের শক্তিশালী ইহুদি লবিকে এত বড় একটা সুখবর না জানিয়ে থাকতে পারেননি। ওই বিশেষ মহল বা গ্রুপটি অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠায় কংগ্রেস সদস্য মিস লরেলি ভ্যান্স কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এবং নানান কৌশলে মোসাডের গোটা প্ল্যানটা জেনে নেয়

খবরটা জেনে বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে লরেলি। ইরাকের কুয়েত আক্রমণ সে সমর্থন করেনি, তবে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড ভোগ করছে ইরাকের জনসাধারণ। তাছাড়া, শুধু অস্ত্র বিক্রির জন্যে দেশে দেশে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার ঘোর বিরোধী সে। চব্বিশ ঘণ্টা গুম মেরে থাকার পর স্যাটেলাইট টেলিফোনের মাধ্যমে লণ্ডনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাসুদ রানাকে তথ্যটা জানায় সে; জানতে চায়, এই অবস্থায় ওর কি করা উচিত বলে মনে করে ও।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে লরেলিকে কয়েকটা দিন চুপচাপ অপেক্ষা করতে বলে বিসিআই চীফ রাহাত খানকে সব জানিয়ে মেসেজ পাঠায় রানা। সংবাদটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেন বস্। রানাকে ডেকে পাঠান ঢাকায়।

রানা ঢাকায় পৌঁছার পর ছয়দিন পার হয়ে গেছে। কি ঘটছে জানে না ও, শুধু টের পাচ্ছে অত্যন্ত ব্যস্ত বিসিআই চীফ, মীটিঙের পর মীটিং হচ্ছে সাততলার অফিস রুমে, মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা দেশের রাষ্ট্রদূতের ব্যস্ত আনাগোনা হচ্ছে, ঝড়ের বেগে সাঙ্কেতিক মেসেজ আসছে-যাচ্ছে।

সোহেলের কাছ থেকেও তেমন কিছু জানা যাচ্ছে না। কাজেই এই কটা দিন চুটিয়ে আড্ডা মারল রানা অফিসের পুরনো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, নতুন যারা এসেছে তাদের বেঁধে নিল সখ্যতার বাঁধনে। অনেকদিন পর চা-নাস্তা-গুলতানিতে মেতে উঠল গোটা অফিস।

তারপর হঠাৎ রবিবার সকালে জরুরী মীটিং ডাকলেন রাহাত খান। ব্রিফিঙে তিনি যে সব তথ্য ও নির্দেশ দিলেন, শুনে রানা যেমন বিস্মিত হলো, তেমনি ভয় পেল

এই কদিন বিসিআই বসে ছিল না। সরেজমিনে খবর সংগ্রহ করার জন্য গত মঙ্গলবার একজন এজেন্টকে পাঠানো হয় ইসরায়েলে। সঙ্গে ছিল হিযবুল্লাহ গেরিলাদের একটা দল। প্রতি আট ঘণ্টা পরপর রেডিও মেসেজ পাঠাবার কথা ছিল। নিরাপদে নামার পর কোড-করা মেসেজ পাঠায় সে, কিন্তু তারপর হঠাৎ আর কোন খবর নেই। স্বভাবতই আশঙ্কা করা হয়, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে গেছে তারা। তারপর হঠাৎ কাল, অর্থাৎ শনিবার রাতে মুসলিম ব্রাদারহুড-এর একজন সদস্য একটা রেডিও মেসেজ পাঠায়, জানায় শেফাইম শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার পুবে পাহাড়ী একটা গ্রামে গোলাগুলি হয়েছে। তাতে মারা পড়েছে বেশ কিছু লোক। বিসিআই ঢাকা হেডকোয়ার্টার ধরে নেয় মিশনের সদস্যদের সঙ্গে ইসরায়েলি সৈন্যদের সংঘর্ষ হয়েছে। মেসেজটা কোড করা ছিল না। অপারেটরের

হাতে সময় হয়তো কম ছিল। তবে সন্দেহ করা হচ্ছে মুসলিম ব্রাদারহুডে মোসাডের চর ঢুকে পড়েছে।

কাঠের প্রকাণ্ড কন্টেইনারে কোন ফাঁক বা ফুটো নেই, ভেতর দিকটা ফোম দিয়ে মোড়া, বাতাসের অভাব মেটাচ্ছে অক্সিজেন সিলিন্ডার। কন্টেইনারের ভেতর একটা রেডিও আছে, পিঠে বইবার জন্যে স্ট্র্যাপ লাগানো। আর আছে পিতল দিয়ে মোড়া দুটো বাক্স। একটাতে আছে জেলিগনাইট বা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। দ্বিতীয়টায় প্রাইমার ও টাইম পেন্সিল। ছোট একটা চামড়ার ব্যাগে রয়েছে দশ হাজার মার্কিন ডলার, সবই বিশ ডলারের নোট। এই টাকা জেলে ফায়েদকে দিতে হবে।

প্রত্যেকের পিঠে প্যারাস্যুট প্যাক রয়েছে। হাতে উজি মেশিনগান। কন্টেইনার ভেঙে প্লেনের কার্গো হোল্ডে বেরুবার আগে টর্চ জ্বেলে তামার তার ভরা রশির দুটো কুণ্ডলী আর ব্যাগে রাখা ক্লাইম্বিং গিয়ার পরীক্ষা করল রানা। তারপর হ্যাভারস্যাকে আরও কয়েকটা গ্রেনেড ভরে নিল।

প্লেনের সাইড ডোর বন্ধ করে গ্রাউন্ড ক্রুরা মই বেয়ে নেমে যেতেই কন্ট্রোল কেবিন থেকে একটা বোতামে চাপ দিল পাইলট, কন্টেইনারের ভেতর একটা বেল বেজে উঠল। বেয়োনেট দিয়ে ফোম আর কাঠ কেটে কন্টেইনার থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

প্রথমে বেরুল মেজর শামিম। ছ'ফুট এক ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ছাতি, অসুরের শক্তি গায়ে, বয়স ছাব্বিশ। ঋজু হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে পাথুরে মূর্তির অটল দৃঢ়তা। হাতে ছুরি থাকলে ভোজবাজি দেখিয়ে দিতে পারে সে। এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট। কথা বলে কম, গম্ভীর স্বভাব।

তারপর বেরুল মেজর হাসান। এ-ও, শামীমের মতই, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে নতুন। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, হালকা-পাতলা কাঠামো, তবে পেশীবহুল শরীর, বয়স সাতাশ। এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট, গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নেয়া আছে। চেহারায় বেপরোয়া একটা ভাব, যেন কারও নির্দেশ মানতে রাজি নয়। ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপাত্মক ক্ষীণ হাসি লেগে থাকে সব সময়।

কন্টেইনারের ভেতর থেকে ওদেরকে কাভার দিচ্ছিল রানা। প্লেনে মোসাড কোন ফাঁদ পেতে রাখতে পারে, সেজন্যেই ওর এই অতিরিক্ত সাবধানতা। ঢাকা থেকে বলা হয়েছে, সম্ভবত মুসলিম ব্রাদারহুড পেনিট্রেট করেছে মোসাড। কিন্তু হিযবুল্লাহ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

সময়ের অভাবে হিযবুল্লাহ গেরিলা শাফি, নাসের আর রিয়াজের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি ওদের। তবে ওদের ফটো দেখেছে, জানে, পরিচয় দেয়ার সময় কি কোড ওয়ার্ড উচ্চারণ করবে। চিহ্নিত একটা কন্টেইনারে আছে ওরা, তবে ওদের কন্টেইনারে রিমোট কন্ট্রোল অ্যালার্ম সিস্টেম নেই। সাঙ্কেতিক টোকা না শোনা পর্যন্ত কন্টেইনার ভেঙে বাইরে বেরুবে না ওরা।

ইঙ্গিতে শামিম আর হাসানকে পজিশন নিতে বলল রানা। লাল রঙে ছাতা আঁকা রয়েছে একটা কন্টেইনারে, সেটার দু'পাশে অস্ত্র বাগিয়ে দাঁড়াল ওরা। সাঙ্কেতিক টোকা দিল রানা : ঠক-ঠক, ঠক, ঠক-ঠক-ঠক

পিঠে প্যারাস্যুট প্যাক, হাতে অস্ত্র, কন্টেইনার ভেঙে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে ওরা।

'একজন একজন করে,' শান্ত, ঠাণ্ডা সুরে নির্দেশ দিল রানা। 'প্রত্যেকের আইডি চেক করব আমি। তারপর কোড ওয়ার্ড শুনব। আমি মাসুদ রানা।'

প্রথমে বেরুল সুদর্শন এক যুবক। 'আমি শাফি।' বুক পকেট থেকে আইডি কার্ড বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল। রানা সেটা পরীক্ষা করছে, আবার বলল, 'আমার কোড ওয়ার্ড পীস টক। জ্বী, আমাকে বলা হয়েছে এই অ্যাসাইনমেন্টে মাসুদ রানাই আমাদের লীডার।'

আইডি কার্ডে শাফির ছবি আছে, কোড ওয়ার্ডও নির্ভুল উচ্চারণ করেছে সে। 'তুমি এই মিশনে কি কাজে লাগবে, শাফি?' হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, ঠোঁটে হাসি। শাফির বয়েস হবে বড়জোর পঁচিশ।

'ইসরায়েলি উপকূলে আমি কাজ করেছি, গোটা এলাকা আমার চেনা,' জবাব দিল শাফি।

'কাজ করেছ মানে?'

'আমাকে স্মাগলারও বলতে পারেন, মুসলিম ব্রাদারহুডকে মাঝে মধ্যে গোলাবারুদ সাপ্লাই দিই। সাইপ্রাস থেকে মদ আনি...'

তাকে একপাশে সরে দাঁড়াবার ইঙ্গিত দিল রানা। কন্টেইনার থেকে বেরিয়ে এল দ্বিতীয়জন। 'আমি নাসের।' ফর্সা, দীর্ঘদেহী, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বয়েস ত্রিশের কোঠায়। 'আমার কোড ওয়ার্ড–পীস কমিটি। আপনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলে মনে করছি, মেজর রানা।'

'ধন্যবাদ।' আইডি থেকে চোখ তুলে তাকাল রানা, চোখে প্রশ্ন।

'আমি জেরুজালেমেই ছিলাম,' বলল নাসের। 'পরিবারের সবাইকে রেখে অক্সফোর্ডে পলিটিকাল সায়েন্স পড়তে যাই। ওখানেই বিয়ে করি, তারপর বউকে নিয়ে জেরুজালেমে ফিরে আসি। ফেরার পর জানতে পারি পশ্চিম তীরে নেতানেয়াহু সরকার ইহুদিদের জন্যে নতুন বসতি তৈরি করার জন্যে আরও অনেক মুসলমান পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারকেও এলাকা থেকে উচ্ছেদ করেছে। উচ্ছেদের সময় অনেকে বাধা দেয়, তাদের মধ্যে আমার দুই ভাই আর বাবাও ছিলেন। তিনজনকেই ইসরায়েলি মিলিটারি গুলি করে মেরে ফেলে। আমাকেও গ্রেফতার করা হবে শুনে বউকে নিয়ে পালিয়ে আসি হাইফায়। পুলিসের তাড়া খেয়ে পালাবার সময় বউকে হারিয়ে ফেলি। এক পর্যায়ে মুসলিম ব্রাদারহুডের সাহায্য চাই। ওরা আমাকে সীমান্ত পেরুতে সাহায্য করে। জর্দানে এসে হিযবুল্লাহ গেরিলা দলে যোগ দিই। হিযবুল্লাহ আর ব্রাদারহুডের মধ্যে লিয়াজোঁ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।'

'আপনার স্ত্রীর কোনও খবর?'

'শুধু জানি সীমান্ত পেরিয়ে জর্দানে আমার কাছে আসার চেষ্টা করছে লায়লা। ব্রাদারহুডের লোকজন আমাকে জানিয়েছে, ও তাদের ইনফর্মার হিসেবে কাজ করছে।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে নাসের জানতে চাইল, 'আপনারা হিব্রু জানেন কি?'

মিথ্যে কথা বলার সময় রানার চোখের পাতা একটুও কাঁপল না। 'না।'

'আপনারা কেউই হিব্রু জানেন না?' নাসের বিস্মিত, উদ্বিগ্নও বটে। 'ইসরায়েলি সেনা ও নৌ-বাহিনীর বেশিরভাগ সদস্য নিজেদের মধ্যে হিব্রু ভাষায় কথাবার্তা বলে।

'প্রয়োজন হলে আপনারা কথা বলবেন,' বলল রানা। ব্রিফিঙের সময় রাহাত খান বার বার সাবধান করে দিয়েছেন, কাউকে বিশ্বাস করবে না।

'শাফি গাইড, নাসের লিয়াজোঁ অফিসার, আর তুমি?' তৃতীয় লোকটা, অর্থাৎ রিয়াজ, কন্টেইনার থেকে বেরিয়ে আসতে জিজ্ঞেস করল রানা। তার আইডি কার্ড যথেষ্ট সময় নিয়ে পরীক্ষা করল ও। তারপর চোখ তুলে খুঁটিয়ে দেখল রিয়াজকে। শামিমের মতই বিশালদেহী সে, হাতগুলো অস্বাভাবিক লম্বা আর পেশল। বয়েস হবে বাইশ কি তেইশ।

'আমার পাস ওয়ার্ড প্রমিজড ল্যান্ড। মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য, রেডিও অপারেটর হিসেবে কাজ করেছি।' কন্টেইনারের ভেতর থেকে বড় আকৃতির একটা সুটকেস বের করল সে 'এতে কয়েক প্রস্থ ইসরায়েলি সেনা ও নৌ-বাহিনীর ইউনিফর্ম আছে, প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা যাবে।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আর তিন মিনিট পর পাইলট এঞ্জিন স্টার্ট দেবে। আকাশে ওঠার পর ইসরায়েলি উপকূলে পৌঁছুতে বিশ মিনিটও লাগবে না। সবাই এখুনি তৈরি হয়ে নিন। পাস ওয়ার্ড—ইস্রাফিল ও আফলাতুন।'

'ইয়েস, স্যার!' রানাকে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালুট করল রিয়াজ।

তুমুল বৃষ্টির মধ্যে প্লেন থেকে লাফ দিয়েছে ওরা। প্রকাণ্ড ভেজা একটা হাতুড়ির মত রানাকে আঘাত করল জমিন। শরীরটা গড়িয়ে দেয়ার সময় চোখে প্রায় ছোবল মারল টর্চের আলো। একটা পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেলো, ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল মাথা। প্যারাস্যুট খুলে মুক্ত করল নিজেকে, চারদিকে এখন জমাট অন্ধকার। উজি মেশিনগানটা বাগিয়ে ধরে সেফটি ক্যাচ অফ করল, মাটির সঙ্গে লেপ্টে লম্বা হয়ে আছে, কোণঠাসা পশুর মত প্রতিটি পেশী টান টান। এক মুহূর্ত শুধু বাতাসের গোঙানি আর বৃষ্টির আওয়াজ শোনা গেল, মুখের একপাশের চামড়ায় খোঁচা দিচ্ছে কাঁকর। তারপর কাছ থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'ইস্রাফিল।'

'আফলাতুন,' বলল রানা।

অকস্মাৎ হৈ-চৈ করে উঠল একসঙ্গে বহু লোক, পাঁচ-সাতটা টর্চের আলো পড়ল চোখে। উজির ব্যারেল নিচু করল রানা। কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল আরবীতে, 'বেদখল প্যালেস্টাইনের পুণ্যভূমিতে স্বাগতম! মুসলিম ব্রাদারহুড জিন্দাবাদ! হিযবুল্লাহ জিন্দাবাদ! স্বাগতম! স্বাগতম! মান্যবর লীডার, আমাদের সবার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন!'

প্রয়োজন নেই, তবু কয়েক জোড়া হাত উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ওকে। 'বাকি সবাই কোথায়?' জানতে চাইল ও।

'সবাই নিরাপদে নেমেছে।' রানার হাতে একটা ফ্লাস্ক ধরিয়ে দেয়া হলো। 'কফি পান করুন। ইহুদি মৌলবাদ নিপাত যাক!' ফ্লাস্ক খুলে দুই ঢোক কফি খেলো রানা। ঠাণ্ডা আর বৃষ্টির মধ্যে গরম হয়ে উঠল শরীর। আশপাশের লোকজন সিগারেট ধরাচ্ছে। গাঢ় একটা মূর্তি উদয় হলো ওর পাশে, এক মুহূর্ত পর আরেকটা।

হাসানের গলা পেল রানা, 'এ কোথায় এসে পড়লাম, মাসুদ ভাই? এরা এত হৈ-চৈ করছে কেন?'

'আমরা কি সবাই এখানে আছি?' জিজ্ঞেস করল রানা। কেউ একজন জবাব দিল, আছি। সব মিলিয়ে অনেক বেশি মানুষ, বড় বেশি শোরগোল, শৃঙ্খলা বা সাবধানতা একেবারেই অনুপস্থিত। 'নাসের?'

'ইয়েস, মি. রানা!'

'রিসেপশন কমিটির লোকদের চুপ করতে বলুন। রিয়াজকে সুটকেসটা আনতে বলুন ফায়েদ কোথায়?'

আরবীতে ফিসফাস কথাবার্তা হলো। নাসের চাপা গলায় অসন্তোষ প্রকাশ করল। 'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল রানা।

'নেতানায়া, উপকূল শহরে আটকা পড়েছে ফায়েদ,' জবাব দিল নাসের। 'গত হপ্তায় আপনাদের এক অফিসারের নেতৃত্বে হিযবুল্লাহদের একটা দল প্যারাস্যুট নিয়ে এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে নামে, তাদের সঙ্গে ইসরায়েলি সৈন্যদের গোলাগুলি হয়েছে। ইসরায়েলিরা কড়া পাহারা বসিয়েছে চারদিকে। ওরা খুব নার্ভাস।'

রানা ভাবল, দলটা তাহলে এখনও ধরা পড়েনি। 'হতাহত?'

'কেউ কিছু বলতে পারছে না।'

'ফায়েদের কাছে যাবার কি ব্যবস্থা?' জানতে চাইল রানা। রিয়াজ তার সুটকেস খুলে দিতেই ব্যস্ত হাতে ইসরায়েল সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরতে শুরু করল রানা, শামিম ও হাসান।

'নেতানায়া শহরটা পরবর্তী উপত্যকায়। ট্রাক এলে আমরাই নিয়ে যাব আপনাদের,' বলল নাসের। 'রিসেপশন কমিটির লোকজন বলছে, ট্র্যান্সপোর্ট নিয়ে খানিকটা জটিলতা দেখা দিয়েছে। তবে, ট্রাক একটা আসবে। আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, ব্রাদারহুডের এরা প্রফেশন্যাল নয়, আবেগতাড়িত আনাড়ী...'

'ওদেরকে শান্ত হতে বলুন, আর জিজ্ঞেস করুন ট্রাক আসতে কতক্ষণ লাগবে।'

আবার আরবীতে কথা বলল নাসের। 'ওরা অপেক্ষা করতে বলছে, মি. রানা। নেতানায়া এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। পথে মিলিটারি হয়তো টহল দিচ্ছে। ওরা পাহাড়ী একটা গুহা চেনে, জায়গাটা শুকনো। ইসরায়েলি সৈন্যরা ওদিকে যায় না। ওরা বলছে অপেক্ষা করার জন্যে ওই গুহা নিরাপদ। ট্রাকটা আমাদের নিতে আসবে এক কি দু'ঘণ্টার মধ্যে।'

হাতঘড়ির ভেজা ডায়ালে চোখ রাখল রানা। সোমবার, রাত দেড়টা। বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের মাথায় অপেক্ষা করতে বলা হচ্ছে, অথচ বুধবার দুপুর একটায় রওনা হয়ে যাবে ইসরায়েলি সাবমেরিন। 'গুহাটা কোথায়?'

শাফি জবাব দিল, 'আমি চিনি।'

দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। ধৈর্য ধরতে হবে। 'চলো তাহলে।' তারপর নির্দেশ দিল, 'আমাদের ছাড়া কাপড়চোপড় সুটকেসে ভরতে বলুন।'

মেজর শামিম পাশে এসে দাঁড়াল। 'লক্ষণ ভাল নয়,' বিড়বিড় করল সে। 'এত

লোকের কোন প্রয়োজনই ছিল না, মাসুদ ভাই। মিশন গোপন রাখা অসম্ভব।'

'নাসের,' বলল রানা। 'ওদেরকে চুপ করতে বলুন।'

কঠিন ভাষায় ধমক দিল নাসের। লোকজন চুপ মেরে গেল। বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে শুরু করল সবাই। সবার আগে রয়েছে শাফি, বড় সুটকেস আকৃতির অসংখ্য বোল্ডারের মাঝখান দিয়ে পথ করে এগোচ্ছে সে। পাথরগুলো পাহাড়ের গা থেকে খসে পড়েছে। ওরা যে ম্যাপ দেখে এসেছে, সেটা নির্ভুল ছিল—পাহাড়ের ঢালগুলো এত খাড়া নয় যে প্রাচীর বলা যাবে। পিছন থেকে নাসেরের উত্তেজিত গলা পাচ্ছে রানা, আঞ্চলিক আরবী ভাষায় কার সঙ্গে যেন তর্ক করছে। এত দ্রুত, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। নাসেরকে নিয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করল ও। শত্রু এলাকায় বেঁচে থাকতে হলে প্রথম শর্ত শান্ত থাকা। নাসের ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে আছে। পিছন ফিরে নরম সুরে বলল, 'শাট আপ।'

চুপ করে গেল নাসের। মিছিলটাও শান্ত হয়ে গেল।

'ওর রাগের কারণটা কিছু বুঝতে পারলে?' হাসানকে প্রশ্ন করল রানা।

'কার যেন আসার কথা ছিল, কিন্তু আসেনি।'

দশ মিনিট পর উপত্যকার মেঝে সরু হয়ে একশো গজে দাঁড়াল, ঢাল অদৃশ্য হয়েছে, তার বদলে খাড়া পাহাড়-প্রাচীর দেখা যাচ্ছে। পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায় মাইন বা বিস্ফোরক ফাটিয়ে গভীর গর্ত তৈরি করা হয়েছে, আলকাতরার মত কালো ছায়ায় লুকানো। 'এখানে,' অন্ধকার থেকে শাফির গলা ভেসে এল। কেউ একজন টর্চের আলো ফেলায় গর্তটার মুখ দেখা গেল।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল শামিম। 'বিপজ্জনক জায়গা,' বলল সে। গর্ত বা গুহা থেকে শুধু উপত্যকায় বেরুনো যায়, অন্য কোন পথ নেই। আর উপত্যকাটাকে গভীর খাদ বলাই ভাল। শামিমের সঙ্গে রানাও একমত—জায়গাটা একটা ফাঁদ হয়ে উঠতে পারে।

'নাসের,' ঘাড় না ফিরিয়েই ডাকল ও। 'কমিটির লোকদের বলুন এই জায়গা নিরাপদ নয়।'

নাসের কথা বলছে না।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'নাসের, ওদেরকে বলুন...' থেমে গেল ও। কমিটির কোন লোকজনকে দেখা যাচ্ছে না। ধূসর পাথরের গায়ে নিঃসঙ্গ একটা গাঢ় মূর্তি নাসের।

'ওরা চলে গেছে,' বলল সে।

'চলে গেছে?'

'দেখতে গেছে ট্রাকটা আসছে কিনা। তাছাড়া, ওদের সঙ্গে আরেকজনের থাকার কথা ছিল, সে না আসায় আমি ধমক দিয়েছি, তাই...'

'থামুন!' চাপা গলায় ধমক দিল শামিম।

কেউ যেন বোতাম টিপে নাসেরের মুখ বন্ধ করে দিল। শামিম আর হাসানকে রানা বলল, 'এখন আর প্ল্যান বদল করা সম্ভব নয়। ট্রাকটা আমাদের দরকার। এই জায়গা ছেড়ে সরে গেলে ওরা আমাদের খুঁজে পাবে না। কাভার নাও।'

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল শামিম ও হাসান। গুহার ভেতর নয়, পজিশন নিচ্ছে বোল্ডারের আড়ালে।

রাতটা নিস্তব্ধ হয়ে এল। বৃষ্টি প্রায় ছেড়ে গেছে, তবে বাতাসের হাহাকার থামেনি। নতুন একটা আওয়াজ ঢুকল কানে। গুহার ভেতর থেকে আসছে। ব্যা-ব্যা করছে কয়েকটা ছাগল, গলার ঘণ্টাগুলো বেজে উঠছে মাঝে মধ্যে।

চিন্তা করছে রানা। আয়োজনে মারাত্মক ত্রুটি রয়ে গেছে। মুসলিম ব্রাদারহুড এতটা বিশৃঙ্খল, কল্পনাও করা যায় না। তাছাড়া, মেজর নাহিদের নেতৃত্বে প্রথম মিশন এদিকের পরিবেশ আগে থেকেই উত্তপ্ত তন্দুর করে রেখেছে। ইসরায়েলি সৈন্যরা এখন যদি উপত্যকায় উঠে আসে, পালাবার কোন পথ নেই ওদের।

আবার বৃষ্টি শুরু হলো। কান পাতল রানা। হু-হু বাতাস বইছে। ছাগলের গলায় টুং-টুং ঘণ্টা বাজছে। আরেকটা আওয়াজ! যান্ত্রিক, তবে মোটরের নয়। ঘষা খাওয়ার শব্দ, ক্যাঁচক্যাঁচ করছে। কাঁকরের ওপর চাকা গড়ানোর আওয়াজ। একটা সাইকেল আসছে।

অন্ধকারে দু'চাকার বাহনটাকে কেউ ওরা দেখতে পাচ্ছে না। শুধু শব্দ শুনে শামিম বুঝতে পারল, তাকে পাশ কাটাচ্ছে ওটা। আড়াল থেকে বেরিয়ে ঝাঁপ দিল সে। ভারী বস্তার মত পড়ে গেল কেউ। ছিটকে পড়ল সাইকেল। পিছনের চাকা শূন্যে ঘুরছে, ধীরে সে আওয়াজও থেমে গেল। অন্ধকারে একটা ঘুঘু ডেকে উঠল। কি আশ্চর্য, ভাবল রানা, পাহাড়ের ওপর এই বৃষ্টির মধ্যে ঘুঘু আসে কোত্থেকে?

রানার বাম কাঁধের কাছে প্রকাণ্ড কিছু একটা নড়ে উঠল। শামিম। 'এটা পেলাম,' বলে দু'হাতে ধরা ভারী কিছু রানার সামনে পাথুরে মাটিতে ফেলে দিল সে। ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল, আবার ঘুঘুর ডাক নকল করল কেউ, এটা অন্য রকম সুরে।

শামিম বস্তা নয়, একটা মানুষ ফেলেছে। ব্যথা পেয়ে গোঙাচ্ছে সে। উজির মাজলটা তার কানে ঠেকাল রানা। 'চুপ!'

মাটিতে পড়া মানুষটা চুপ করে গেল।

রানা জানতে চাইল, 'কে তুমি? এখানে কি করছ?'

উজির ব্যারেলটা ঠেলে সরিয়ে দিল মানুষটা। একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল, 'নাসের!'

'ও আল্লাহ!' প্রায় আঁতকে উঠল রানা। সাইকেলে চড়ে কোন পুরুষ নয়, একটা মেয়ে এসেছে।

উঠে বসতে গিয়ে বাধা পাওয়ায় হাত চালাল মেয়েটা। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, কনুইয়ের গুঁতো আর ঘুসি একহাতে সামাল দিতে হিমশিম খেয়ে গেল রানা। 'খবরদার, গায়ে হাত দেবেন না!' হিসহিস করে বলল মেয়েটা।

বৃষ্টির মধ্যে নাসেরের গলা ভেসে এল, 'সত্যি তুমি? লায়লা?' বুটের শব্দ ছুটে আসছে।

'ওহ্, নাসের!' এক লাফে সিধে হলো মেয়েটা, পরমুহূর্তে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা।

লায়লা ফোঁপাচ্ছে। নাসেরের চোখেও পানি, কিন্তু অন্ধকারে তা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। স্ত্রীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সে, রানাকে বলল, 'আমার আপনজন

বলতে এই একজনই বেঁচে আছে। এ আমার স্ত্রী, লায়লা...'

'একেই আপনি খুঁজছিলেন?'

'হ্যাঁ। লায়লা পৌঁছে গেছে, কাজেই এখন আর কোন চিন্তা নেই। এলাকার মুসলমানদের সবাইকে চেনে ও। আমরা ভাগ্যবান, ও আমাদেরকে খুঁজে পেয়েছে।' ফিসফাস শুরু করল ওরা দু'জন। অধৈর্য হয়ে উঠল রানা, তা সত্ত্বেও অপেক্ষা করছে।

'নতুন কোন তথ্য?' এক মিনিট পর জানতে চাইল।

'লায়লা বলছে ষাটজন ইসরায়েলি সৈন্য উপত্যকায় উঠে আসছে।'

'তিনটে ট্রাক,' বলল লায়লা। 'শেফাইমের পুব প্রান্তে রিসেপশন কমিটির দু'জনকে ধরেছে ওরা, প্যারাস্যুট সহ।'

'কতক্ষণ আগে?'

'আধ ঘণ্টা। বাকি সবাই পালাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা। ওরা আপনাদেরকে সাবধান করে দিতে বলল।'

রানার তলপেটে শিরশিরে অনুভূতি হলো। মাত্র এক ঘণ্টা হলো ইসরায়েলে নেমেছে ওরা, এরইমধ্যে ভেস্তে যেতে বসেছে অপারেশন। চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিল ও। 'শাফি?'

অন্ধকার থেকে পাশে এসে দাঁড়াল শাফি। এক সেকেন্ডের জন্যে টর্চ জ্বালল। 'লায়লা। কেমন আছ?' মেয়েটাকে দেখে এতটুকু অবাক হয়নি সে।

'ভাল, শাফি।'

পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা। শুনে শাফি বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সৈকতে পৌঁছানো উচিত আমাদের। জেলে নৌকা নিয়ে পালাতে হবে। অপারেশন কেঁচে গেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রাণ বাঁচানোটাই ফরজ কাজ।'

রানা কল্পনার চোখে দেখতে পেল কুয়েত আর সৌদি শহরগুলোয় ঝাঁক ঝাঁক ইসরায়েলি মিসাইল আঘাত করছে। এয়ারপোর্ট, সেনাছাউনি, হাসপাতাল, এতিমখানা দাউ দাউ করে জ্বলছে। কুয়েতে জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশী সেনাবাহিনীর অনেক সৈন্য আছে, তাদের কি অবস্থা হবে বলা কঠিন। তবে ইরাক আক্রমণকারী, এই অজুহাতে কুয়েতে মোতায়েন করা আমেরিকান সৈন্যরা অবশ্যই ইরাকে ঢুকে পড়বে। একই সঙ্গে শুরু হবে বিমান হামলা। চব্বিশ ঘণ্টাও পেরুবে না, গোটা মধ্যপ্রাচ্য রক্তাক্ত রণাঙ্গন হয়ে উঠবে। ও জানতে চাইল, 'অন্য কোন উপায় নেই?'

'নাহ্,' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল শাফি। 'নিমাক-এর কথা আমি ধরছি না।'

'কি সেটা?'

'কিছু না। পাহাড়ী একটা পথ, শুধু ছাগল আসা-যাওয়া করে। উপত্যকার তলা থেকে পাহাড় পেঁচিয়ে উঠেছে। সে বহুকাল আগের কথা, তীর্থযাত্রীরা প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে ওই পথে আসা-যাওয়া করত, তারপর এক সময় ডাকাতরা ওই পথে পালাত। অত্যন্ত বিপজ্জনক পথ। ভুলেও আজকাল কেউ ব্যবহার করে না। ডাকাতদের হাতে যত লোক খুন হয়েছে, ওই পথ থেকে খাদে পড়ে তারচেয়ে বেশি

লোক মারা গেছে।'

'কোনদিকে ওটা?'

অন্ধকার আকাশের গায়ে শাফিকে কাঁধ ঝাঁকাতে দেখা গেল। ওপর দিকে আঙুল খাড়া করল সে। 'পাহাড়ের শিরদাঁড়ায়। উপত্যকার এখান থেকে তিনশো মিটার ওপরে। পাহাড়-প্রাচীরের মাথায়। কয়েকটা বাঁক ঘুরে নেতানায়ার দিকে নেমেছে। নেতানায়ায় তীর্থযাত্রীদের জন্যে একটা সরাইখানা আছে। কিন্তু উপত্যকার গোড়ায় নামা সম্ভব নয়, স্যার।'

'কেন?'

'ওখানে ইসরায়েলি সৈন্য গিজগিজ করছে...'

'আমরা পাহাড়-প্রাচীর বেয়ে ওপরে উঠব,' এমন শান্ত সুরে বলল রানা, যেন পার্কে হাঁটার প্রস্তাব দিচ্ছে।

এক সেকেন্ড পর মুখ খুলল শাফি, 'নিমাক-এ পৌঁছানোর জন্যে? তা সম্ভব নয়, স্যার।'

'যেহেতু প্রয়োজন, অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে।'

রানার দৃঢ়, ঠাণ্ডা সুর এক মুহূর্ত চুপ করিয়ে রাখল শাফিকে। তারপর সে মাথা নেড়ে বলল, 'আপনি বুঝতে পারছেন না, স্যার। এদিকের পাহাড় বেয়ে ওপরে ওঠা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।'

'তোমার মত ইসরায়েলি সৈন্যরাও তাই ভাববে। হাসান?'

একটা বোল্ডারে বসে আছে হাসান। সে জানে রানা কি বলতে যাচ্ছে। নার্ভাস ফিল করছে সে। 'বলো, মাসুদ ভাই।'

'সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করো। শামিম আর আমি পাহাড়ের মাথায় উঠে তোমাদের জন্যে একটা রশি নামাব। তোমাকে দেখতে হবে, সবাই যেন ওঠে।'

মাথার হেলমেট পিছনে ঠেলে দিয়ে ওপর দিকে তাকাল হাসান। হঠাৎ মনে হলো যেন একটা টানেলে রয়েছে। তারপর, অনেক উঁচুতে, সচল মেঘ দেখা গেল, ফলে নিরেট ও গম্ভীরদর্শন একজোড়া পাহাড়-প্রাচীরের মাঝখানে ফিতের মত সরু এক ফালি আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠল। উপত্যকায় তীব্র বাতাস বইছে। ট্রাকের কোন আওয়াজ আসছে না। দীর্ঘকায় গাঢ় কাঠামো, রানা, তারে জড়ানো রশির একটা মস্ত কুণ্ডলী কাঁধে ফেলে পাহাড়-প্রাচীরের দিকে হাঁটছে। দ্রুত, সাবধানে, নাসের আর লায়লাকে কাছে ডেকে নিল হাসান; রেডিও অপারেটর রিয়াজ আর শাফিকে নির্দেশ দিল রসদ-পত্র সব এক জায়গায় জড়ো করতে হবে। সতর্ক করে দিল, রেডিও আর বিস্ফোরকের বাক্স দুটোর কথা যেন না ভোলে।

নিরেট পাথরের গায়ে শামিম আর রানা যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। মাথায় ঝিরঝিরে বৃষ্টি নিয়ে পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায় বসে থাকল ওরা। ওপর থেকে মাঝে মধ্যে ফিসফাস কথাবার্তা আর স্পাইকে হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজ ভেসে আসছে, পেরেক লাগানো বুট ঘষা খাচ্ছে পাথরে। শব্দগুলো দ্রুত ওপরে উঠে যাচ্ছে।

কান পেতে আছে হাসান। এটা একটা বিপজ্জনক মুহূর্ত। এখন যদি কোন হামলা আসে, দলটা দু'ভাগ হয়ে যাবে। দাঁড়াল সে, উজির সেফটি ক্যাচ অফ করে উপত্যকার মেঝে ধরে পঞ্চাশ গজের মত হেঁটে গেল। একজনের অন্তত পাহারায়

থাকা উচিত। আর উপত্যকার মেঝেতে হাসান শুধু হাসানকেই বিশ্বাস করতে রাজি।

কপালে অচেনা, বিশৃঙ্খল, আবেগতাড়িত সঙ্গী-সাথী জুটলে কি ঘটে?

কি আবার, বিপদ। কাজেই ষাটজন ইসরায়েলি সৈন্য সত্যি আসছে কিনা দেখার জন্যে তৈরি থাকতে হবে তাকে।

খাড়া প্রাচীর, ভেজা ও পিচ্ছিল, তা-ও চোখে প্রায় দেখাই যায় না। মসৃণ পাথরের গায়ে নগ্ন আঙুল আর বুট পরা পা বুলিয়ে খুঁজে নিতে হচ্ছে ফাটল, ফাঁক বা গর্ত। চুলের মত সরু ফাটলে স্পাইক ঢোকাতে হচ্ছে, আধ ইঞ্চি বা তারও কম চওড়া খাঁজে বুটের ডগা ঠেকিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায়। শীত আর বৃষ্টির মধ্যেও ঘেমে গোসল হয়ে যাচ্ছে রানা।

পঞ্চাশ ফুট ওঠার আগেই দুই হাতের সবগুলো নখ ভেঙে গেল। তিন ট্রাক ইসরায়েলি সৈন্য এদিকে আসছে, নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দেয়ায় কোন ব্যথা অনুভব করছে না। খানিক পর একটা চিমনি পেয়ে গেল ও।

চিমনি বলতে পাহাড়ের গায়ে পাথরের প্রকাণ্ড এক বাড়তি টুকরোর কিনারা, কয়েকশো বছরের মধ্যে পাহাড়-প্রাচীরের গা থেকে নিচের খাদে নিঃশেষে খসে পড়বে। এখানে রশি আটকাল রানা, নিচে শামিমের উদ্দেশে ডাক দিল, তারপর চিমনিটা ধরে এত দ্রুত উঠতে শুরু করল যেন সিঁড়ি ভাঙছে।

প্রথম ত্রিশ ফুট খাড়া, তারপর বাম দিকে বাঁকা হতে শুরু করল চিমনি। বাধাটা অকস্মাৎ চোখে পড়ল, বিশাল একটা বোল্ডার পাহাড়-প্রাচীরের গা বেয়ে গড়িয়ে নেমেছে, পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে চিমনিটা। বোল্ডারটা চিমনিতে আটকে যাওয়ায় সমতল একটা মেঝে তৈরি হয়েছে, দু'পাশ থেকে পাথুরে অবলম্বন আলিঙ্গন করে আছে মেঝেটাকে, উপত্যকা থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। স্বপ্নেও ভাবেনি রানা এরকম একটা নিরাপদ জায়গা পাওয়া যাবে। পঞ্চাশজন লোক অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারবে এখানে, উপত্যকা চষে ফেললেও তাদের অস্তিত্ব টের পাবে না ইসরায়েলি সৈন্য। পাহাড়-প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে তারা ধরে নেবে চূড়ায় উঠে অপরপ্রান্তের ঢাল বেয়ে সৈকতে নেমে গেছে ওরা, জেলেদের নৌকো নিয়ে পালিয়ে গেছে।

রশি বেয়ে প্রথমে উঠে এল শাফি। ভারী, চৌকো রেডিও প্যাকটা নিয়ে এল সে। কয়েক মুহূর্ত পর শামিম পৌঁছুল, কাঁধে রশির দ্বিতীয় কুণ্ডলী। রিপোর্ট করল, 'চিমনির গোড়ায় সবাই পৌঁছে গেছে, রসদ সহ।'

'গুড,' বলল রানা। রশিটা বাঁধল, অপরপ্রান্তটা ফেলে দিল নিচে।

নিচের দিকে এখন একজোড়া রশি ঝুলছে, ফলে খুব দ্রুত উঠে আসছে বাকি সবাই। রিয়াজ পৌঁছুল হাঁপাতে হাঁপাতে, ভয়ে শুকিয়ে গেছে চেহারা, স্ট্র হ্যাটটা ভুরুর কাছে নেমে এসেছে। অনেকক্ষণ হলো দ্বিতীয় রশি ধরে কেউ উঠছে না। 'মেয়েটা, লায়লা না কি যেন নাম,' বলল শামিম। 'হাতে জোর নেই।' রশির দিকে ঝুঁকে পড়ায় আকাশের গায়ে তার বিশাল পিঠ দেখতে পাচ্ছে রানা। মেয়েটা অসম্ভব লম্বা-চওড়া, দেড় মণের কম হবে না। কিন্তু শামিম তাকে ধরে এমন ভঙ্গিতে তুলে আনল, মেয়েটা যেন তুলো দিয়ে তৈরি একটা পুতুল।

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করল লায়লা, গরম কাপড়ের ওপর জড়ানো কম্বলের মত মোটা চাদরটা দিয়ে শরীরটা ভাল করে ঢেকে নিচ্ছে।

শামিমের চওড়া গোঁফের নিচে সাদা দাঁত দেখা গেল। 'ইউ আর ওয়েলকাম।' কে বলবে এই লায়লাকেই ভারী বস্তার মত কাঁকরের ওপর ছুঁড়ে ফেলেছিল সে।

এরপর উঠল নাসের। এত ক্লান্ত যে অভিযোগ করার দম নেই। তবে লায়লাকে খুঁজে নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল। সামান্য হলেও উদ্বিগ্ন বোধ করল রানা। স্ত্রীকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে নাসের, অথচ অপারেশনটাই তার প্রথম গুরুত্ব হওয়া উচিত। মেয়েটা সম্পর্কে কিছুই রানার জানা নেই। নাসের সম্পর্কেও খুব কম জানে ও। মূল্যবান একটা তথ্য দিয়ে, তথ্যটা যদি সত্যি হয়, মেয়েটা ওদের বিরাট উপকার করেছে। কিন্তু রানার ইন্সটিংক্ট যদি মিথ্যে না হয়, অপারেশনে বিশ্রী একটা বাধা বা উপদ্রব হয়ে দেখা দেবে মেয়েটা।

নাসেরের ওপর নজর রাখতে হবে—মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল রানা।

ওদের দিকে পিছন ফিরে বিস্ফোরকের বাক্স দুটো সহ আরও একজোড়া প্যাক টেনে তুলল রানা। বৃষ্টির ফোঁটা বরফের মত ঠাণ্ডা লাগছে হাতে আর মুখে। ইতিমধ্যে রসদ তোলার কাজ শেষ হয়েছে, সব জড়ো করে রাখা হয়েছে বোল্ডারের কিনারায়। সবশেষে উঠছে হাসান, কিন্তু এখনও তার জন্যে কোন রশি ফেলা হয়নি।

বাতাস থেমে থেমে গোঙাচ্ছে। শামিম হঠাৎ ফিসফিস করল, 'মাসুদ ভাই! শোনো!'

ট্রাক এঞ্জিনের ভারী আওয়াজ, পাহাড়ের গায়ে লেগে প্রতিধ্বনি তুলছে।

চল্লিশ ফুট ওঠার পর মসৃণ পাথরে আঙুল আটকাবার মত কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না হাসান। নিচের শূন্যতা যেন ছোবল মারছে পায়ে, হিম বাতাস সারাক্ষণ ঝাপটা দিয়ে গেলেও ইউনিফর্মের ভেতর গরম ঘামের নায়েগ্রা বয়ে যাচ্ছে। নিচের দিকে তাকিয়ো না, তাকালেই পড়ে যাবে, নিজেকে সাবধান করে দিল সে। কিন্তু ওপর থেকে রশি ফেলছে না কেন ওরা? রশি ছাড়া চিমনিতে সে উঠবে কিভাবে? পাথরে মুখ ঠেকাল, পারলে ভেতরে সেঁধিয়ে যায়। উপত্যকায় পৌঁছে গেছে ট্রাকগুলো, হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল প্রাচীর।

পাথরের ওপর হাত বুলাচ্ছে হাসান। কর্কশ পাথর, কিন্তু আঙুল আটকাবার মত কিছু নেই। নিচে নামা সম্ভব নয়, ওপরে ওঠাও সম্ভব নয়, কাজেই এখানেই স্থির হয়ে ঝুলে থাকো।

পায়ের নিচে আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। গোটা খাদ ট্রাক এঞ্জিনের আওয়াজে ভরাট হয়ে আছে। ওপর থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'রশি নামছে!'

ট্রাকগুলো এখন সরাসরি তার নিচে। এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে বোঝা গেল, হাঁটা-গতিতে এগোচ্ছে ওগুলো। তল্লাশী চালাচ্ছে ইসরায়েলি সৈন্যরা। মুখ তুলে ওপরে কেউ তাকাচ্ছে না। কেন তাকাবে? এ তো ঢাল নয়, খাড়া পাঁচিল।

রশিটা ঘষা খেলো মুখে। হাসান কৃতজ্ঞচিত্তে মনে মনে ধন্যবাদ দিল। রশি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সে।

বোল্ডারের সমতল মেঝে থেকে শামিম বলল, 'হাসান উঠছে।'

চওড়া কার্নিস বা মেঝের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। মেঝের কিনারা এই মুহূর্তে দিগন্তরেখার মত, হেডলাইটের আলোর আভায় আলোকিত। কিনারায় শক্ত, নিরেট ও চারকোনা একটা কাঠামো স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে। রেডিওটা।

'ওটা সরাও,' রিয়াজকে নির্দেশ দিল রানা।

'ইয়েস, স্যার!' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সামনে বাড়ল প্রকাণ্ডদেহী রিয়াজ। ও ক্লান্ত, বুঝতে পারছে রানা। শুধু ক্লান্ত নয়, ভয়ও পাচ্ছে; ভেজা স্ট্র হ্যাটটা মাথা থেকে নামাবার কথা মনে নেই।

রানা নিজেও ক্লান্ত, তা না হলে এরপর যা ঘটল সেটা ঠেকাতে পারত।

রেডিওটা তুলে কাঁধে ঝোলাল রিয়াজ। ঘোরার সময় কিছু একটায় আঘাত করল তার পা। আলোর ক্ষীণ আভায় রানার চোখে জিনিসটাকে ঘাসের চাপড়া বলে মনে হলো, কিন্তু আসলে একটা পাথর। পাথরটা কিনারা থেকে খসে পড়ল।

বাতাসে আলোড়ন তুলে হাসানের মাথাকে পাশ কাটাল ওটা। চিমনির গোড়ায় আঘাত করল, খসিয়ে ফেলল মাঝারি আকারের একটা বোল্ডার। ওগুলোকে অনুসরণ করল ছোটখাট একটা পাথর ধস। কনভয়টার দ্বিতীয় ট্রাকের পনেরো ফুট ডানে সগর্জনে ছিটকে পড়ল ওগুলো। ছোট কয়েকটা পাথর আঘাত করল ক্যাব-এর প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজায়।

ট্রাকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। ছাদ থেকে একটা সার্চলাইট সাদা থালা আকৃতির আলো ফেলল কালো পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে।

বোল্ডারের সমতল মেঝের কিনারা থেকে পনেরো ফুট নিচে রয়েছে হাসান, দরদর করে ঘামছে, নিঃশ্বাস ফেলছে ফোঁস ফোঁস করে। রশি বেয়ে এখনও উঠছে সে। নিচ থেকে চিৎকার ভেসে এল। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। পাথরের গায়ে হাত দুটো ধূসর রঙের মাকড়সার মত লাগছে দেখতে, এ যেন অন্য কারও হাত। তারপর অকস্মাৎ হাত দুটোকে নিজের বলে চিনতে পারল সে, চিনতে পারল হাতে ধরা তামার তার জড়ানো রশি। নিজেকে একটা পোকার মত লাগছে, সার্চলাইটের আলো পেরেকের মত গেঁথে রেখেছে।

একটা রাইফেল গর্জে উঠল। তারপর আরেকটা। চুরমার হওয়া পাথর আঘাত করল মুখে। পিঠের পেশী কিলবিল করছে গুলি খাবার আশঙ্কায়। আর দশ ফুট উঠতে হবে। দশ মাইল বললেও চলে।

ঠিক এই সময় ওপর থেকে মেশিনগানের এক পশলা গুলি হলো। সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল সার্চলাইট। পরমুহূর্তে হাতে ধরা রশিটা জ্যান্ত হয়ে উঠল, ওপর থেকে টান দিয়ে তুলে নিচ্ছে কেউ। মুখ তুলে তাকাতে প্রকাণ্ড একটা কাঠামো দেখতে পেল সে, কাঁধ দুটো ফুলে ফুলে উঠছে। শামিম।

শামিম এমন অনায়াসে তুলল তাকে, তার ওজন যেন দুশো পাউন্ড নয়, দুশো আউন্স। কিনারায় উঠে শরীরটা গড়িয়ে দিল হাসান, নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে উজিটা কাঁধ থেকে নামাল।

বোল্ডারের পরে পাহাড়-প্রাচীরের গা উজ্জ্বল সাদা। আলোর আভায় হাসান দেখল উজির সেফটি ক্যাচ অফ করছে রানা।

'গ্রেনেড চার্জ করো,' বলল রানা। 'আমি তোমাদের কাভার দিচ্ছি।'

হাসান আর শামিম বেল্ট পাউচ থেকে দুটো করে গ্রেনেড নিয়ে পিন খুলল।

'ওয়ান···টু···থ্রী,' বলল রানা, 'থ্রো!'

নিস্তব্ধতার ভেতর নিঃশব্দে গ্রেনেডগুলো নেমে যাচ্ছে–একজোড়া ডান দিকে, আরেক জোড়া বাম দিকে। গোটা জগৎ যেন দম আটকে রেখেছে। নিচে ওরা মর্টার বসাবে; এই মুহূর্তে পজিশন নিচ্ছে, রেডিও অন করে রিইনফোর্সমেন্ট পাঠাতে বলছে। তবে এত গভীর খাদ থেকে রেডিও মেসেজ পরিষ্কার শোনা যাবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

তারপর সাদা হয়ে গেল রাত, চারটে বিস্ফোরণের শব্দকে একটা মনে হলো, পরমুহূর্তে আরও জোরাল একটা আওয়াজ শোনা গেল। ক্রল করে কার্নিসের কিনারায় চলে এল রানা। নিচের আলোগুলো নিভে গেছে। তবে নতুন একটা আলো দেখা যাচ্ছে, কালো আর কমলা রঙের–একটা ট্রাকে আগুন ধরে গেছে, বিস্ফোরিত হয়েছে পেট্রল ট্যাংক। গুলি থেমে গিয়েছিল, আবার শুরু হলো।

'এবার শামিম কাভার দাও, দশ মিনিট। তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে চূড়ায়।'

আগুনের আভায় দেখা গেল রানার নির্দেশ শুনে মাথা ঝাঁকাল শামিম, কাঁধ থেকে উজি নামিয়ে ছড়ানো পাথরের ভেতর দিয়ে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাকি পাঁচজন পুরুষ আর লায়লা প্যাকগুলো তুলল। গলায় ভয়ের লেশমাত্র নেই, শাফি বলল, 'সরু একটা পথ পাওয়া যাবে। আরেকটু উঁচুতে।'

'হাসান,' বলল রানা, 'আমি চাই না ট্রাকগুলো ফিরে যাক। তোমার কিছু করার আছে?'

'নেই আবার!' নিঃশব্দে হাসল হাসান। তামার পাত দিয়ে জড়ানো একটা বাক্সের ভেতর এরইমধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে সে। দশ ইঞ্চি ইঁটের মত দেখতে পাঁচ পাউন্ড ওজনের প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বের করে মেঝেতে রাখল। প্রথম বাক্স বন্ধ করে দ্বিতীয় বাক্স খুলল। স্মক-এর বুক পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে জ্বালল। সবুজ একটা টাইম পেন্সিল বেছে নিল বাক্স থেকে, থারটি সেকেন্ড ডিলে। পেন্সিলটা সাবধানে প্রাইমারে ঢোকাল, তারপর আলোকিত হাতঘড়ির ডায়ালে তাকাল। পেন্সিলে ক্যাপ পরিয়ে হাই তুলল, সিগারেট ধরাল সাবধানে। লাইটারটা পকেটে যখন ভরল, পঁচিশ সেকেন্ড পার হয়ে গেছে। ইঁটটা দু'হাতে ধরে কিনারা থেকে ফেলে দিল নিচে, জোড়া ট্রাক লক্ষ্য করে।

দম ফেলে শ্বাস টানার সময়টুকু অন্ধকার আর নিস্তব্ধ, শুধু নিচে থেকে হিব্রু ভাষায় অস্পষ্ট চিৎকার-চেঁচামেচি ভেসে আসছে, আর শোনা যাচ্ছে পাথরের সঙ্গে ইস্পাতের ঘষা খাওয়ার আওয়াজ–মর্টার বসাচ্ছে ওরা।

তারপর আবার সাদা হয়ে গেল রাত, সার্চলাইটের চেয়ে উজ্জ্বল, সেই সঙ্গে বিস্ফোরণের ধাক্কায় কেঁপে উঠল বোল্ডারের মেঝে, ছিটকে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে পড়ল রানা, কানে তালা লেগে গেছে। 'গো!' চিৎকার করলেও, আওয়াজটা অস্পষ্ট শোনাল কানে। পথ দেখিয়ে উঠছে ও, বাকি সবাই পিছু নিল। শাফির পিছনে লায়লা, তারপর নাসের, সবশেষে হাসান। একা শামিম শুধু পঞ্চাশ ডিগ্রী বাঁক নিয়ে বোল্ডারের পিছনে দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠে গেছে, ওখানে আরও একটা বোল্ডার

পেয়েছে সে। উজিটা তেপায়ার ওপর রেখে নিচে, উপত্যকার মেঝেতে তাকাল।

দুটো ট্রাক জ্বলছে। ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে উপত্যকার মেঝে, সেই ক্ষতের মধ্যে পড়ে আছে ছিন্নভিন্ন মানুষের শরীর ও ধাতব আবর্জনা। অপর ট্রাকটা দেখতে হয়েছে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা থেঁতলানো পোকার মত। খাদের দূর প্রান্তে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে তিনজন লোক, পাশে ভাঙাচোরা একটা মর্টার। তিনজনের মধ্যে একজন নড়ে উঠল দেখে উজিটা কাঁধে তুলে ফায়ার করল শামিম। ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেল লোকটা, তারপর আর নড়ল না। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল শামিম। উপত্যকায় প্রাণের কোন অস্তিত্ব আছে বলে মনে হলো না। যতদূর বুঝতে পারছে, রেডিও সেটটা গুঁড়িয়ে গেছে। সৈন্যরাও সম্ভবত কেউ বেঁচে নেই। থাকলে নিচে নেমে তাদেরকে খুন করতে তার আপত্তি নেই। তবে সেক্ষেত্রে মূল দলের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ থাকবে বলে মনে হয় না।

আবার বৃষ্টি শুরু হতে আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল শামিম। এখানে আর সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল সে।

পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী হেলে থাকা ঢাল বেয়ে ওঠার সময় হাসান এত জোরে হাঁপাচ্ছে, শুধু ওই একটা শব্দই শুনতে পাচ্ছে সে। অন্ধকারে কোথায় পা ফেলছে দেখার উপায় নেই। একে প্রচণ্ড শীত, তার ওপর তুমুল বৃষ্টি। কোথায় যাচ্ছে, পরিষ্কার কোন ধারণা নেই কারও। লায়লার কথায় যদি ভরসা রাখা যায়, সামনে কোথাও ফায়েদ ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সেখানে শুকনো, আরামদায়ক আশ্রয় মিলবে। কিংবা, কে জানে, হয়তো সরাসরি ফাঁদে পা দেবে ওরা।

রানা বলল, 'পিছনে নজর রাখা দরকার। কেউ থেকে যেতে পারে।'

শামিম একপাশে সরে দাঁড়িয়ে পড়ল। শাফি ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তারপর হাসান। এক সময় রিয়াজ। সবশেষে নাসের আর লায়লা। নাসের লায়লার ওপর ঝুঁকে আছে, স্ত্রীকে একরকম বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে, হাঁপাচ্ছে হাপরের মত। 'আপনার অসুবিধে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল শামিম।

'না!' প্রয়োজনের চেয়ে চড়া গলায় জবাব দিল নাসের।

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে থাকল শামিম। ওদের পিছু নিল সে।

যেন অনন্তকাল ধরে উঠছে ওরা। আসলে এক ঘণ্টার কিছু বেশি। আরও মিনিট পাঁচেক পর দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল শাফির গলা চিরে। সে কাউকে সঙ্কেত দিল, নাকি স্রেফ উল্লাস প্রকাশ করল, বোঝা গেল না।

সবার আগে ছিল রানা, আড়ষ্ট হয়ে গেল। শাফির অবশ্য সেদিকে খেয়াল নেই। সামনের ঢাল প্রায় সমতল, যদিও অংশবিশেষ মাত্র। এটাই পথ। সামনে পাহাড়-চূড়ার উঁচু-নিচু চূড়া।

পিছিয়ে পড়েছিল নাসের আর লায়লা। শাফিকে থামার নির্দেশ দিল রানা। কাছে এসে নাসের বলল, 'লায়লা ক্লান্ত। ওর খিদে পেয়েছে, বিশ্রামও দরকার...'

'তোমার কি মাথা খারাপ হলো!' প্রতিবাদ করল লায়লা। দুর্বল কণ্ঠ, তবে গলায় জেদ প্রচুর।

'প্লীজ, লায়লা...'

'ইস, কি করছ!' হিসহিস করে বলল লায়লা। 'চলো।'

রানা কিছু বলল না। মেয়েটার প্রাণশক্তির প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু তবু দুর্গম পাহাড়ী পথে একটা ঝামেলাই বলতে হবে, হাঁটার গতি খুবই কম। হাতঘড়ি দেখল ও। তিনটে বাজে। 'শাফি, আর কত দূর?'

'দু'ঘণ্টা। এখন শুধু নিচে নামা।'

'তার আগে কোনও শেলটার নেই?'

'দশ মিনিটের মধ্যে পাব একটা। রাখালদের কুঁড়ে। খালি পড়ে আছে।'

'ওখানে আমরা বিশ মিনিট বিশ্রাম নেব,' বলল রানা।

'আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব...' হাঁপাচ্ছে নাসের, কথাটা শেষ করতে পারল না।

কুঁড়েটায় ছাদ আর তিনদিকে দেয়াল আছে। শুকনো বিষ্ঠা ছড়ানো খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ল লায়লা। খানিকটা খড় আলাদা করে আগুন জ্বালল নাসের। ব্যাগ থেকে কফি ভর্তি ফ্লাস্ক বের করল রিয়াজ। একবার টর্চ জ্বেলে লায়লার চেহারাটা দেখে নিল রানা। মড়ার মত ফ্যাকাসে। রিয়াজের হাত থেকে ফ্লাস্কটা নিয়ে মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে ধরল ও। 'নিন।'

লায়লার দাঁতের সঙ্গে ফ্লাস্কের মুখ বাড়ি খেলো। কেশে উঠল সে। 'ধন্যবাদ।'

'ভাগ্যই বলতে হবে আপনি আমাদেরকে খুঁজে পেয়েছেন।'

'প্রেম। ভালবাসা। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।' আবেগে গলাটা বুজে এল নাসেরের।

'তারচেয়েও বেশি কিছু,' ছুরির মত ধারাল, ঠাণ্ডা সুরে বলল লায়লা। 'নাসের, তোমার কোন ধারণা নেই কি ঘটতে যাচ্ছিল।'

'ইয়েস?' আগ্রহে ঝুঁকে পড়ল রানা। 'কি ঘটতে যাচ্ছিল?'

শিউরে উঠল লায়লা। তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ড একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। 'ওরা মুখ খুলেছে, মি. রানা। মুসলিম ব্রাদারহুডের দু'জন সদস্য। আমি অবশ্য মাত্র একজনকে চিনি। ইসরায়েলি সৈন্যদের ছাউনিতে ছিলাম আমি, ওরা আমাকে জেরা করার জন্যে আটকে রেখেছিল। আমার শারীরিক অবস্থা দেখে ওরা বলল, একটু পরই আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। তার একটু পরই পাশের অফিসরুমে ওদেরকে আমি দেখতে পাই। একজনকে চিনতে পারি। সে-ই কথা বলছিল। রেডিও মেসেজ এসেছে, আপনারা প্যারাস্যুট নিয়ে নামবেন। আপনাদের সঙ্গে প্রচুর টাকা থাকবে। সৈন্যদের সঙ্গে একটা রফা করে ওরা। স্রেফ ডাকাত, মুসলিম ব্রাদারহুডের সুনাম নষ্ট করছে। সৈন্যদের ওরা পরামর্শ দিল। আপনাদেরকে তারা খুন করবে। টাকাগুলো ওরা সবাই ভাগ করে নেবে। সেই সঙ্গে পাবে ইনফর্মারের চাকরি।'

'তারপর?' সামনে ঝুঁকল রানা।

'ওরা সৈন্যদের বলল, কোথায় আপনারা ল্যান্ড করবেন। তাই ছাড়া পেতেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি! ট্রাক আসেনি ওই দুই...'

লায়লার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল নাসের, ঝুঁকে চুমো খেলো কপালে।

'ধন্যবাদ,' বলে সিধে হলো রানা, ক্লান্ত হাঁটু দুটোর প্রতিবাদ গ্রাহ্য করল না। দলে এরকম একটা মেয়ে থাকা ভাগ্যের কথা। হোক মন্থরগতি। 'এখনি আমরা

রওনা হচ্ছি,' নির্দেশ দিল ও। মনে মনে আবারও বলল, নাসের আর ওর বউয়ের ওপর সতর্ক নজর রাখতে হবে। এত সহজে ইসরায়েলিদের কব্জা থেকে ছাড়া পায় কি করে লায়লা? সম্ভব। ওদের নিজস্ব কোন কারণ থাকলে। নাকি দয়া? মন মানতে চায় না।

দুই

দু'ঘণ্টার পথ সোয়া এক ঘণ্টায় পেরিয়ে এল ওরা, ঢাল বেয়ে প্রায় ছুটে নেমে এসেছে। এই মুহূর্তে গাছপালার ভেতর রয়েছে ওরা, গ্রামের ওপরে। জঙ্গলে আরও একটা কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে, গোলাঘরের মত দেখতে। দরজা খুলে শাফি বলল, 'এখানে সবাই অপেক্ষা করুন।'

রানা ঝট করে তাকাল। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'দেখি দু'একজন বন্ধুকে খুঁজে পাই কিনা।' এদিকে তুষার পড়ে, তাই কুঁড়ের ভেতর একটা ফায়ারপ্লেস আছে, তাতে কয়েকটা চেলা কাঠ ভরে আগুন জ্বালল শাফি। 'আপনারা আরাম করুন, কাপড়চোপড় শুকিয়ে নিন।'

শামিমের দিকে তাকাল রানা। দু'জনের কেউই ব্যাপারটা পছন্দ করছে না। তবে করারও কিছু নেই। এ এমন এক পরিস্থিতি, ভাল করে না চিনলেও লোকজনকে বিশ্বাস করতে হবে।

অন্ধকারে হারিয়ে গেল শাফি। আগুনের ধারে প্রায় ঢলে পড়ল লায়লা, পা থেকে বুট খুলছে। তার দিকে তাকিয়ে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে নির্দেশ দিল রানা, 'বাইরে।'

অবাক হয়ে তাকাল লায়লা, রানাকে পাগল ভাবছে সে।

তার দৃষ্টির জবাবে রানা প্রশ্ন করল, 'শাফি যদি ইসরায়েলি সৈন্য নিয়ে ফিরে আসে?'

'শাফি?' লায়লার চোখে বিস্ময় ও অবিশ্বাস। 'অসম্ভব! ইসরায়েলিদের ঘৃণা করে ও।'

নাসেরের ফর্সা চেহারা নীলচে-বেগুনি হয়ে আছে। 'কে বলতে পারে! ড্রপ সাইটে আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল ইসরায়েলিরা। তুমিই তো বললে, ব্রাদারহুডের দু'জন লোক বেঈমানি করেছে...'

'তাদেরকে আমি চিনতেও পেরেছি,' বলল লায়লা। 'কিন্তু তাই বলে শাফিকে সন্দেহ করার কোন মানে হয় না!'

'বাইরে অপেক্ষা করব আমরা,' রানাকে সমর্থন করে বলল নাসের।

লায়লার চেহারায় জেদ ফুটে উঠল। 'না! অসম্ভব! আমি এখান থেকে নড়ছি না।'

'আমিও না,' বলল রিয়াজ। স্ট্র হ্যাটের নিচে তার প্রকাণ্ড মুখও নীলচে-বেগুনি হয়ে আছে।

'মেয়েদের নিয়ে এই এক ঝামেলা...'

নাসেরকে থামিয়ে দিয়ে লায়লা বলল, 'ঝামেলা মনে করলেই ঝামেলা। শাফিকে আমি চিনি, কাজেই...' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে...' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাতে গিয়ে নাসের দেখল শুধু রানা নয়, শামিম ও হাসানও কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে গেছে নিঃশব্দে। ভেজা পদচিহ্নগুলোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সে।

ভেজা পাইন কাঁটার ওপর শুয়ে শীতে হি-হি করছে হাসান। নাসেরকে ছুটে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে সে, দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে জঙ্গলের আরেক দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে সে।

আধ ঘণ্টা পর বৃষ্টি থেমে গেল। গাছের পাতা থেকে টপ্ টপ্ করে পানির ফোঁটা ঝরছে। তারপর শোনা গেল এঞ্জিনের আওয়াজ। বাঁক ঘুরে ছোট একটা ট্রাক আসছে, তবে হেডলাইট জ্বলছে না। হাতের উজি তুলে ট্র্যাক ক্যাবে লক্ষ্যস্থির করল হাসান। তিনজন লোক নামল নিচে। যত দূর বোঝা যাচ্ছে, হাফট্রাকটা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর নয়। একটা গলা ভেসে এল, 'ইস্রাফিল।' অন্য কেউ একজন সাড়া দিল, 'আফলাতুন।' গোলাঘরের দরজা খুলে গেল।

রানা দেখল, জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে গোলাঘরের দিকে এগোচ্ছে নাসের। তারমানে নতুন আসা লোকগুলোকে সে চেনে। বসল রানা, সিধে হলো, সাবধানে এগোচ্ছে গোলাঘরের দিকে।

নতুন লোকগুলো আলখেল্লা পরে আছে, গরম চাদরে চোখ বাদে মুখ ও মাথা ঢাকা। প্রত্যেকের হাতে শটগান। দু'জন অনর্গল কথা বলছে হিব্রু ভাষায়। শুধু উত্তেজিত নয়, আবেগে থরথর করে কাঁপছে।

'গ্রামে কোন ইসরায়েলি সৈন্য নেই,' রানাকে বলল শাফি। 'কিন্তু একটা দুঃসংবাদ আছে। শেফাইমের পুব প্রান্তে গুলি খেয়েছে ফায়েদ।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। 'কিভাবে?'

'বেশি উৎসাহ দেখাতে গিয়ে,' শাফির সংক্ষিপ্ত জবাব।

নাসের বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, ভাল করতে গিয়ে নিজেও মরেছে ফায়েদ, আমাদেরকেও বিপদে ফেলে গেছে।'

শাফি কাঁধ ঝাঁকাল। 'মুসলিম ব্রাদারহুডের মূল দল খবর পায় আমরা ল্যান্ড করেছি। তাদের ধারণা হয়, আমরা একটা রেজিমেন্ট, কিংবা তারও বেশি। এরকম ধারণার কারণ, খাদে মাত্র দু'জন সৈন্য বেঁচেছে। ফায়েদ খবর পায় ব্রাদারহুডের মূল দল ইসরায়েলি সৈন্যদের ছাউনিতে হামলা করতে যাচ্ছে। ওরা স্রেফ খুন হয়ে যাবে, বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বাধা দেয়ার জন্যে রওনা হয় সে। কিন্তু পৌঁছুতে দেরি করে ফেলে, তার আগেই ছাউনি আক্রমণ করে বসে ওরা। ইসরায়েলিরাও পাল্টা জবাব দিচ্ছিল। ব্রাদারহুডের বিশ-বাইশজন মারা গেছে, তাদের মধ্যে ফায়েদও একজন।'

রানা চিন্তায় পড়ে গেল। একমাত্র ফায়েদই জানত ইসরায়েলি সাবমেরিনগুলো কোথায় মেরামত করা হচ্ছে। 'এখন তাহলে উপায়?'

'নেতানায়ার গোফরান সারপ্রাইজ দেয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে,' বলল শাফি।

'গোফরান? গোফরান রুটিঅলা?' জিজ্ঞেস করল নাসের। শাফি মাথা ঝাঁকাতে আবার বলল, 'সৎ লোক।'

'আমার রুটি নয়,' শান্ত গলায় বলল রানা, 'ইসরায়েলি তিনটে সাবমেরিন সম্পর্কে তথ্য দরকার।'

শাফি হাসল। 'গোফরান রুটিঅলা আপনাদেরকে তার কাফেতে নাস্তা খাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ওখানে এক ভদ্রলোক আছেন, দেখলে খুশি হবেন, স্যার। সেই ভদ্রলোক আপনাকে হয়তো কিছু তথ্য দিতে পারবেন। কারণ তার সঙ্গে ফায়েদের কথা হয়েছে।'

হয়তো! হাল ছেড়ে দেয়ার অবস্থা রানার।

'ওহ্, দারুণ,' উৎসাহ দেখাল হাসান। 'নাস্তা পাব, তথ্য পাব, চাইলে হয়তো নাচ-গানের ব্যবস্থাও...'

'নাচ-গানের কথা জানি না, তবে গোফরান রুটিঅলা অনেক মেয়ে রাখে।'

হাসতে গিয়েও রানার চোখে ধরা পড়ার ভয়ে হাসল না হাসান। 'ও-সব আমাদের দরকার নেই, এমনি ঠাট্টা করছিলাম।'

ইশারায় শাফিকে কাছে ডাকল রানা। শাফির সঙ্গে আলখেল্লা পরা লোকগুলোও এগিয়ে এল, যেন শাফির গায়ে আঠা দিয়ে আটকানো। 'গ্রামে ইসরায়েলি সৈন্য নেই কেন?'

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে এক লোক হাসল, ঝড়ের বেগে কথা বলে যাচ্ছে। শাফি ভাষান্তর করল; 'সৈন্যরা সবাই শেফাইমের পুবে জমায়েত হয়েছে। তাদের ধারণা, পাহাড় টপকে নেতানায়ার দিকে আমরা আসতে পারিনি। ওরা সৈকতে তল্লাশী চালাচ্ছে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'শোনো, শাফি। নাস্তার কথা ভুলে যাও। পরিবহনের ব্যবস্থা করো, অন্ধকার থাকতেই সৈকতে পৌঁছতে চাই আমরা। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'তোমার লোকজনকে গোফরানের কাছে ফেরত পাঠাও,' কঠিন সুরে নির্দেশ দিল রানা, তারপর রিয়াজের দিকে তাকাল। 'ওহে, জানোই তো, লেবাননে আমাদের লোক অপেক্ষা করছে। এবার তাকে জানাও আমরা পৌঁছেছি।'

মাথা ঝাঁকাল রিয়াজ। দেহটা প্রকাণ্ড হলে কি হবে, তাকেই সবচেয়ে ম্লান আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। মাথা ঝাঁকানোর ভঙ্গিটা আড়ষ্ট, চওড়া চোয়ালে ভাঁজ পড়ছে আর খুলছে, স্ট্র হ্যাটের কিনারা থেকে নেমে আসা কয়েকটা ঝুরি বাতাসে দুলছে। প্যাক খুলে রেডিওটা বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। এক কোণে, খড়ের ওপর শুয়ে পড়েছে হাসান, গুনগুন করে দেশাত্মবোধক একটা গান গাইছে। শামিমের পেশী শিথিল হয়ে থাকলেও, দরজার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিচ্ছে বাইরেটা। দেয়ালে হেলান দিল রানা, আগুনের আঁচে শুকিয়ে গেছে ইউনিফর্ম।

'এই গোফরান সম্পর্কে কি জানেন আপনি?' নাসেরকে জিজ্ঞেস করল ও।

'ফায়েদের সেকেন্ড ইন-কমান্ড,' বলল নাসের। 'ফায়েদকে আপনারা জেলে

বলে জানেন, আসলে সে হিযবুল্লাহ-র সদস্য। গোফরানও তাই। দু'জনেই অসম্ভব সাহসী।'

'আপনি বলছেন, গোফরানকে বিশ্বাস করা যায়?'

হাসল নাসের। 'আর কোন বিকল্প আছে, মি. রানা?'

আবার বৃষ্টি শুরু হলো। রাহাত খান সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, যে-কোন শহর বা গ্রামে ঢোকার আগে নিশ্চিত হয়ে নেবে ওখানে ইসরায়েলি সৈন্য আছে কিনা। রানা চিন্তা করছে।

নিস্তব্ধতা ভেঙে রিয়াজ বলল, 'যোগাযোগ হয়েছে। মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'কোনও নির্দেশ?' জিজ্ঞেস করল রানা। লেবাননে থাকার কথা বিসিআই-এর সহকারী ডিরেক্টর (অপারেশন্স) সোহেল আহমেদের, প্রয়োজন হলে সে ওদেরকে নতুন নির্দেশও দেবে।

'না।'

চোখ বুজল রানা, পাতায় ঘুম হানা দিচ্ছে। সম্ভবত দু'মিনিটও হয়নি, অকস্মাৎ তন্দ্রা ছুটে গেল। বাইরে ট্রাক এঞ্জিনের ভারী গর্জন। উর্জি হাতে লাফ দিয়ে সিধে হলো ও, লক্ষ করল একপাশে দাঁড়িয়ে দরজাটা কাভার দিচ্ছে হাসান। শামিমকে গোলাঘরের কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা। দোরগোড়ায় একজন লোক। লোকটা খাটো আর মোটা, চওড়া গোঁফের প্রান্ত দুটো চিবুক ছোঁয় ছোঁয়, কাকের কালো ডানার মত ছড়ানো, পরনে ঢোলা আলখেল্লা। উজির মাজল দেখে হাসল সে। 'ভায়েরা! নেতানায়ায় আপনাদেরকে স্বাগতম! ইস্রাফিল! আফলাতুন!'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি?'

'গোফরান রুটিঅলা,' বলল লোকটা। 'বিপদ থেকে বাঁচতে চাইলে তাড়াতাড়ি আমার ট্রাকে উঠে পড়ুন।' কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে মাথা নত করল সে। 'ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই।'

বাইরে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আকাশ এখনও অন্ধকার, তবে ঘন কালো মেঘের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। মিশনের সদস্যরা ট্রাকের পিছনে ওঠার পর তাদের মাথার ওপর ক্যানভাস টেনে দিল রানা, নিজে উঠে বসল ক্যাবে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ট্রাক চালাচ্ছে গোফরান। 'কাল রাতে আপনারা বিপদে পড়েছিলেন, সে রিপোর্ট আমি পেয়েছি। গত হপ্তা থেকে আপনাদের একজন এজেন্টের নেতৃত্বে হিযবুল্লাহ গেরিলারা ইসরায়েলি সৈন্যদের ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে...'

'আমাদের এজেন্ট মেজর নাহিদ সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে পারেন?'

'তিনি মারা গেলে সবার আগে আমিই খবর পেতাম। ইসরায়েলি সৈন্যরা আমার কাছে আসে।'

'আপনার কাছে আসে মানে?'

'টোপ ফেলে রেখেছি না!' হাসছে গোফরান। 'আমার ডেরায় চলুন, গেলেই সব দেখতে পাবেন।'

রানা বলল, 'আমরা তিনটে সাবমেরিনের খোঁজে এসেছি।'

'জানি,' বলল গোফরান। 'আমি এক লোককে চিনি, সে আপনাদের ওগুলোর

কাছে নিয়ে যাবে। নাস্তার সময় তার সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে।' স্পীড কমিয়ে একটা ছাগলকে রাস্তা পার হবার সুযোগ দিল সে।

মালভূমি থেকে রাস্তায় নেমে এল ট্রাক। মাঝে মধ্যে দু'একটা ইঁট ও মাটির ঘর-বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

'আমরা কি শহরে যাচ্ছি?'

'নেতানায়া শহর বিপজ্জনক জায়গা। আমরা শহরের পাশে একটা গ্রামে যাচ্ছি, আমার আস্তানায়।'

একটা চার্চ ও মসজিদকে পাশ কাটাল ট্রাক। ওগুলোর মাঝখানে এক ঝাঁক মুরগি চরছে। তারপর এক সারি দোকান-পাট দেখা গেল। পাশাপাশি দুটো কামারশালা। কসাই-এর দোকানও আছে। চৌরাস্তায় পৌঁছুবার আগেই সাইনবোর্ডটা পড়তে পারল রানা–গোফরান কাফে। ট্রাক থামাল গোফরান। 'পৌঁছে গেছি। নামতে বলুন সবাইকে।'

ভেজা পাথুরে চাতালে ভারী আর কর্কশ শোনাল বুটের আওয়াজ। কাফের জানালার কাঁচে ইসরায়েলি মিলিটারি পুলিসের ইউনিফর্ম পরা তিনজন অফিসারের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে, প্যাক আর উজি সহ। মুচকি হাসল রানা, আশপাশের জানালার পর্দা সামান্য ফাঁক করে যারা উঁকি-ঝুঁকি মারছে তাদের দৃষ্টিতে সিভিলিয়ানরা রানা, শামিম আর হাসানের বন্দী। কিন্তু কারা উঁকি দিচ্ছে? ইসরায়েলি সৈন্যরা নয়তো? এটা ফাঁদ হলে স্রেফ খুন হয়ে যাবে ওরা।

বিনয়ে গদগদ ভঙ্গিতে পথ দেখিয়ে ওদেরকে কাফের ভেতর নিয়ে এল রুটিঅলা। কাউন্টারের পিছনে পুঁতির মালা দিয়ে তৈরি পর্দার ওপাশে কাঠের একটা আলমিরা দেখা গেল, সেটায় চাপ দিতে সিকি পাক ঘুরে গেল, বেরিয়ে পড়ল লুকানো সিঁড়ির মুখ। ধাপ বেয়ে ওঠার সময় হাসানের নাকের ফুটো প্রসারিত হলো। 'আ-হা-হা! কফির গন্ধ পাচ্ছি!'

হাসান আগে আগে উঠছে, তার পিছনে রানা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল হাসান। উজির ট্রিগারে আঙুল পেঁচাল রানা। সিঁড়ির মাথায় চওড়া একটা ল্যান্ডিং, এখান থেকে চৌরাস্তার সবটুকু পরিষ্কার দেখা যায়। ল্যান্ডিঙে সোফা আর চেয়ার পাতা রয়েছে। চারপাশে অনেকগুলো দরজা। বাতাসে ঘাম, সস্তা সেন্ট আর সিগারেটের গন্ধ। হাসান বিড়বিড় করল, 'মাসুদ ভাই, এটা একটা ব্রথেল।'

'সেজন্যেই নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারবেন,' জবাব দিল গোফরান।

বাইরে দিনের আলো এখন স্পষ্ট। 'আপনি বলেছেন এখানে একজন লোক আছে।' গোফরানের দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

মাথা ঝাঁকাল রুটিঅলা। 'আরও দু'ঘণ্টা পর তার ঘুম ভাঙবে। আগে নাস্তা খেয়ে নিন। আমার নিজের হাতে তৈরি...'

'আমরা এখুনি তার ঘুম ভাঙাব।'

কাঁধ ঝাঁকাল গোফরান, এগিয়ে এসে ল্যান্ডিঙের একটা দরজা খুলে দিল। ঘাম আর পারফিউমের গন্ধ বাড়ল আরও। দরজার ভেতর একটা বেডরূম, দেয়ালে কমলা রঙের নোংরা সার্টিন ঝুলছে। বিছানায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসার শুয়ে রয়েছে, পেটে আর কাঁধে ব্যান্ডেজ বাঁধা। দেখেই মেজর

নাহিদকে চিনতে পারল রানা। 'ওহ্, গড!' ফিসফিস করল ও।

চোখ মেলে গুঙিয়ে উঠল নাহিদ। তারপর রানাকে চিনতে পেরে উঠে বসার চেষ্টা করল। একটা হাত বাড়িয়ে তাকে শুইয়ে রাখল রানা। 'বস্ পাঠিয়েছেন তোমাদের? আমাকে উদ্ধার করার জন্যে?' মাথা নাড়ল নাহিদ। 'কোন দরকার ছিল না, মাসুদ ভাই। আমাকে খরচের খাতায় ধরে রাখতে পারো। তোমরা বরং দেখো সাবমেরিনগুলো খুঁজে পাও কিনা...'

মনে মনে শঙ্কিত রানা। নাহিদকে এই অবস্থায় ফেলে যাওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়, আবার সঙ্গে নেয়াও ভয়ানক বিপজ্জনক। 'কি ঘটেছে, বলো তো আমাকে।'

'রোডব্লকে ধরা পড়ে যাই,' বলল নাহিদ। 'ল্যান্ড করার কয়েক ঘণ্টা পরই। আমরা একটা জীপে ছিলাম। ইসরায়েলি সৈন্যরা জানত ওই রাস্তায় আসব আমরা। মেশিনগান চালায় ওরা, কিভাবে যে বেঁচে গেছি বলতে পারব না। হিযবুল্লাহ গেরিলারা এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে আমাকে।'

'উপকূলের কোথায় তুমি যাচ্ছিলে?' জানতে চাইল রানা।

'কেফার ভিটকিনে,' ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে মুখ, কাতর কণ্ঠে বলল নাহিদ। 'ওখানে এক লোক আছে, মোবারক। গোল্ড ফিশ নামে একটা কাফেতে। এ-সব তথ্য আমি ফায়েদের কাছ থেকে পেয়েছি।'

'আর কি জানো?'

'সাবধানে যেতে হবে,' বিড়বিড় করছে নাহিদ। 'ওদিকে সৈন্য পাঠানো হয়েছে, মিলিটারি পুলিস গিজগিজ করছে। আরেকটা কথা, কোন অবস্থাতেই রেডিও অন কোরো না...'

মাথা ঝাঁকাল রানা, অস্ফুটে বলল, 'ধন্যবাদ।'

সদ্য তন্দুর থেকে বের করা গরম রুটির সঙ্গে তাজা পনির পরিবেশন করা হলো, সঙ্গে ধূমায়িত কফি। লাল ফ্রক আর ব্লাউজ পরা একটা মেয়ে পরিবেশন করল ওদেরকে, নাম বলল বিনাকা। মেয়েটা ভারতীয়, মোবারক তাকে লেবানন থেকে নিলামে কিনে এনেছে। হাসানের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেল। কথায় কথায় সে বলল, শুধু চার দেয়ালের ভেতর এই কাপড়ে থাকে সে, বাইরে বেরোয় বোরখা পরে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর লোকজন এলে তাদের মনোরঞ্জন করাই মূল পেশা। মনিবের বিশেষ নির্দেশে আজ তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

চেয়ারে বসে কাঁচ-ঘেরা জানালা দিয়ে বাইরের চৌরাস্তায় তাকিয়ে আছে হাসান। খানিক পরই গ্রামবাসীর চোখ খুলে যাবে, ডানা মেলবে নানা রকম গুজব। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে তার চুলে বিলি কাটছে মেয়েটা। ঠোঁটে অলস হাসি, বসার ভঙ্গিটা শিথিল, যদিও মাথার ভেতর ঝড় বইছে। এই জায়গা নিরাপদ নয় বলেই তার ধারণা। অথচ মাসুদ ভাই ওদের বলছে, আপাতত কোন বিপদের ভয় নেই।

শাফি বসে আছে এক কোণে, হাতে কফির কাপ। নাসের আর লায়লার দিকে তাকিয়ে আছে সে। তাকিয়ে আছে মানে, চোখ একেবারে ফেরাচ্ছেই না। ভাবটা যেন, নাসের আর লায়লাকে বিশ্বাস করতে পারছে না শাফি।

নাসেরকে নিয়ে সন্দেহ রয়েছে হাসানেরও। হিযবুল্লাহ গেরিলা আর মুসলিম

ব্রাদারহুড সদস্যদের সে চেনে বটে, কিন্তু সবাইকে নয়। তাছাড়া, লোকটার কাণ্ডজ্ঞানেরও যথেষ্ট অভাব আছে। এরকম একটা অপারেশনে এসে স্ত্রীকে পেয়ে এতটা মত্ত হয়ে পড়া মোটেও গেরিলাসুলভ আচরণ নয়। মেয়েটা, অর্থাৎ, লায়লাও একটা ঝামেলা। আকারটাও সমস্যা। তবে হ্যাঁ, কঠিন পাত্রী, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি।

একে একে কাপড় খুলছে লায়লা। ওভার কোট, দুটো চাদর। চাদরের নিচে দুটো সোয়েটার। সব মিলিয়ে যেন দুই পা লাগানো একটা ফুটবল। এত সব মোটা কাপড় পরে সাইকেল চালিয়ে উপত্যকার ঢাল বেয়ে উঠে এসেছে সে, তাও অন্ধকারের মধ্যে। সবশেষে রশি বেয়ে খাড়া পাহাড় চূড়ায় উঠেছে। তারপরও পনেরো বিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়া সহজ কথা নয়।

হঠাৎ হাঁ হয়ে গেল হাসান। গা থেকে এত সব কাপড় খোলার পরও আকার-আকৃতি প্রায় একই থাকল লায়লার। তারপর ধীরে ধীরে ব্যাপারটা ধরতে পারল সে। এবং প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলো। লায়লা মোটা নয়, সে নয়মাসের পোয়াতি।

কোথাও একটা টেলিফোন বাজছে। কিছুক্ষণ আর কোন শব্দ নেই। তারপরই কর্কশ চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। অকস্মাৎ পাথর হয়ে গেল হাসান, কান পেতে কিছু শুনছে। শোরগোলের আওয়াজ থেমে গেছে। শুধু মোরগ ডাকছে। তবে মোরগ থামলে আরেকটা আওয়াজ ভেসে আসছে। খুবই অস্পষ্ট। এঞ্জিনের শব্দ। অনেকগুলো এঞ্জিন। ট্রাকের একটা কনভয় আসছে।

ছোঁ দিয়ে পাশ থেকে উজিটা তুলে নিল হাসান। লাল ফ্রক পরা মেয়েটা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল গোফরান রুটিঅলা, হঠাৎ গম্ভীর ও আড়ষ্ট হয়ে ওঠা মুখে বেমানান হাসি। ট্রাকগুলো এরইমধ্যে চৌরাস্তায় পৌঁছে গেছে। পিছনদিকে ক্যানভাস দিয়ে আড়াল করা, মোট চারটে ট্রাক। থামল ওগুলো, পিছন থেকে সৈন্যরা লাফ দিয়ে নিচে নামছে, পরনে ইউনিফর্ম, হাতে উজি, পায়ের বুট কড়মড় করে পাকা রাস্তায় পড়ে থাকা কাঁকর গুঁড়ো করছে।

ধীর গতিতে চৌরাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা স্টাফ কার। দীর্ঘদেহী একজন অফিসার নামল। কিছু একটা বলে গোফরানের ট্রাকের দিকে হাত তুলল। দু'জন সৈনিক এগিয়ে এসে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে ছিন্নভিন্ন করল ট্রাকটার সবগুলো চাকা।

নাহিদের কামরায় ঢুকছে রানা, ঝট করে ঘুরে গোফরানের মুখোমুখি হলো শামিম, বাঘের মত মস্ত দুই থাবা দিয়ে রুটিঅলার দুই কাঁধ খামচে ধরল সে। শূন্যে উঠে পড়ল লোকটার দুই পা। 'সৈন্যরা এল কেন? কে তাদের খবর দিল?'

আতঙ্কে তোতলাচ্ছে গোফরান। 'আমি জানি না...আমাকে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল...'

দোরগোড়া থেকে রানা বলল, 'ওরা মেয়েদের টানে আসেনি। তা এলে তোমার ট্রাকের চাকা পাংচার করত না।'

শুধু আতঙ্কিত নয়, গোফরানকে বিব্রতও দেখাল। 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন। এটা ব্রথেল, এখানে লুকানোর ভাল জায়গা আছে।'

তাকে ছেড়ে দিল শামিম। ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে গোফরান। 'আমার পিছু নিন, প্লীজ! খোদার কসম বলছি, আমি বেঈমান নই।' কয়েকটা মেয়ের নাম ধরে ডাকল

সে। নির্দেশ পেয়ে কাপ-পিরিচ আর প্লেট, সিগারেটের প্যাকেট, অ্যাশট্রে ইত্যাদি দ্রুত সরিয়ে ফেলল তারা। ওয়ার্ড্রোব-এর দরজা খুলল এক মেয়ে। সেটার পিছনে কিছু নেই, ফাঁকা।

গোফরানকে বিশ্বাস করছে রানা। তবে কেউ একজন ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কে সে?

নাহিদকে সাহায্য করতে গেল শামিম, তার হাত ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বাঁশের তৈরি ক্রাচ টেনে নিয়ে নিজেই বিছানা থেকে নামল সে, ব্যথায় গোঙাচ্ছে। ওয়ার্ড্রোবে ঢুকছে ওরা, শব্দ শুনে বোঝা গেল কাফের সদর দরজায় সৈন্যরা বাড়ি মারছে রাইফেলের বাঁট দিয়ে। ওদের পিছনে ওয়ার্ড্রোবের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ধাপ বেয়ে পিছনের ছোট্ট ভেজা উঠানে নেমে এল ওরা, মাথার ওপর ছোট্ট আকাশ। উঠানের পিছন দিকে একটা শেড, দরজার মাথার দিকটা দীর্ঘদিন ধোঁয়া লাগায় কালো হয়ে আছে। রুটি সেঁকার তীব্র সুগন্ধ ঢুকল নাকে।

পাঁচিলের ওদিক থেকে ভারী ও কর্কশ কমান্ড ভেসে এল, সেই সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে উঠল কয়েকটা কুকুর। 'জলদি!' তাগাদা দিল গোফরান। সবাইকে ঠেলে শেডের ভেতর ঢোকাল সে।

শেডটা রুটি তৈরির কারখানা। একজোড়া তন্দুর দেখা গেল। বাম দিকেরটা ঢাকা। ডান দিকেরটা খোলা। খোলা ডান পাশের আভেনের দরজার সামনে বড় একটা চ্যাপ্টা পাথর, পাথরের ওপর পড়ে রয়েছে একটা মেটাল ট্রে–ছয় ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া। একচোখো এক লোককে দেখা গেল, ওদের দিকে ভুলেও তাকাল না, পরনে নোংরা অ্যাপ্রন। 'ট্রেতে শুয়ে পড়ুন,' তাগাদা দিল গোফরান। 'দু'জন করে।'

'বাকি সবাই কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'ব্রথেলে। ওরা হিব্রু জানে, স্যার। ওদের কাগজ-পত্রে কোন খুঁত নেই।'

লাফ দিয়ে ট্রে-তে বসল হাসান, পাশে উঠল রানা। গোফরান বলল, 'ট্রে থেমে গেলে গড়িয়ে নিচে নামবেন। দুইহাতে চোখ-মুখ ঢেকে রাখবেন।'

হিব্রু ভাষায় ইসরায়েলিদের কথা বলতে শুনছে রানা। এটা ফাঁদ না হওয়াটাই আশ্চর্য, ভাবল ও, আর ফাঁদ হলে এটাই শেষ ফাঁদ। পেটে প্যাক নিয়ে শুয়ে আছে ও। হাত দিয়ে মুখ ঢাকা। বৈঠার মত দেখতে একটা লাঠি ঢোকাল ভেতরে কেউ, সচল হলো ট্রে। আগুনের প্রচণ্ড আঁচ লাগল হাতে। কল্পনার চোখে গম্বুজ আকৃতির তন্দুর দেখতে পেল। চুল ও লোম পোড়ার কটু গন্ধ ঢুকল নাকে। তারপর একটা কথা মনে পড়তে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক–ওদের সঙ্গে প্রচুর অ্যামিউনিশন রয়েছে!

আগুনের আঁচ থেকে দূরে সরে এল ওরা, বৈঠার ঠেলা খেয়ে ট্রে-টা নেমে এল পাথুরে সারফেসে। জায়গাটা গরম, তবে খুব বেশি নয়। মাথা উঁচু করল রানা। ঘন কালির মত অন্ধকার চারদিক। কপাল থেকে ছ'ইঞ্চি ওপরে ছাদ। তবে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

ওদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল ট্রে-টা, ফিরে এল একটু পরেই, তাতে শুয়ে রয়েছে শামিম আর নাহিদ। নাহিদ হাঁপাচ্ছে, গোঙাচ্ছে। ট্রে থেকে নামাল তাকে রানা। শামিম নিজেই নামল। পাথরে পাথরে ঘষা খেলো। নাও, এবার কাবাব তৈরি

হও। বন্ধ তন্দুরের ভেতর আটকে ফেলা হয়েছে ওদেরকে। একটা দরজা, বাইরে থেকে সেটা বন্ধ। আভেন থেকে বিদঘুটে আওয়াজ নেমে আসছে। সন্দেহ নেই, আগুনটাকে উসকে দিয়ে নতুন করে রুটি বানানোর আয়োজন চলছে। মাথা তুলে অন্ধকারে চোখ জ্বালার চেষ্টা করল রানা, দেখতে চায় কোত্থেকে আসছে বাতাস। সিলিঙে ঠুকে গেল কপালটা। মেঝে থেকে আঠারো ইঞ্চি ওপরে সিলিং, আন্দাজ করল ও। অন্ধকারে দেখার কিছু নেই। করারও নেই কিছু, জ্যান্ত পুড়ে মরা ছাড়া। তামা দিয়ে মোড়া বাক্সটা ছুঁলো একবার। হাসানের হাত স্পর্শ করল। সেটা ধরে একটু চাপ দিল, সাহস যোগাবার চেষ্টা।

নাকের ছ'ইঞ্চি ওপরে অদৃশ্য সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে হাসান, কান পেতে শুনছে আভেনের ইঁটের পাঁচিল ভেদ করে ভেসে আসা বিচিত্র শব্দগুলো। আগুনের শোঁ-শোঁ আওয়াজ পেল সে, ধোঁয়ার গন্ধ ঢুকছে নাকে। তন্দুরে আগুন ধরানো হয়েছে। কি আশ্চর্য, আগুনের নিচে ওরা কতক্ষণ টিকতে পারবে! এখানে ওদেরকে থাকতেই বা হবে কতক্ষণ?

তারপর কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল। একটা কণ্ঠস্বর মিনমিনে, বিনয়ে বিগলিত। বাকিগুলো কর্কশ আর ভারী।

অকস্মাৎ একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করল, একেবারে যেন ওদের কানের পাশে। আভেনের যেদিকটায় আগুন ধরানো হয়েছে, তার উল্টোদিক থেকে চিৎকারটা আসছে। ওরা চারজন একটা কম্পার্টমেন্টে লুকিয়ে আছে, সেটার দেয়াল বা ছাদ আঁচড়াচ্ছে কুকুরটা। কোন সন্দেহ নেই, জানোয়ারটা এয়ার হোল দেখতে পেয়ে ওদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। মানুষের গন্ধ না পেলে এভাবে আঁচড়াত না।

আভেনের পিছনে খুদে সেলটা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। ওরা ঘামতে শুরু করল।

আভেনগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে গোফরান রুটিঅলাও ঘামছে। আভেন থেকে উড়ে আসা পাতা ও খড়ির ছাই আর ময়দা লেগে রয়েছে অ্যাপ্রনে। ইসরায়েলি মিলিটারি পুলিসের দিকে তাকিয়ে নার্ভাস হাসি হাসছে সে। অফিসার দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে রয়েছে, ল্যুগারের ব্যারেল দিয়ে বাড়ি মারছে অপর হাতের কালো দস্তানা পরা তালুতে। সে-ও হাসছে, কিন্তু ধূসর পাথর রঙের চোখ বরফের মতই ঠাণ্ডা। 'সত্যি কথা বলো। কোথায় ওরা?'

'জ্বী?' প্রশ্নটা শুনেও না বোঝার ভান করল গোফরান।

উঠান ভরা সৈন্য। চেইনে বাঁধা একটা কুকুর আরেকজন অফিসারকে টেনে নিয়ে এল। অ্যালসেশিয়ান-এর জিভ বাইরে বেরিয়ে আছে, উত্তেজনা আর প্রত্যাশায় হাঁপাচ্ছে ওটা। প্রথম অফিসারকে দ্বিতীয় অফিসার বলল, 'কাফের ওপর ব্রথেলে আমার কুকুর অচেনা কারও গন্ধ পেয়েছে—খালি একটা চেয়ারে বসেছিল কেউ। গন্ধটা ওকে টেনে এনেছে আভেনের কাছে।'

আভেনটা ইতিমধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে। কুল কুল করে ধোঁয়া উঠছে ভেতর থেকে, এঁকেবেঁকে উঠে যাচ্ছে উঠানের মাথায় জমে থাকা কালো

মেঘের দিকে। ইঙ্গিতে আভেনটা দেখাল গোফরান। 'কাল্পনিক লোকগুলো কি লোহার তৈরি?' হাসল আবার। 'সেক্ষেত্রে অপেক্ষা করুন, যেভাবে আগুন জ্বলছে লোহা গলতেও বেশি সময় লাগবে না।'

প্রথম অফিসারও হাসছে। 'লোকগুলো যদি কাল্পনিকই হবে, কুকুরটা এত উত্তেজিত কেন?'

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন। একটা রহস্যই বটে।'

অফিসার বলল, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাইরের লোক ঢুকেছে গ্রামে।'

'আপনার এরকম বিশ্বাসের পিছনে নিশ্চয়ই কারণ আছে?'

কারখানার চারদিকে তাকাল অফিসার। 'ওই আভেনে কি আছে?' জানতে চাইল সে।

মুখের সামনে হাত তুলে হাই তুলল গোফরান। 'কি করে বলি। খালি থাকারই তো কথা।'

চিবুকে হাত বুলাল অফিসার। 'আমার ইচ্ছে হচ্ছে আভেনটা ভেঙে ফেলি।'

'হে আল্লাহ, রহম করো–অফিসার হেইকির মনে দয়া-ধর্মের বন্যা বইয়ে দাও! অফিসার হেইকি, এই আভেন দুটোই আমার জীবন, আমার রুটি-রুজির অবলম্বন। কি আছে ওগুলোয়?' একচোখোর দিকে তাকাল। 'ভাই? জাফরান? কিছু একটা বলো!'

একচোখো জাফরান বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল। 'মৌরি।'

'মানে?' চোখ রাঙাল অফিসার।

'জাফরান জেরুজালেমের লোক, ওখানকার বেকারিতে রুটি বানাবার সময় ময়দার সঙ্গে মৌরি, কিশমিশ, পেস্তা আর মোরব্বা মেশানো হয়। আর আপনি তো জানেনই, এ-সবই কুকুর খুব পছন্দ করে।'

হাতের ল্যুগারটা জাফরানের দিকে তাক করল অফিসার। 'আভেনটা খোলো।'

'ও আল্লাহ, অফিসারের সুমতি দাও!' কপালে চাঁটি মারল গোফরান। এখন আভেন খুললে সব রুটি দরকাঁচা মেরে যাবে!'

'খোলো বলছি!' কড়কে উঠল অফিসার।

'হুজুর, স্যার!' মিনতি করল গোফরান। 'সত্যি বলছি রুটি আধ-কাঁচা থেকে যাবে…'

অফিসারের আঙুল ট্রিগারে চেপে বসছে।

'আপনি চান আমি গুলি খেয়ে মরি?' গোফরানকে জিজ্ঞেস করল জাফরান। 'প্রাণের চেয়ে আপনার কাছে রুটির দাম বেশি হলো?' অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে আভেনের ঢাকনি সরিয়ে ভেতরে কাঠের লাঠিটা ঢুকিয়ে দিল। লাঠিটা তন্দুর থেকে বের করার পর দে া গেল শেষ মাথায় একটা কেক রয়েছে, গোল ও বাদামী রঙের। 'এখনও ভাল করে সেঁকা হয়নি।'

কেকটা হাতে নিয়ে আঙুল দিয়ে পিষল অফিসার। শূন্যে লাফ দিল কুকুরটা, কেকের নাগাল না পেয়ে অফিসারের হাত চাটছে। বুট দিয়ে কুকুরের পেটে লাথি মারল অফিসার। ব্যথায় ককিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল জানোয়ারটা। কেকের গুঁড়ো নাকের সামনে তুলে শুঁকল অফিসার। মৌরির গন্ধ পেল সে। 'চমৎকার!' হাসিটা

ফিরে এল মুখে। ঘুরে উঠানে নেমে যাচ্ছে। 'কুকুরটা আমাদেরকে ঘোল খাইয়েছে। তবে প্রকৃত সত্য জানার আরও অনেক উপায় আছে।'

অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে তার পিছু নিল গোফরান। 'জ্বী, হুজুর?'

'এলাকার মুসলমানরা সব বেঈমান। তলে তলে সবাই মুসলিম ব্রাদারহুড আর হিযবুল্লাহ গেরিলাদের সাহায্য করো তোমরা। শেফাইমের ওদিকে কাল রাতে সৈন্যদের ওপর চোরা-গুপ্তা হামলা চালানো হয়েছে। সেজন্যে তোমাদেরকে শাস্তি পেতে হবে। শাস্তিটা হালকা হতে পারে, গ্রামে লুকিয়ে থাকা বহিরাগত শত্রুদেরকে বের করে দিলে। ওদেরকে না পাওয়া পর্যন্ত আমি থামছি না।' চৌরাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল অফিসার। 'দিয়াম?'

একজন সার্জেন্ট অ্যাটেনশন হলো।

'চৌরাস্তার প্রতিটা বাড়িতে নক করো,' নির্দেশ দিল অফিসার। 'যে দরজা খুলবে, তাকেই নিয়ে এসে এখানে দাঁড় করাও, দেয়ালে নাক ঠেকিয়ে। সৈন্যদের নির্দেশ দাও, গাছগুলোর নিচে একটা মেশিনগান ফিট করুক।'

গোফরানের চেহারা ময়দার মত সাদা হয়ে গেল। 'স্যার, হুজুর, এ-সবের মানে কি?'

'পাঁচ মিনিট পর পর একজন করে লোককে গুলি করে মারা হবে,' বলল অফিসার। 'যতক্ষণ না সত্য কথা বলে কেউ। তোমার রুটি পুড়ে যাচ্ছে, গোফরান। তুমি বরং নিজের কাজে ফিরে যাও।'

তিন

অসহ্য তাপে সেদ্ধ হচ্ছে ওরা। দেয়াল ভেদ করে নতুন একটা আওয়াজ ভেসে এল। চিনতে অসুবিধে হলো না, মেশিনগানের সিঙ্গেল শট। একটা কথা ভেবে খানিকটা তৃপ্তি বোধ করছে রানা। জেলিগনাইট যদি বিস্ফোরিত হয়, অনেক নিরীহ মানুষ মারা যাবে ঠিকই, তবে তাদের সঙ্গে ইসরায়েলি সৈন্যরাও কেউ বাঁচবে না। যে পরিমাণ জেলিগনাইট ওদের সঙ্গে রয়েছে, ফেটে গেলে গোটা গ্রামের কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

'এখান থেকে বেরুতে পারলে ট্র্যান্সপোর্ট দরকার হবে আমাদের.' শামিম আর হাসানকে বলল রানা। 'কেফার ভিটকিন এখান থেকে পনেরো-বিশ কিলোমিটার দূরে। ঘুরপথে ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার। সাবমেরিনগুলো রওনা হবে কাল বাদে পরশু, দুপুর একটায়।'

'ট্র্যান্সপোর্ট...সাইকেল?' শামিম জিজ্ঞেস করল।

সবাই চুপ করে আছে, যদিও প্রত্যেকে একই কথা ভাবছে—সঙ্গে একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ছাড়াও পেটে ও কাঁধে বুলেট নিয়ে আহত একজন বিসিআই এজেন্ট রয়েছে, কাজেই বাহন হিসেবে সাইকেল অচল। হৃদয়হীন যে-কোন লীডার এ-ধরনের বোঝা পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু রানার পক্ষে তা

সম্ভব নয়। তাছাড়া, নাহিদ ও লায়লা ওদের মিশন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানে, কোন অবস্থাতেই ওদেরকে শত্রুর হাতে পড়তে দেয়া চলে না।

নিস্তব্ধতা ভেঙে নাহিদ বলল, 'একটা জীপ আছে।'

'দারুণ! কোথায়, নাহিদ?'

'বেকারির পিছনে, গোলাঘরে। খড়ির নিচে লুকানো। অনেকদিন হলো গোফরান ওটা লুকিয়ে রেখেছে ওখানে।'

তন্দুরের বাইরে থেকে নতুন শব্দ ভেসে এল। কে যেন কথা বলছে এয়ার হোল-এ মুখ ঠেকিয়ে। গলার আওয়াজটা গোফরানের মনে হলো। 'জলদি! বেরিয়ে আসুন!'

'জীপটা ধার চাই আমরা,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' জবাব দিল রুটিঅলা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালাতে হবে আপনাদের। কোথায় যেতে হবে জানা আছে, তাই না? আপনার সঙ্গীরা এখুনি পৌঁছে যাবে গোলাঘরের পাশে। তাড়াতাড়ি করুন।'

'দরজাটা খুলুন!'

তন্দুর থেকে আগুন তোলার কাজ চলছে। আভেন থেকে যে দরজাটা ওদেরকে আলাদা করে রেখেছে সেটা খোলা হলো, সঙ্গে সঙ্গে আগুনের হল্কা ঢুকল ভেতরে। 'ট্রে আসছে,' জানিয়ে দিল গোফরান।

তন্দুর থেকে দু'জন দু'জন করে বেরিয়ে এল ওরা। বুক ভরে ঠাণ্ডা বাতাস নিল সবাই। 'গোলাঘর! আমার পিছু নিন!' ছুটল গোফরান। শামিমের কাঁধ ধরে পিছু নিল নাহিদ। উঠানে নেমে এসে সবুজ একটা দরজা পেরুল সবাই। খড়ি আর শুকনো পাতায় অর্ধেক ভর্তি হয়ে আছে গোলাঘর। ব্যস্ত হাতে সেগুলো একপাশে সরাতে শুরু করল গোফরান। তাকে সাহায্য করল হাসান আর শামিম। একটু পরই জীপটা দেখা গেল। জীপে বার নেই, সান লাউঞ্জ নেই, কিন্তু সবাইকে উত্তেজিত করে তুলল ছাদে বসানো একজোড়া ব্রাউনিং। শুধু ছাদে নয়, প্যাসেঞ্জার সীটের সামনে হুডের ওপরও রয়েছে আরেকটা। অ্যামিউনিশন বেল্টগুলো পরীক্ষা করল রানা। সব ঠিক আছে।

'আবার আপনারা এক হন,' বলে হাসির ভঙ্গি করল গোফরান।

গোলাঘরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল শাফি, নাসের, রিয়াজ। রিয়াজের হ্যাটের অবস্থা করুণ, সম্ভবত ঘুমাবার সময়ও মাথা থেকে খোলেনি। নাসেরের চোখ জোড়া টকটকে লাল হয়ে আছে। সেই প্রথম কথা বলল, 'লায়লা কোথায়?'

কেউ কাঁধ ঝাঁকাল, কেউ হাত নাচাল। শাফি বলল, 'বেচারি খুব ক্লান্ত। ঘুমাচ্ছে। আমরা তাকে রেখে গেলে কোন সমস্যা হবে না। জাল হলেও, তার কাগজ-পত্র নিখুঁত।'

শাফির কথায় যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে রানা। লায়লা যেখানেই বিশ্রাম নিক, এখন আর তাকে ডেকে আনার সময় নেই। বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। গোফরান বলল, 'শাফি ঠিকই বলেছে।' সে থামতেই চৌরাস্তা থেকে আবার মেশিনগানের গুলি হলো। চেহারা দেখে মনে হলো রুটিঅলা কেঁদে ফেলবে। 'প্লীজ, প্লীজ, প্লীজ! তাড়াতাড়ি করুন! চোখের সামনে আপনজনেরা এভাবে একের পর এক খুন হতে

থাকলে কতক্ষণ চুপ করে থাকবে মানুষ? যে-কোন মুহূর্তে মুখ খুলবে কেউ একজন...'

'মুখ খলবে?'

'সৈন্যরা লাইন করিয়ে দাঁড় করিয়ে মানুষ মারছে। প্রতি পাঁচ মিনিটে একজন করে।' গোফরান রুটিঅলার মুখ ঝুলে পড়ল, চোখ দুটো ভেজা ভেজা। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

নাসের বলল, 'তোমাকে আমি শক্ত মানুষ হিসেবে চিনি, গোফরান। তুমি যদি...'

শূন্য দৃষ্টিতে নাসেরের দিকে তাকাল গোফরান। ঠেকাতে পারল না, ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল। 'নাসের ভাই, প্রথমেই ওরা আমার মাকে গুলি করেছে।'

প্রথমে রক্তলাল, তারপর ছাই হয়ে গেল নাসেরের চেহারা।

'আল্লাহ তাঁকে বেহেশত নসিব করুন,' বিড়বিড় করল শামিম।

'উনি মৃত্যুকে বরণ করেছেন আমাদেরকে বাঁচানোর জন্যে,' বলল রানা। 'এমন একজন মা আমাদের সবার গর্ব। ভাই গোফরান, দোয়া কোরো আমরাও যেন তোমার মত সাহসী হতে পারি।'

রানার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল গোফরান। 'আমার শুধু একটাই প্রার্থনা, আপনাদের মিশন যেন সফল হয়। প্যালেস্টাইন জিন্দাবাদ! ইহুদিবাদ নিপাত যাক!' রানার সঙ্গে কোলাকুলি করল সে। তার কাঁধে ভারী একটা হাত রাখল শামিম।

নাসের বলল, 'লায়লাকে আমি, ভাই, তোমার হাতে শঁপে দিয়ে গেলাম।'

'আমি সম্মানিত বোধ করছি,' বলল গোফরান। 'এবার আপনারা যান। আপনারা চলে গেলে ওদেরকে আমি থামাতে পারব।'

'কিভাবে?'

'মেয়েগুলোকে দিয়ে বলাব, তারা আপনাদের দেখেছে,' বলল গোফরান। 'ইসরায়েলি অফিসাররা ওদেরকে খুব পছন্দ করে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার ব্রথেলের ওরাই তো একমাত্র খদ্দের। কোন মুসলমানকে এখানে আমি ঢুকতে দিই না।'

রানা জানতে চাইল, 'আমরা গ্রাম ছেড়ে বেরুব কিভাবে?'

'জীপ চালিয়ে সোজা চলে যাবেন,' বলল গোফরান। 'খড়ির ডান দিকে গেট আছে।'

দু'হাতে কপালটা টিপে ধরল নাসের। 'লায়লার সঙ্গে দেখা করে বিদায় নেয়া দরকার। আমার বাচ্চা...'

'নাসের ভাই, আপনার পায়ে পড়ি–যান!' মিনতি করল গোফরান।

নাসের নড়ছে না দেখে তার একটা কাঁধ আঁকড়ে ধরে টান দিল শামিম, শূন্যে তুলে বসিয়ে দিল জীপে। 'আর একটাও কথা নয়। হাসান, গাড়ি ছাড়ো।'

'চৌরাস্তায় বেরুব?'

ঠাণ্ডা চোখে হাসানের দিকে তাকাল রানা। 'তুমি সময় নষ্ট করছ। বেরুবার আর কোন পথ আছে?'

প্রথমবারই স্টার্ট নিল এঞ্জিন। ইতিমধ্যে নাহিদকে জীপে তোলা হয়েছে। বাকি

সবাইও ঠাসাঠাসি করে জায়গা করে নিল। গ্রামের শান্ত, থমথমে পরিবেশে এঞ্জিনের আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। এলাকায় সৈন্যদের ছাড়া আর কারও গাড়ি থাকার কথা নয়।

ফোর-হুইল ড্রাইভে গাড়ি ছোটাল হাসান। থ্রটলে চাপ দিতেই গর্জে উঠল এঞ্জিন। ক্লাচ ছেড়ে দেয়া হলো। শুকনো খড়ি আর পাতার ওপর দিয়ে ছুটল জীপ। দিনের আলোয় বেরিয়ে এল ওরা। সরু একটা গলিতে পড়ল, দু'চাকায় গাড়ি চালিয়ে বাঁক ঘুরল হাসান, প্রথমবার বাম দিকে, দ্বিতীয়বার ডান দিকে গলির শেষ মাথায় এক চিলতে চৌরাস্তা দেখা গেল, কয়েকটা গাছের ছায়া সহ। ছায়ায় ইসরায়েলি সৈন্যরা শুয়ে আছে, সামনে তেপায়ার ওপর মেশিনগান। 'সিভিলিয়ানরা মাথা নামাও,' নির্দেশ দিল রানা। চট্ করে মাথা নামাল শাফি, নাসের ও রিয়াজ। বনেটে ফিট করা ব্রাউনিং কক করে সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা, 'ওপেন ফায়ার।'

চৌরাস্তার এক বাড়ির পাঁচিলে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দশ-বারোজন নারী-পুরুষ, বেশিরভাগই মধ্যবয়সী, কেউ কেউ বৃদ্ধ। তাদের ডান পাশে পড়ে আছে দুটো লাশ, মারা গেছে উজির গুলিতে। পাঁচজন সৈন্য বিশ হাত পিছনে এক লাইনে দাঁড়িয়েছে, তাদের পাশে শুয়ে আছে একজন, সামনে তেপায়ার ওপর একটা উজি মেশিনগান। সরু গলি থেকে বেরিয়ে আসা আওয়াজটা প্রথমে তারা কেউ চিনতে পারল না, মনে হলো বিশালাকার কোন টাইপরাইটারের শব্দ বুঝি। উজিটা ধাক্কা খেয়ে শূন্যে উঠল, ডিগবাজি খেতে খেতে ছিটকে পড়ল দূরে। দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচজন সৈন্য ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেল, সারা শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। শুয়ে থাকা লোকটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই ব্রাউনিঙের এক পশলা বুলেট তার মাথা বলতে কিছু আর অবশিষ্ট রাখল না। খানিক ডান দিকে স্টাফ কারটা দাঁড়িয়ে ছিল, বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো সেটার পেট্রল ট্যাংক।

গলির মুখ থেকে জীপ নিয়ে চৌরাস্তায় বেরিয়ে এল হাসান। ডান দিকে বাঁক নিতে যাবে, বাম দিক থেকে কড়কে উঠল একটা রাইফেল। জীপের ছাদে লেগে আকাশের দিকে উঠে গেল বুলেটটা। বাঁক ঘোরার পর সামনের রাস্তায় ইসরায়েলি সৈন্যদের ছোট একটা গ্রুপকে দেখা গেল। আবার গর্জে উঠল ব্রাউনিং। পাল্টা গুলি হলো রাইফেল থেকে, জীপের আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্তে দেখা গেল রাস্তায় শুয়ে পড়েছে সৈন্যরা, গড়াগড়ি খাচ্ছে। জ্যান্ত, রক্তাক্ত মানুষের ওপর উঠে পড়ল চাকা, ঘন ঘন ঝাঁকি খেয়ে ছুটল জীপ।

চৌরাস্তার বিপদ পিছনে ফেলে এল ওরা। 'কেফার ভিটকিন কোন দিকে?' জানতে চাইল রানা।

'এটাই রাস্তা,' বলল শাফি। 'সামনে অবশ্য একটা ট্র্যাক পড়বে।'

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এক চিলতে করে আকাশ দেখা যাচ্ছে। বাতাসে লোনা গন্ধ, তার সঙ্গে মিশে আছে শুকনো সামুদ্রিক মাছের ঝাঁঝ—সাগরের কাছাকাছি রয়েছে ওরা। পাকা রাস্তা, সমতল, বাঁকগুলো তীক্ষ্ণ নয়। শাফি জানাল, উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাবার এটাই একমাত্র পথ। সাবধান করে দিল সে, সামনে সৈন্য আছে। এরইমধ্যে নিশ্চয়ই রেডিওতে ব্রাউনিং বসানো জীপের খবর পেয়ে গেছে

তারা।

রানা ভাবছে, ওরা যে নেতানায়ার একটা গ্রামে ছিল, এ-খবর ইসরায়েলি সৈন্যরা পেল কিভাবে? 'গ্রামে তোমরা কোথায় লুকিয়েছিলে?' শাফিকে প্রশ্ন করল ও।

'গোফরান আমাদেরকে এক জায়গায় রাখেনি। আমি ছিলাম একটা মেয়ের সঙ্গে, বন্ধ দরজার ভেতর।'

'কিন্তু ওরা তো মেয়েদের ঘরগুলোও সার্চ করে, তাই না?'

'আমার কাগজ-পত্রে কোন খুঁত নেই,' বলল শাফি। সামান্য গম্ভীর, খানিকটা অভিমানী। 'কাজেই আমার ভয় পাবার কোন কারণ ছিল না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। উত্তর না জানা অনেক প্রশ্ন কানের পাশে মাছির মত ভোঁ-ভোঁ করছে।

'বাঁ দিকে,' হাসানকে বলল শাফি।

মেইন রোড ছেড়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষা ট্র্যাক-এ পড়ল জীপ, খানিক পর দু'পাশে জঙ্গল দেখা গেল। এক পর্যায়ে পরিত্যক্ত খেতের মাঝখান দিয়ে ছুটল জীপ, উঠে এল কাঁকর ছড়ানো প্রাচীন একটা পথে। 'ঘুরপথে যাচ্ছি আমরা, কেফার ভিটকিনের পিছন দিকে পৌঁছুব। একটা পাহাড় টপকে উপত্যকায় নামতে হবে, তারপর আরেকটা পাহাড় পড়বে, সেটার ওদিকে কেফার ভিটকিন। সৈন্যরা সাধারণত এদিকে আসে না।'

জীপের সামনে তিনজন বসেছে, পিছনে চারজন। নাহিদ চোখ বুজে আছে, ঘুমাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। জীপ বোল্ডারে ধাক্কা খেলে ব্যথায় কুঁচকে উঠছে মুখের পেশী। কোঁ-কোঁ যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে এক ঘণ্টা ধরে পাহাড়ে উঠছে জীপ। নিজেদের মধ্যে হিব্রু ভাষায় ফিসফাস করছে শাফি আর নাসের।

অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল নাসের। রাগে বেগুনি হয়ে গেছে চেহারা। শাফির গলাটা দু'হাতে চেপে ধরল, একটা ভাঁজ করা হাঁটু তুলে দিল বুকের ওপর। তারপর গলা ছেড়ে মাথাটা ধরল, জীপের গায়ে ঠুকছে। শামিম তার মস্ত থাবা দিয়ে চেপে ধরল নাসেরকে। গড়িয়ে পিছিয়ে গেল শাফি, খক্-খক্ কাশছে। শামিমের থাবার ভেতর মোচড় খাচ্ছে নাসের, এখনও চেঁচাচ্ছে।

গর্জে ওঠা রাইফেলের মত আওয়াজ করল রানা, 'শাট আপ!'

নাসের চুপ করল।

'কি ঘটনা?'

নাসেরের চোখ দুটো পিরিচ হয়ে উঠেছে। 'লায়লা!'

'কি হয়েছে লায়লার?'

'আমাকে বলা হয়েছে গ্রামের একটা বাড়িতে ঘুমাচ্ছে সে। অথচ শাফি এখন বলছে, একজন মিলিটারি পুলিস অফিসার লায়লাকে নিয়ে গেছে, একটা লেদার ওভারকোট পরিয়ে।' দু'হাতে মুখ ঢাকল নাসের।

রানার তলপেট খালি খালি লাগল। 'কথাটা কি সত্যি, শাফি?'

শাফি ঠোঁট কামড়াল। 'হ্যাঁ।'

'কিভাবে জানলে তুমি?'

'আমি একটা মেয়ের ঘরে ছিলাম, জানালা দিয়ে দেখলাম অফিসার তাকে ট্রাকে

তুলছে।'

'আগে কেন জানাওনি আমাকে?'

'এরইমধ্যে ক'জন মারা গেছে, গুনে দেখেছেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল শাফি। 'প্রথম মিশনের সবাই খুন হয়ে গেছে, একমাত্র মেজর নাহিদ বাদে। ফায়েদ খুন হয়েছে, খুন হয়েছে গোফরান রুটিঅলার মা। মিশনের স্বার্থেই ঘটনাটা চেপে রাখি আমি। আমাদের কাজ সাবমেরিন ধ্বংস করা, ইসরায়েলি সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করা নয়।'

'তুমি একটা পিশাচ,' চেঁচিয়ে উঠল নাসের।

'শাট আপ!' আবার ধমক দিল রানা। শাফির কথায় যুক্তি আছে। তারপর লায়লার কথা ভাবল ও। 'মেয়েটা মুখ খুলবে।'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ করল নাসের।

'অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে, কথা বলানো পানির মত সহজ,' বলল শাফি। 'তবে লায়লাকে আমি চিনি। যত টরচারই করা হোক, দুটো দিন চুপ করে থাকবে সে। এটাই নিয়ম। আমাদেরকে কাজ সারার সময় পাইয়ে দেবে।'

স্ট্র হ্যাটটা চোখের ওপর নামিয়ে আনল রিয়াজ। 'কিন্তু ইসরায়েলি সৈন্যরা কি অত বোকা? লায়লা দু'দিন চুপ করে থাকলে কারণটা তারা আন্দাজ করতে পারবে না?'

'ও আল্লাহ!' প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো নাসেরের।

'তবে শান্ত হও,' বলল রিয়াজ। 'মিলিটারি পুলিস আজেবাজে প্রশ্ন করলে উত্তরও পাবে আজেবাজে। কি জিজ্ঞেস করতে হবে তা তারা জানবে কিভাবে?'

'আমাদের কাছে একজোড়া ব্রাউনিং আছে,' বলল নাসের, 'চলুন, এম.পি. হেডকোয়ার্টার বারডেক-এ যাই, ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনি লায়লাকে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'দুঃখিত। তা সম্ভব নয়।'

রানার দিকে কাতর চোখে তাকাল নাসের। 'আমার সন্তানের কথা একবার ভাববেন না?'

'সত্যি আমি দুঃখিত,' বলল রানা। 'মিশনের স্বার্থে পিছানোর কোন উপায় নেই আমাদের।'

আর কোন কথা হলো না।

ঢাল বেয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে এল জীপ। অপরপ্রান্তের ঢাল বেয়ে নামার সময় নিচে কুয়াশা ঢাকা উপত্যকা দেখা গেল অস্পষ্ট ভাবে । গোফরান কফি ভর্তি ফ্লাস্ক দিয়েছে, সেটা খুলল নাসের। তার চোখ দুটো চক চক করছে। গাছপালায় ঢাকা পাহাড়ের একটা কাঁধ রাস্তা আর উপত্যকার মাঝখানে উঁচু হয়ে আছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ভেতর থেকে উঁকি দিল সূর্য। আহত নাহিদের চারপাশে ভন্-ভন্ করছে এক ঝাঁক মাছি। জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ট্র্যাক, দুই চূড়ার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। দূর নীলিমায় একজোড়া শকুন ঝুলে আছে। আশপাশে কোথাও সৈন্য নেই। ঢাল বেয়ে নামছে জীপ, পাহাড়ের কোণে নীল সাগরের অংশবিশেষ দেখতে পেল হাসান।

ট্র্যাক আবার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়েছে। নীল সাগর হারিয়ে গেল

ফুয়েল ট্যাংকে এখনও যথেষ্ট তেল আছে। তবে অনেক দূর যেতে হবে ওদেরকে। শাফি বলল, 'আর এক কিলোমিটার দূরে বড় রাস্তা পড়বে। সৈন্য, এবং রোডব্লক থাকতে পারে।'

'পাঁচশো গজ এগিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করে দাও, হাসানকে নির্দেশ দিল রানা। 'রাস্তায় উঠব কোন শব্দ না করে।'

এঞ্জিন বন্ধ করার পর শুধু স্প্রিঙের ক্যাঁচক্যাঁচ আর নাসেরের নাক টানার আওয়াজ শোনা গেল। গাছগুলোয় প্রচুর পাখি, কিচিরমিচির করছে। এ-সব আওয়াজকে ছাপিয়ে আরেকটা শব্দ ভেসে এল—হাসাহাসি করছে কারা যেন। শামিমের কাঁধে টোকা মারল রানা। উত্তরে মাথা ঝাঁকাল শামিম।

জীপ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল সে, ট্র্যাক ধরে ছুটল। তার বিশাল কাঁধ মিলিটারি পুলিস অফিসারের সবুজ ইউনিফর্মে ঢাকা, জঙ্গলের সঙ্গে মিশে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গিলল নাসের, মনে পড়ে গেল কি প্রচণ্ড শক্তিতে শাফির গা থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনে শামিম। চোখ ফিরিয়ে এনে শাফির দিকে তাকাল সে। লায়লা যদি ইসরায়েলি মিলিটারি পুলিসের হাতে মারা যায়, সেজন্যে দায়ী থাকবে এই শাফি।

চোখ ফিরিয়ে নিল নাসের। শাফির দিকে তাকাতে ঘৃণা হচ্ছে তার।

জীপটাকে পিছনে ফেলে দ্রুত নেমে গেল শামিম। শুকনো পাতা আর ভাঙা ডাল এড়িয়ে পা ফেলল, জঙ্গলের কিনারায় এসে উঁকি দিয়ে রাস্তায় তাকাতেই দেখতে পেল বালির বস্তা দিয়ে তৈরি এনক্লোজার, ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে মেশিন গানের মাজল, তার কাছ থেকে বিশ গজ বাঁ দিকে। এনক্লোজারের পাশে লাল-সাদা রঙ করা একটা বার আড়াআড়িভাবে ফেলে রোডব্লক তৈরি করা হয়েছে। ট্র্যাক থেকে গড়িয়ে রাস্তায় পড়লে জীপটা ওই রোডব্লকের পিছনে পড়বে।

পিছিয়ে এল শামিম। উপত্যকার কিনারা ধরে দ্রুত হেঁটে চেক পয়েন্টটাকে পাশ কাটাল। অনেকটা ওপরে উঠে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল মেশিন গানের কাছে কেউ নেই। রাস্তার ধারে, ঘাসের ওপর, শুয়ে রয়েছে পাঁচজন ইসরায়েলি সৈনিক, সবাই সিগারেট ফুঁকছে, কথা বলছে নিজেদের মধ্যে, মাঝে মধ্যে গলা ছেড়ে হেসেও উঠছে।

রাস্তার সঙ্গে সমান্তরাল রেখা ধরে আরও পঞ্চাশ গজ এগোল শামিম, তারপর কাঁধ থেকে উজি নামিয়ে তলপেটের কাছে বাগিয়ে ধরল, হেলমেটটা নামিয়ে আনল চোখের ওপর, জঙ্গলের কিনারা থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা ধরে হাঁটছে। সোজা সৈনিকদের দিকে।

বুটের আওয়াজ পেয়ে লোকগুলো তাকাল। এরকম প্রকাণ্ডদেহী এম.পি. অফিসার আগে কখনও দেখেনি তারা। একটা কৌতুক বলছিল সার্জেন্ট, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সিধে হলো। 'স্যার?' হতভম্ব হয়ে জানতে চাইল সে, 'গাড়ির আওয়াজ পেলাম না, আপনি কোত্থেকে…'

বাকি চারজন বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি, এখনও শুয়ে আছে ঘাসের ওপর।

*

পাহাড়ী ঢালে দাঁড়িয়ে থাকা জীপ থেকে কিছুই ওরা শুনতে পায়নি। একটা কোকিল ডাকছে। ঘন ঘন ডানা ঝাপটে একটা পায়রা উড়ে গেল। তারপর আবার নিস্তব্ধতা। এমন এক নিস্তব্ধতা, অপারেশন থিয়েটারের কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে। পাঁচ মিনিট পর কোকিলের ডাককে ম্লান করে দিল একটা পেঁচার ডাক। 'গাড়ি ছাড়ো,' বলল ও।

হাসান এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছাড়ল। রানার মত সে-ও জানে এঞ্জিনের আওয়াজ শোনার জন্যে শত্রুরা কেউ বেঁচে নেই।

রাস্তার কিনারায় অপেক্ষা করছিল শামিম, দীর্ঘ ও বাঁকা একটা ছোরার ফলা ঘষছে ঘাসে। রাস্তার উঁচু ঘাস-ঢাকা পাড়ে খয়েরি ইউনিফর্ম পরা পাঁচজন লোক একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। ফুলের ওপর শুয়ে আছে সবাই, হলুদ আর সাদা ফুলগুলো বেশিরভাগই লাল হয়ে গেছে। লাফ দিয়ে জীপে চড়ল শামিম। স্পীড বাড়িয়ে দিল হাসান।

অকস্মাৎ আঁতকে ওঠার শব্দ। শাফির দৃষ্টি অনুসরণ করে ফেলে আসা রাস্তার দিকে তাকাতেই লোকটাকে দেখতে পেল নাসের, ট্রাউজারের চেইন লাগাচ্ছে, বেরিয়ে আসছে রাস্তার পাশের ঝোপ থেকে। জীপের আওয়াজ শুনেছে সে, ধরে নিয়েছিল নিজেদের বাহন হবে। জীপের রঙ বাদামী দেখে ভুলটা ভাঙল। কাঁধ থেকে উজি নামিয়ে লক্ষ্যস্থির করছে।

এক পশলা বুলেট ছুটে এল। টং করে আওয়াজ হলো, জীপের কোথাও লেগেছে। পরমুহূর্তে নাসেরের হাতে গর্জে উঠল উজি। ঝাঁকি খেলো লোকটা, রাস্তায় পড়েও থামল না, গড়াতে গড়াতে এনক্লোজারের ভেতর সেঁধিয়ে গেল।

'থামো।' নির্দেশ দিল রানা।

জীপ থামাতেই নিচে নামল শামিম, হাতে শটগান, গুলি করতে করতে এনক্লোজারের দিকে ছুটছে। এনক্লোজারের ভেতর ফিল্ড টেলিফোন রয়েছে, রিসিভার তুলে কথা বলছে লোকটা। শটগানের গুলি লেগে তার মাথার হেলমেট উড়ে গেল, পরের বুলেটটা ফুটো করে দিল কপাল।

জীপের কাছে ফিরে এল শামিম। 'আর কোন সমস্যা নেই।'

'আছে,' বলল রানা। 'পেট্রল ট্যাংকে বুলেট লেগেছে। লোকটা কি হেডকোয়ার্টারে ফোন করতে পেরেছে?'

'বলা মুশকিল। সব তেল বেরিয়ে গেছে?'

'সব।'

রানা, নাসের আর শাফি জীপের পিছনে চলে এল। শামিমও কাঁধ দিয়ে ঠেলা দিচ্ছে। চাকাগুলো গড়াতে শুরু করল। হাসান হুইল ধরে আছে। স্পীড বাড়ল জীপের, কয়েকটা বোল্ডার টপকে ধাতব আওয়াজ তুলে পড়ে গেল গভীর নালায়।

রেডিওর সামনে উবু হয়ে বসেছে রিয়াজ, টিউনিং ডায়ালে চোখ। রানা নির্দেশ দিল, 'এখন থেকে রেডিও সাইলেন্স বজায় রাখতে হবে, প্লীজ।'

মাথা ঝাঁকাল রিয়াজ। প্যাকটা কাঁধে ফেলল সে। 'কত দূর?'

'সাগর এখান থেকে বিশ কিলোমিটার,' জবাব দিল শাফি। 'মাঝখানে একটা

রিজ পড়বে। বেশ উঁচু।'

হাই তুলে তামা দিয়ে জড়ানো বাক্স দুটো কাঁধে তুলল হাসান। 'অনেকক্ষণ গাড়ি চালিয়েছি, হাঁটতে ভালই লাগবে।'

'নাহিদকে সাহায্য করছি আমি,' বলল শামিম।

নিজের পায়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাহিদ। মুখ রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে। চোখের নিচে কালি। ক্রাচটা তুলে শামিমের বুকে ঠেকাল সে। 'আমি একাই পারব।'

নাসের একটা ব্যাগ তুলল কাঁধে। ওটায় ইউনিফর্ম আছে।

'শাফি সামনে থাকো,' বলল রানা। 'মার্চ।'

শুরু হলো পদযাত্রা। উপত্যকার মেঝে থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে খাড়া উঠে গেছে ট্র্যাক অনেক কাল আগে গাধার পিঠে তুলে মাল বহন করা হত, পাথর কেটে ধাপ তৈরি করা হয়েছে, ধাপের কিনারায় ছয় ইঞ্চি উঁচু পাঁচিল, ছাগল বা গাধা যাতে নিচে না পড়ে যায়। ঝোপ-ঝাড় খুব সামান্যই। এক পর্যায়ে একটা গভীর খাদে নামল ওরা। পাথরে শব্দ করছে নাহিদের ক্রাচ, ব্যান্ডেজ বাঁধা ক্ষতগুলোকে ঘিরে ভন্ ভন্ করছে মাছি।

বেলা এগারোটার দিকে মেঘে ঢাকা পড়ে গেল সূর্য। খাদ থেকে ঢাল বেয়ে পাহাড়ের একটা কাঁধে চড়ল ওরা। সরু পথ ধরে চূড়ায় পৌঁছুল। প্যাঁচানো পথ, আবার নামছে। কাঁধে রেডিও প্যাকের বোঝা, হাঁপিয়ে গেছে রিয়াজ। শাফির ছন্দপতন ঘটছে না, মাপা পা ফেলে দ্রুত হেঁটে চলেছে। সবাই মাঝে মধ্যে কথা বলছে, একা শুধু নাসের বাদে।

দুপুরে বৃষ্টি নামল। আকাশের দ্রুতগতি মেঘ ভয় পাইয়ে দিল ওদেরকে। শাফি বলল, 'আর মাত্র একটা পাহাড় টপকাতে হবে।'

'কত দূর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এক ঘণ্টা লাগবে,' বলল শাফি। 'তবে ঝড় শুরু হলে আশ্রয় দরকার হবে। আমি একটা গুহা চিনি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমরা কোথাও থামব না। বিশেষ করে কোন গুহায়।'

'এটা নিরাপদ গুহা,' বলল শাফি। 'ঝড় উঠলে পাথর ধস শুরু হতে পারে।'

'গুহাটা কতদূরে?'

'বিশ মিনিটের মধ্যে পেয়ে যাব।'

ক্রাচটা ছিটকে গেল একদিকে, সেই সঙ্গে আছাড় খেয়ে পড়ল নাহিদ। পড়ার পর আর নড়ছে না। তার পাশে হাঁটু গাড়ল শামিম। এমনিতে তার চেহারায় কোন ভাব ফোটে না, এই মুহূর্তে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'কপাল পুড়ে যাচ্ছে—জ্বর।'

'ওকে তুমি বইতে পারবে?'

জবাবে নাহিদকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঘুরল শামিম। বৃষ্টি থেমে গেল। একটা খাদ থেকে লাইমস্টোনের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছে ওরা। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী বাঁক নিয়ে উঠেছে ঢালটা। শামিমের ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ পাচ্ছে রানা। ঢালের মাথায় উঠে এল ওরা। সামনে পাহাড়-প্রাচীর প্রায় আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে। প্রাচীরের সামনে ছোট একটা মালভূমি, সরু হতে হতে খুদে নালায় পরিণত হয়েছে।

নালাটা প্রাচীরের গোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত, শেষ মাথায় প্রচুর বোল্ডার স্তূপ হয়ে আছে। 'এখানে,' বলল শাফি।

ঢালের মাথায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, কান পেতে। 'লুকাও! গুহার ভেতর, জলদি!'

পরমুহূর্তে আওয়াজটা সবাই শুনতে পেল। প্লেন এঞ্জিনের যান্ত্রিক গুঞ্জন। ছুটল সবাই। কিন্তু আওয়াজটা একেবারে মাথার ওপর চলে এল। গুহার ভেতর ঢোকার সময় পাওয়া যাবে না, কাজেই আবার চিৎকার করল রানা, 'শুয়ে পড়ো!' চারপাশে বোল্ডার, লাইমস্টোনের মেঝেতে শুয়ে পড়ল সবাই। ধীর, অলস ভঙ্গিতে মাথার ওপর চলে এল ইসরায়েলি এয়ারফোর্স-এর একটা অবজারভেশন প্লেন। দুটো বোল্ডারের মাঝখানে চিৎ হয়ে রয়েছে রানা। প্লেনটা খুদে মালভূমিকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। প্লেনটা ছোট, পিছনের সীটে বসে আছে অবজারভার, চোখে সাঁটা বিনকিউলার। লোকটাকে পরিষ্কারই দেখতে পেল ও।

পাহাড়-প্রাচীরের ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল প্লেন। শান্তি মিশনের সদস্যরা সিধে হলো, ক্লান্ত শরীর টেনে নিয়ে এল গুহার ভেতর। প্রবেশপথটা সরু একটা ফাটল ছাড়া কিছু নয়। তবে ভেতরে মাঝারি একটা কামরার মত জায়গা পাওয়া গেল। মেঝের পাথরে অসংখ্য ফাটল, ছাগলের বিষ্ঠায় ভরা। সিলিংটা এত উঁচু, অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখার নেই। দেয়ালগুলো মসৃণ, ভেজা ভেজা। ছাদ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ছে।

স্ট্র হ্যাটে হাত রেখে রিয়াজ জানতে চাইল, 'প্লেন থেকে ওরা কি আমাদেরকে দেখে ফেলেছে?'

কাঁধ থেকে প্যাক নামাল রানা। 'বোঝা গেল না। বিশ মিনিট। তার বেশি এখানে থাকা উচিত হবে না।'

'আমাদেরকে দেখে থাকলে যে-পথে এসেছিল সে-পথেই ফিরে যেত পাইলট, তাই না?' রিয়াজকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। 'রিপোর্ট করার জন্যে?'

রানার সঙ্গে চোখাচোখি হলো, রানা মাথা ঝাঁকাতে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল শামিম। 'হাসান, নাহিদকে দেখো। শাফি, কিছু খাওয়াও।'

নাহিদের চোখ খোলা। হাসান তার পাশে বসছে দেখে বলল, 'ব্যথা!'

তাকে একটা মরফিন ইঞ্জেকশন দিল হাসান 'এখুনি আরাম পাবে, দোস্ত।'

চোখ বুজল নাহিদ, ঘুমিয়ে পড়েছে। পেটের ব্যান্ডেজটা খুলল হাসান। খোলার পর এক চুল নড়ল না। তারপর ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল।

পেটের ডান দিকে গভীর একটা গর্ত। ক্ষতের চারপাশ হলুদ হয়ে গেছে, ভেতরটা দগদগে ঘায়ের মত, লাল। পচা মাংসের গন্ধ ঢুকল নাকে। বুলেটটা ডান দিকে ঢুকে বাঁ দিকে সরে গেছে। অ্যাবডোমিনাল পেশীগুলো ভেদ করে কতটা ভেতরে ঢুকেছে বলা কঠিন। হাসানের কাছে এমন কোন ডাক্তারী সরঞ্জাম নেই যে ক্ষতির পরিমাণ পরিমাপ করতে পারবে। ফার্স্ট-এইড বক্স হাতড়ে সালফা পাউডার ভর্তি একটা ক্যান বের করল সে। গর্তটা পাউডারে ভরে নতুন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। কাঁধের ক্ষতটা তেমন বিপজ্জনক নয়।

'কি রকম বুঝছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

সিগারেটে কষে টান দিল হাসান। 'জানি না…নাহিদ হয়তো ভাগ্যবান।'

'পনির আর রুটি,' বলল শাফি। 'কাপ ভর্তি করে কফি দিতে পারছি না–এক কাপ দু'জন ভাগ করে খেতে হবে।'

রানা নাহিদের কথা ভাবছে। ওকে ফেলে গেলে বাঁচবে না। তাছাড়া, প্লেনের অবজারভার ওদেরকে দেখে থাকলে এক সময় সৈন্যরা এখানে পৌঁছুবেই। নাহিদকে কথা বলাবে তারা। চোখ বুজে আসছে, তাড়াতাড়ি সিধে হলো ও, আধ কাপ কফি খেয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল। তারপর এগোল গুহার মুখের দিকে।

নালা যেন একটা করিডর, করিডরের ছাদ আকাশ। বাইরে ঝড় শুরু হয়েছে। শামিমকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। রানার পাশে এসে দাঁড়াল শাফি। 'আর ছোট্ট একটা পাহাড় টপকালেই সাগর।'

'দূরত্ব?'

'বিশ কিলোমিটার।'

'পাহাড়ের ওপাশে ঝড় নেই,' বলল শাফি। হাসছে সে। 'আরেকটা পথ আছে, গুহার ভেতর দিয়ে।'

'মানে?'

রানার হাত ধরে গুহার ভেতর টেনে নিয়ে এল শাফি, পিছনের দেয়ালে ছায়া ঢাকা একটা ফাঁক দেখাল। 'এক সময় এই জায়গায় পাহাড়-প্রাচীর থেকে একটা নদী বেরিয়ে আসত। নদীটা এখনও আছে, তবে নতুন একটা সহজ পথ পেয়ে গেছে। এখন সেটা উপত্যকায় নেমেছে হামাক রোডের কাছাকাছি। এক লোক একবার আমাকে বলেছিল, সে নাকি পাহাড়ের তলা দিয়ে হেঁটে অপরপ্রান্তে বেরুতে পেরেছিল। ভেতরে শ্যাফট, জলপ্রপাত ইত্যাদি সবই আছে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়।' হাতঘড়ি দেখল। পনেরো মিনিট হলো এখানে রয়েছে ওরা। 'আর তিন মিনিট পর রওনা হব আমরা। নালা ধরে যাব।'

গুহায় ঢুকল শামিম, সামান্য হাঁপাচ্ছে। 'ইসরায়েলি পেট্রল!'

স্থির হয়ে গেল রানা। 'ক'জন?'

'সম্ভবত ত্রিশ।'

গুহার মুখে এসে দাঁড়াল রানা। মালভূমির কিনারায় অস্পষ্টভাবে দেখা গেল মূর্তিগুলো। শুধু মানুষ নয়, সঙ্গে চারপেয়ে জন্তুও আছে। শামিম বলল, 'তুমি নির্দেশ দিলে পাহাড়ে উঠে যাই আমি, ওদেরকে এদিক থেকে সরিয়ে দিই।'

'না,' বলল রানা। সৈন্যদের সরিয়ে দেয়া সম্ভব, কিন্তু কুকুরগুলোকে ফাঁকি দেয়া যাবে না। 'গুহার ভেতর ঢোকো সবাই।'

'মাসুদ ভাই, আমরা ফাঁদে আটকে পড়ব!' প্রতিবাদ করল শামিম।

'পিছনের দেয়ালে একটা ফাঁক আছে। ভেতরে নদী পাব।'

মালভূমি থেকে একটা কমান্ড ভেসে এল, সৈন্যদের লাইনটা স্থির হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের উজিটা তুলল শামিম। গুলি হলো এক পশলা, তবে লাইন থেকে মাত্র একটা লোক ছিটকে পড়ল। শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে নালায় নেমে

গেল রানা, স্থির হয়ে গুলি করল, দেখাদেখি গড়িয়ে ওর পাশে চলে এসেছে শামিমও। ওদের মাথার ওপর পাথরে লাগছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট, পাল্টা গুলি করছে ইসরায়েলি সৈন্যরা। 'আমি কাভার দিই, তুমি গুহায় ঢোকো,' বলল শামিম।

গুহার মুখে ঢুকেছে রানা, নালার দূর প্রান্তে চারজন সৈনিককে দেখা গেল। বেল্টে কি যেন হাতড়াচ্ছে শামিম। হাতটা উঁচু করল সে, ঝাঁকি খেলো। কালো ডিম-গ্রেনেড। নালার মুখে পড়েছে কি পড়েনি, বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো। আর্তনাদ শোনা গেল। তবে গুলি বর্ষণ বেড়ে দ্বিগুণ হলো, গুহার মুখ ভেঙে চওড়া করে ফেলছে।

গুহার ভেতর পিছিয়ে আসছে রানা, ভাবছে-ওরা আমাদের খোঁজ পেল কিভাবে? কুকুর? নাকি কোন ধরনের সংকেত পেয়ে এসেছে? এখন অবশ্য এ নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা। ইসরায়েলিরা রিইনফোর্সমেন্ট চেয়ে রেডিও মেসেজ পাঠাবে। কিংবা রিইনফোর্সমেন্ট হয়তো এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে। এখন যদি মর্টারের একটা গোলা পড়ে গুহার মুখে, একজনও বাঁচবে না ওরা।

ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ঢুকছে গুহার ভেতর। ছাদ ধসে পড়ছে, খসে পড়ছে দেয়ালের ছাল। 'হাসান,' ডাকল রানা। ছুটে পাশে চলে এল হাসান। রানার কথা শুনে মাথা ঝাঁকাল সে, ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ছায়ার ভেতর।

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে শাফিকে ডাকল রানা। 'ফাঁকটা পরীক্ষা করেছ?'

'জ্বী, স্যার।'

ক্রল করে গুহার মুখে চলে এল রানা। পাঁচ গজ দূরে বোল্ডারের আড়ালে ওত পেতে বসে রয়েছে শামিম। 'শামিম, এসো-টানেলে ঢুকতে হবে।'

থমথমে চেহারায় স্বস্তি ফিরে এল, শামিম বলল, 'সত্যি কি কোন টানেল আছে?'

চার মিনিট পর। গুহার পিছনে, বোল্ডারগুলোর আড়ালে, হাসান একা। গুহার প্রবেশমুখ সাদা, সরু জানালা, ওপর দিকটা ক্রমশ আরও সরু হয়ে গেছে। বাকি সব অন্ধকার। গুহার মেঝেতে ফাঁকটার দিকে তাকাচ্ছে না সে, তবে গর্তটা থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগছে হাতে। এই গর্তের ভেতর তার সঙ্গী ও বন্ধুরা ঢুকেছে, হাতের কাজ সারার পর তাকেও ঢুকতে হবে।

এক ঝাঁক বুলেট ঢুকল ভেতরে, রিকোশে-র আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল। প্রবেশমুখের বাইরের আলো অকস্মাৎ লোকজনের ভিড়ে ঢাকা পড়ে গেল, ছুটছে, গুলি করছে বিরতিহীন। বাগিয়ে ধরা হাসানের উজি থেকে এক পশলা উত্তপ্ত সীসা ছুটল। কিনারা ধরে গর্তের ভেতর ঝুলে পড়ল সে, একজোড়া রশি বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে অন্ধকার গহ্বরে।

দু'জন সৈনিক প্রবেশমুখের বাইরের দেয়ালে গা সেঁটে দাঁড়াল, পিন খুলে ভেতরে ছুঁড়ে দিল দুটো গ্রেনেড। বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ হলো, বাইরে বেরিয়ে এল আলোড়িত ধোঁয়া। নিশ্চিত হবার জন্যে আরও দুটো গ্রেনেড ছুঁড়ল তারা, আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রত্যাশিত আওয়াজের পরিবর্তে প্রচণ্ড গর্জন শোনা গেল, গুহামুখ থেকে বেরিয়ে এল আগুনের চওড়া শিখা, তাতে বোল্ডারগুলো ঢাকা পড়ে গেল, গুহামুখে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দু'জন পরিণত হলো নিক্ষিপ্ত কামানের গোলায়, নালার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল মালভূমিতে। পাথর বৃষ্টির নিচে চাপা পড়ল তারা। গুহাটা অদৃশ্য হয়েছে, সেখানে এখন নিরেট পাহাড়-প্রাচীর।

রশি বেয়ে বিশ ফুট নেমে এসেছে, এই সময় গর্জনটা শুনতে পেল হাসান। হাতের জোড়া রশি ছিঁড়ে গেল কোথাও। উত্তপ্ত বাতাস তার ভুরু পুড়িয়ে দিল। সে ভাবছে, থারটি সেকেন্ড টাইম পেন্সিল সহ এক কিলো প্লাস্টিক লাইমস্টোনের গুহাটাই শুধু ধসিয়ে দেবে না, গুহার বাইরে যারা থাকবে তাদেরকেও খুন করবে। ভেজা পাথরে খসে পড়ল সে, ব্যথায় চিৎকার করে উঠল, 'বাবারে!' ফুসফুসে ধুলো ঢুকেছে, মাথার ওপর পাথর খসে পড়ছে। টর্চের হলুদ আলো জ্বলতে দেখল। পাথরগুলো খুদে আকৃতির, খুলি ফাটেনি। পায়ে ব্যথা, তবে শুধু মচকে গেছে, হাড় ভাঙেনি। বুক পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করল। টর্চের আলোয় সিগারেটের ধোঁয়া অলস ভঙ্গিতে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। অথচ মাত্র কিছুক্ষণ আগে বাতাসের ঠাণ্ডা স্পর্শ পেয়েছিল সে।

'মনে হচ্ছে ছাদ ধসে পড়েছে।'

'হ্যাঁ,' রানার গলার সুর হালকা। 'ধন্যবাদ, হাসান।'

গর্তের মুখ এত সরু যে নিচে নামতে শামিম আর রিয়াজের সমস্যা হয়েছে। নিচে এসে টানেলটা চওড়া হয়ে গেছে। রানা নির্দেশ দিল, 'শুধু চলার সময় টর্চ জ্বালবে, তা-ও মাত্র একটা।' টানেল অন্ধকার হয়ে গেল। 'শাফি,' বলল ও। 'তোমার পরিচিত এক লোক পাহাড়ের তলা দিয়ে আরেক দিকে বেরুতে পেরেছিল, তাই না? ঠিক কি বলেছিল, শোনাও।'

'দু'বছর আগের ঘটনা…' ইতস্তত করছে শাফি। 'শ্যাফট বেয়ে নিচে নামার পর একটা নদী পায় সে। বলেছিল, অনেকগুলো প্যাসেজ আছে, কিন্তু নদীটা মাত্র একটা প্যাসেজ ধরে এগিয়েছে। খানিক দূর এগোবার পর অন্য একটা প্যাসেজে মিলিত হয়েছে, খানিকটা নিচের স্তরে সেটা। তারপর আরেকটা। অনেক প্যাসেজ কানাগলির মত, কয়েকটায় পানি আছে। তবে অপরপ্রান্তে বেরুবার পথ অবশ্যই আছে, কারণ তা না হলে লোকটা বেরুতে পারত না। তবে বেশ কয়েকদিন সময় লাগে তার।'

মনে মনে হতাশ বোধ করল রানা। তবে সেটা কাউকে বুঝতে না দিয়ে দ্রুত নির্দেশ দিল, 'নাসের আর শামিম, তোমরা নাহিদকে তোলো। আমি সামনে থাকব।'

নাহিদের ক্রাচে স্ট্র্যাপ লাগিয়ে চেয়ার বানানো হলো। টর্চ জ্বালল রানা। টানেল ধরে রওনা হয়ে গেল ওরা। ভেজা গ্যালারি দেখা গেল, ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। গ্যালারির ছাদ অনেক উঁচু, কোথাও কোথাও টর্চের আলো নাগাল পেল না লাইমস্টোনের দেয়াল বেয়ে পানির ধারা নেমে আসছে। তারপর মেঝেতে নুড়ি পাথর দেখা গেল। চল্লিশ ডিগ্রীর মত কাত হয়ে আছে পথ। দুশো গজ এগিয়ে এসেছে ওরা। রানার কম্পাস পশ্চিম দিকটা নির্দেশ করছে। এরপর গ্যালারি উত্তর দিকে ঘুরে

যেতে শুরু করল। দশ গজও এগোয়নি, টর্চের আলোয় দেখা গেল ছাদ ঢালু হয়ে নিচে নেমে এসেছে, ডুবে গেছে থই থই পানিতে। অর্থাৎ প্রথম প্যাসেজের এখানেই সমাপ্তি। পিছনে বন্ধ হয়ে গেছে শ্যাফট, সামনে এগোবার কোন পথ নেই। নিরেট বাস্তবতাই বলে দিল, জ্যান্ত কবর হবার অপেক্ষায় বসে থাকো এখন।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল হাসান। ইউনিফর্মের বোতাম খুলছে সে। 'পানিতে নেমে দেখা দরকার কত দূর যাওয়া যায়, নতুন কোন প্যাসেজ পেয়ে যেতে পারি।' সদ্য ধরানো সিগারেটের ধোঁয়া পানির ওপর দিয়ে সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

'একটা রশি নাও।'

কোমরে একটা রশি বাঁধল হাসান, ওয়াটারপ্রুফ টর্চটা হাতে থাকল, সাবধানে পা ফেলে নেমে পড়ল পানিতে। পানি এত ঠাণ্ডা, মুহূর্তে কাঁপন ধরে গেল শরীরে। দাঁতে দাঁত চেপে হাঁটছে। নিচে মেঝে ক্রমশ ঢালু। তিন পা এগোতেই বুকের ওপর উঠে এল পানি। তারপর সাঁতরাতে শুরু করল সে। গ্যালারির নেমে আসা ছাদ আর পানির মাঝখানে নিশ্চয়ই কোন ফাঁক বা ফাটল পাওয়া যাবে, এই বিশ্বাস নিয়ে এগোচ্ছে।

দু'সারি দাঁতের ফাঁকে টর্চ আটকে ডুব দিল হাসান।

টর্চের আলো পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল রানা। রশিটা এখনও এগোচ্ছে। খানিক পর সেটা স্থির হয়ে গেল ওর হাতে। ভয়ে শিরশির করে উঠল গা। হাসান ডুবে গেল না তো?

রশিটা টানল রানা। পাশে এসে দাঁড়াল শামিম।

হঠাৎ দূর থেকে হাসানের গলা ভেসে এল, সেই সঙ্গে টর্চের আলোও দেখতে পেল ওরা। 'মাসুদ ভাই, চলে এসো।' ব্যাটলড্রেস ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে ভরে পানিতে নামল রানা, বাকি সবাই ওর পিছু নিল। পানি পেরিয়ে চওড়া একটা কার্নিসে উঠল সবাই। রানার নির্দেশে স্টোভ জ্বালানো হলো। কাপড় পরার শক্তি নেই নাহিদের, হাসান তাকে সাহায্য করল। গরম সুপ খেলো ওরা। পানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে হাসান লক্ষ করল সারফেস ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। ব্যাপারটা চেপে রাখল সে।

পাঁচ মিনিট পর রানা বলল, 'চলো, রওনা হই।' কার্নিসটা আরও চওড়া হয়ে ধাপে ধাপে নিচের দিকে নেমে গেছে। সামনে আবার পানি পেরুতে হলো, তবে মাত্র কোমর সমান উঁচু। মাথা নিচু করে হাঁটছে নাসের, হাত দুটো পকেটে, নাহিদের ক্রাচ ব্যথায় অবশ করে তুলেছে একদিকের কাঁধ। নাহিদের হাতের স্পর্শ মার্বেলের মত ঠাণ্ডা। বিসিআই এজেন্ট মেজর নাহিদ যে মারা যাচ্ছে, নাসেরকে তা বলে দেয়ার দরকার নেই। নির্দিষ্ট কারও ওপর নয়, তবে তার রাগ হচ্ছে প্রচণ্ড। অচেনা এক লোককে কেন আমি বইছি, ওরা কে আমার? ওরা তো দিব্যি আমার বউকে ফেলে চলে এসেছে! সে একজন গেরিলা, জানে যুদ্ধের সময় মূল্যবান অনেক কিছুই বলি দিতে হয়। কিন্তু কিছু জিনিস আছে অমূল্য, এমনকি যুদ্ধের সময়ও বলি দেয়া যায় না। যেমন, তোমার আসন্ন প্রসবা প্রিয় স্ত্রীকে, বা যে সন্তান জন্ম নিতে যাচ্ছে তাকে পাহাড়ের গভীরে মনে মনে প্রতিজ্ঞা নিল নাসের। যদি বাঁচি, এখন থেকে যাদেরকে ভালবাসি তাদের জন্যে বাঁচব। রানা, শামিম, হাসান—ওদের সবার ওপর রাগ হচ্ছে তার

গ্যালারি ধরে এগোল ওরা। ঢালের মাথায় গ্যালারির ইতি ঘটল, পাথরের একটা দেয়াল বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রানার টর্চ দেয়ালের মাথার দিকে উঠে গেল। বিশ ফুট ওপরে একটা ফাটল। ফাটল মাত্র এক ফুট চওড়া, ভেতর থেকে গুরু-গম্ভীর একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। পাঁচিল বেয়ে ওপরে উঠল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে ফাটলে ঢুকে অপরপ্রান্তে তাকাল। চারদিকে টর্চের আলো ফেলে কিছুই দেখা গেল না। শব্দ শুনে বোঝা গেল নিচে কোথাও একটা জলপ্রপাত আছে। শামিম আর হাসানকে রশি নিয়ে ওপরে উঠতে বলল রানা। ফাটলের কিনারা থেকে রশি ফেলেও তল পাওয়া গেল না। 'একজোড়া রশি এক করে নামছি আমি,' বলল ও। 'যদি কোন পথ পাই, রশিতে দু'বার ঝাঁকি দেব। প্রথমে নাহিদকে নামাবে তোমরা।'

নামার সময় দেয়ালের গায়ে কোন গর্ত পেল না রানা। ফাটলের কিনারা থেকে টর্চের আলো ফেলছে হাসান, কিন্তু রানা এত নিচে নেমে এসেছে, আলোটা নাগাল পাচ্ছে না। পানির গর্জন বজ্রপাতের মত শব্দ করছে। নিজের টর্চটা জ্বেলে নিচের দিকে তাক করল রানা। ষাট ফুট নিচে চকচকে কি যেন দেখা যাচ্ছে। চিনতে পারল রানা, জলপ্রপাতই। নদীটা বিশাল, শ্যাফট-এর পাশ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামছে অবিচ্ছিন্ন ধারায়। নিচে নদী, কাজেই নদীর কিনারা থাকা সম্ভব। আছে কিনা জানতে হলে সবটুকু নামতে হবে।

সাবধানে নামছে রানা, নদীটা আর বেশি নিচে নয়, এই সময় ওর বাম দিকে আরেকটা জলপ্রপাতের অস্তিত্ব ধরা পড়ল। রানা আন্দাজ করল, দ্বিতীয় রশির শেষপ্রান্তে চলে আসছে ও। দেয়াল এখনও মসৃণ। বাম দিক থেকে বাতাসের তীব্র ঝাপটা আসছে, নিচের দিকে ছুটন্ত বিপুল জলরাশি পাহাড়ের গভীর অভ্যন্তরে রীতিমত ঝড় তুলছে। জলকণার তুমুল বর্ষণে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঠাণ্ডায় হি-হি করছে রানা। শরীরের সমস্ত পেশী অবশ হয়ে আছে। কি হবে, নিচে যদি কোন কার্নিস না থাকে? দেয়ালটা যদি গভীর নদীতে নেমে গিয়ে থাকে?

পিঠে কি যেন ঠেকল। ভয় পেয়ে আঁতকে উঠতে যাচ্ছিল, তারপর উপলব্ধি করল, একটা কার্নিসে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে সে। টর্চটা আবার জ্বালল। কার্নিসটা চার ফুট চওড়া, বিশ ফুট লম্বা, সামনেই স্তূপ হয়ে আছে কিছু ভেজা ও চকচকে বোল্ডার। কার্নিসের কিনারা থেকে টর্চের আলো ফেলে এখনও নিচে কিছু দেখতে পেল না। শুধু বিকট গর্জন তুলে অদৃশ্য জলরাশি গভীর খাদে নেমে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, খাদে খরস্রোতা একটা নদী তৈরি হয়েছে, কিন্তু এত নিচে যে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না।

রশিতে দু'বার ঝাঁকি দিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকাল রানা, হাঁপাচ্ছে।

ক্রাচটাকে চেয়ার বানানো হয়েছে আগেই, সেটায় বসে নিচে নামল নাহিদ, ওপর থেকে রশি ছাড়ছে শামিম আর হাসান। তারপর নিচে নামানো হলো তিনটে প্যাক, অস্ত্র আর রেডিও। রিয়াজ আর নাসের একসঙ্গে নামল। আশ্চর্যই বলতে হবে, স্ট্র হ্যাটটা আগের মতই রিয়াজের মাথায় সাঁটা। তারপর নামল শাফি আর হাসান, সবশেষে শামিম।

সিধে হলো রানা, নাড়াচাড়া করে আঙুলের আড়ষ্ট ভাবটা কাটাচ্ছে। বড় একটা বোল্ডারে রশি পেঁচিয়ে আবার নেমে গেল কার্নিসের কিনারা থেকে।

এবারের নামাটা তেমন কঠিন হলো না। পা রাখার মত খাঁজ আর গর্ত পাওয়া গেল। চল্লিশ ফুট নামার পর টর্চের আলোয় কুয়াশা দেখতে পেল রানা. কুয়াশার নিচে হলদেটে জলপ্রপাত। আরও বিশ ফুট নামার পর পায়ের তলায় শক্ত পাথর পেল। চারদিকে টর্চের আলো ফেলে বুঝতে পারল, এটা কার্নিস নয়। পানির গর্জনই বলে দিল, জলপ্রপাতের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সৈকতে।

রশিতে দু'বার ঝাঁকি দিল রানা। তারপর টর্চ জ্বেলে ঘোড়ার নাল আকৃতির সৈকতটা পরীক্ষা করার জন্যে এগোল। নাল-এর ডান বাহুর শেষ মাথায় নিরেট দেয়াল, বাম বাহুর শেষ মাথায় খুদে একটা ফাঁক। ফাঁকটা এত সরু, ভেতর দিয়ে মানুষ গলবে না। তবে নদীর আলোড়িত পানি ঢুকছে ভেতরে, স্রোত তেমন জোরাল নয়।

প্রথমে ওরা নাহিদকে নামাল। তারপর বাকি সবাই নেমে এল প্যাক ও অস্ত্র নিয়ে। পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলল রানা। দুশো ফুট ওপর থেকে নামছে জলপ্রপাতের ধারা, নদীতে এতবেশি স্রোত যে ওরা কেউ নামা মাত্র হারিয়ে যাবে অজানা পথে। সৈকত ধীরে ধীরে ডুবছে, অর্থাৎ নদীর উচ্চতা বাড়ছে। নেমে রশি খুলে নেয়ার পর এখন আর ওদের পক্ষে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। এই সৈকত থেকে বেরিয়ে যাবারও অন্য কোন পথ নেই। সবশেষে খুদে ফাঁকটার কথা বলল বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে ওই ফাঁকের ভেতর ঢুকতে হবে ওদেরকে, তার আগে ভেতরে ঢোকার জন্যে জেলিগনাইট ফাটিয়ে চওড়া করতে হবে গর্তের মুখ।

রানা থামতেই কাজ শুরু করে দিল হাসান। খুব অল্প প্লাস্টিক ব্যবহার করল সে, তা না হলে পাথর ধস শুরু হতে পারে। ফাঁকটার মুখ বড় হলো। কোমর সমান পানিতে নামল রানা। টর্চ জ্বেলে দেখল ওর সামনে অন্ধকার একটা টানেল। পিছু নিল সবাই, জানে না এই জলমগ্ন টানেল কোথায় নিয়ে যাবে ওদেরকে।

টানেলের মেঝে ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে। এক সময় দু'পাশে দুটো শাখা-টানেল দেখল ওরা, দুটোর মেঝেই ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ওগুলোকে এড়িয়ে সোজা এগোল রানা। দশ মিনিট হাঁটার পর পানি থেকে উঠে এল দলটা। গায়ে বাতাস লাগছে, অনুভব করে পরম স্বস্তিবোধ করল সবাই। আরও মিনিট দশেক হাঁটার পর টানেলের উন্মুক্ত, আলোকিত মুখ দেখা গেল।

টানেলের বাইরে ছোট একটা উপত্যকা। পশ্চিমা বাতাসে মেঘ ভেসে যাচ্ছে, আকাশ প্রায় ঢাকা। আশপাশে গাছপালা আছে, কোন ঘর-বাড়ি বা লোকজন নেই। বিশ্রাম ও খাওয়াদাওয়ার জন্যে এখানেই থামার নির্দেশ দিল রানা। শামিম আগুন জ্বালল, সুপ তৈরি করবে। তোবড়ানো স্ট্র হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে রেডিও নিয়ে বসল রিয়াজ, পরীক্ষা করে দেখছে সব ঠিকঠাক আছে কিনা।

নাহিদকে সুপ খাওয়াল হাসান। কেউই পুরোপুরি সুস্থ বা সতেজ নয়, কিন্তু নাহিদের অবস্থা খুবই করুণ। গায়ের রঙ হয়েছে বাদামী কাগজের মত, হাত দিলে পুড়ে যেতে চায় হাত। চোখ দুটো চকচক করছে। সুপ খেলো বটে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বমি করে ফেলে দিল সব। 'ব্যথা!' চোখ বুজে অস্ফুটে বলল সে। 'রানা ভাই!' মাঝে মধ্যে দাঁতে দাঁত পিষছে।

কাছে সরে এসে তার বুকে হাত রাখল রানা। 'আমার ওপর ভরসা রাখো,

নাহিদ। যদি বাঁচি, প্রথমে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।'

'হ্যাঁ, এই মাসুদ রানাকেই আমি চিনি,' চোখ খুলল নাহিদ, আধবোজা। 'হাল ছাড়তে রাজি নও। কিন্তু, রানা ভাই, যার সময় হয়ে গেছে, তাকে তুমি ধরে রাখবে কিভাবে?' হাসতে গিয়েও পারল না। 'আমাকে রেখে চলে যাও তোমরা। প্লীজ!'

'পাগল!' জোর করে হেসে উঠল রানা, নিজের কানেই বেসুরো লাগল আওয়াজটা। 'হাসান!'

সিরিঞ্জ হাতে এগিয়ে এল হাসান। 'তোমাকে ফেলে যাব? জান থাকতে নয়।' দ্রুত ইঞ্জেকশন পুশ করল। 'ব্যান্ডেজটা এখুনি বদলে দিচ্ছি। ব্যথা কি খুব বেশি, নাহিদ?'

'নাহ্!' অবিশ্বাস্য সহ্য ক্ষমতা, অবিশ্বাস্য সাহস। 'এখন আর কিছুই অনুভব করছি না।'

দ্রুত হাতে পুরানো ব্যান্ডেজ খুলে নতুন ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল হাসান। ক্ষতটা দেখল রানা। চেহারায় কোন ভাব ফুটল না, তবে মনটা কেঁদে উঠল। নাহিদ ওদের দীর্ঘদিনের বন্ধু, বিসিআই-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্ট, ব্যক্তিগতভাবে নিজের একটা হাত বা পায়ের বদলে হলেও নাহিদকে বাঁচাতে চাইবে ও। কিন্তু বিধাতার বোধহয় ইচ্ছে নয় ওকে বাঁচিয়ে রাখেন।

চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল নাহিদ, তাকে নিয়ে আলোচনার সুযোগ করে দিতে চাইছে। রানার হাত ধরে খানিকটা দূরে সরে এল হাসান। 'কেমন বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এখনও টিকে আছে কি করে তাই ভাবছি।'

'এই জায়গা ছেড়ে দু'ঘণ্টা নড়ছি না আমরা,' বলল রানা। 'এই দু'ঘণ্টা নাহিদকে আমি বিশ্রাম দিয়ে দেখতে চাই কোন উপকার পাওয়া যায় কিনা। শাফিকে জিজ্ঞেস করেছি, সে জানে আমরা ঠিক কোথায় রয়েছি। তার ধারণা, ইসরায়েলি সৈন্যরা ধরে নিয়েছে আমরা বেঁচে নেই।'

ভান করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে নাহিদ। ইঞ্জেকশনের প্রভাব। বোল্ডারের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রয়েছে শামিম, জেগে না ঘুমিয়ে বোঝা যাচ্ছে না। শাফি আর নাসের নাক ডাকছে। একা শুধু রিয়াজ জেগে আছে, এখনও রেডিওর কলকব্জা নাড়াচাড়া করছে। রানা জানতে চাইল, 'ওটা কি নষ্ট হয়ে গেছে?' রিয়াজ টের পায়নি, কোন শব্দ না করে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ও।

ঝট করে ঘাড় ফেরাল রিয়াজ, হাতের আঙুল একটা বোতামে চাপ দিল দ্রুত। ইন্ডিকেটর লাইট নিভে গেল। রানার মাথার পিছনে সড় সড় করে খাড়া হয়ে গেল চুল। গলার স্বর পাল্টে গেল, আশ্চর্য শান্ত সুরে জানতে চাইল, 'রিয়াজ? কি করছ?'

'ইকুইপমেন্ট টেস্ট করছি।'

রানা বলল, 'ট্র্যান্সমিট না করলেই হলো।'

'আপনার নির্দেশ আমার মনে আছে,' চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে বলল রিয়াজ। স্ট্র হ্যাটটা কপালের আরও ওপরে তুলে দিয়ে একটা বোল্ডারে হেলান দিল। ধীর পায়ে তাকে পাশ কাটিয়ে উপত্যকার শেষ প্রান্তের দিকে হেঁটে এল রানা। বৃষ্টি হচ্ছে না। মেঘও কেটে যাচ্ছে। একটু পর গাছপালার ফাঁক দিয়ে সূর্য উঁকি দিল। হাতঘড়ি

দেখল রানা। আর চার ঘণ্টা পর অন্ধকার নামবে। রাতে শীত আরও বাড়বে। খোলা আকাশের নিচে নাহিদকে বাঁচানো যাবে না।

নাহিদই রানার একমাত্র দুশ্চিন্তা নয়। পাহাড়ের তলা দিয়ে বেশ খানিকটা পথ পেরিয়ে এসেছে ওরা, কিন্তু সৈকতে পৌঁছুতে হলে আরও অনেক দূর যেতে হবে। মোবারককে দরকার ওদের। সৈকতে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে সে। ওরা মারা গেছে বা যায়নি, ইসরায়েলি সৈন্যরা যাই বিশ্বাস করুক, সৈকতে পৌঁছানোর সবগুলো রাস্তায় টহল দেবে ওরা।

বিশ্রাম নেয়া দরকার, কিন্তু খুঁতখুঁতে একটা ভাব অস্থির করে তুলেছে রানাকে। গাছপালার ভেতর হাঁটাহাঁটি করছে ও। এক সময় হালকা জঙ্গলটাকে পিছনে ফেলে এল। ওর নিচে একটা মালভূমি, খাড়াভাবে নীলচে ধোঁয়াটে উপত্যকার গভীরে নেমে গেছে। সূর্য আবার বেরিয়ে এসেছে মেঘের আড়াল থেকে। তবে আকাশ, মেঘ বা সূর্যের দিকে তাকিয়ে নেই রানা। পিছিয়ে এসে কয়েকটা পাইন গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছে ও, চোখে বিনকিউলার। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ঢাকা মুখটা যেন পাথরে খোদাই করা। মালভূমির নিচের স্তরে কি যেন একটা নড়ছে। উইন্ডস্ক্রীনে রোদ লাগায় ঝিক করে উঠল কাঁচ। একটা নয়, কয়েকটা। হাফ-ট্রাক, ট্রাক ও ভ্যান–তিনটে গাড়ি। ভ্যানের ছাদে ইস্পাতের একটা লূপ রয়েছে।

চিনতে পারল রানা ওটা আসলে একটা রেডিও-ডিরেকশন-ফাইন্ডিং ভ্যান।

রানার মনের পর্দায় জ্বলে উঠল ছোট্ট লাল একটা বিন্দু–রিয়াজের রেডিওতে ঘন ঘন জ্বলতে-নিভতে থাকা ট্র্যান্সমিট লাইট। রিয়াজ ইকুইপমেন্ট চেক নয়, ট্র্যান্সমিট করছিল। অনেক কিছুই খাপে খাপে মিলে যেতে লাগল। বৃষ্টি হোক বা না হোক, তার স্ট্র হ্যাট পরে থাকার সঙ্গে স্টাইল বা সৌখিনতার কোন সম্পর্ক নেই। ওই হ্যাট আসলে একটা চিহ্ন–ওর পরিচয়। ইসরায়েলি সৈন্যদের ওপর নির্দেশ আছে–স্ট্র হ্যাট পরা লোকটাকে গুলি করবে না, সে আমাদের লোক।

এক মাইল দূরেও নয়, মালভূমির গোড়া থেকে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে আসছে তিনটে আর্মারড কার, সবুজ ও লম্বা ঘাসে প্রায় ঢাকা। পিছিয়ে জঙ্গলের আরও ভেতরে চলে এল রানা।

নালায় রিয়াজ ছাড়া বাকি সবাই ঘুমাচ্ছে। এখনও রেডিও নিয়ে পড়ে আছে সে। রানা তার দিকে তাকালই না। শামিম নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে, কাঁধে হাত রাখতেই চোখ মেলে তাকাল। 'জলদি,' ফিসফিস করল রানা। 'ইসরায়েলিরা আসছে। তিনটে আর্মারড কার। পাঁচশোর মত সৈন্য। কান পাতো।'

উঠে বসল শামিম। কয়েক মুহূর্ত পর মাথা ঝাঁকাল। ইতিমধ্যে ওখান থেকে সরে গেছে রানা।

একটা বোল্ডারে বসে আছে রিয়াজ। নার্ভাস বোধ করছে। ক্যাম্পের সবার ঘুমাবার কথা, অথচ নড়াচড়া করছে তারা। দু'পাশের জঙ্গলের দিকে তাকাল সে, উপত্যকায় চোখ বুলাল, ঘাড় ফিরিয়ে পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা জলপ্রবাহের দিকে তাকাল। ক্যাম্পের লোকজন যুদ্ধ করবে। উজি নাড়াচাড়া করার ধাতব আওয়াজ পাচ্ছে সে। খানিক পরই শুরু হয়ে যাবে প্রচণ্ড গোলাগুলি। নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত

করার জন্যে ইসরায়েলিদের পক্ষে কাজ করছে সে। কিন্তু হঠাৎ ভয় ঢুকল মনে–মাথায় স্ট্র হ্যাট থাকলেই মর্টার, গ্রেনেড আর মেশিন গানের ব্রাশ ফায়ার থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায় না।

বোল্ডার থেকে নেমে জঙ্গলের দিকে হাঁটছে রিয়াজ। শান্তি মিশনের লোকজনকে ফাঁকি দিয়ে জঙ্গলে হারিয়ে যেতে পারলেই হয়, সময় মত ইসরায়েলি এম.পি. হেডকোয়ার্টারে গিয়ে টাকাটা সংগ্রহ করে তেল আবিবে চলে যাবে। দশ হাজার মার্কিন ডলার পাবার কথা তার।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটছে রিয়াজ. চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল কি যেন তার পিছু নিয়ে আসছে। তলপেটে শূন্য একটা অনুভূতি জাগল। মনে হলো এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। ছুটন্ত বুটের শব্দও ভেসে আসছে। মাথার স্ট্র হ্যাটটা একহাতে ধরে আছে, গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি তোমাদের লোক! ইনফর্মার!'

হ্যাটে হাত রেখে চিৎকার করার সময় ছোটার গতি কমে গিয়েছিল। তখনই ঝাঁকি খেলো রিয়াজ। পিছনে, পাঁজরের খাঁচার বাঁ দিকে খুব জোরে কি যেন আঘাত করেছে। ছিটকে সামনে বাড়ল সে। কানের পাশে একটা গলা পেল, 'ওরে পিশাচ, পালাচ্ছিস কোথায়? লায়লার কথা মনে পড়ে গেল, তাই সামান্য একটা খোঁচা মেরেছি।' নাসেরের গলা শুনে রিয়াজ হতভম্ব, বিমূঢ়। ভাবছে, এখন কি হবে?

পাঁজরের আঘাতটা সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই রিয়াজের। ব্যথাটা এত বেশি, সহ্য করার মত নয়, যেন গরম লোহা ঢোকানো হয়েছে। তার কি হার্ট অ্যাটাক করল? ডাক্তার সাবধান করে দিয়েছিল, ওজন কমাও। কিন্তু যুদ্ধ করতে এসে হার্ট অ্যাটাকে মারা যেতে হবে, এ কেমন কথা! ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিল শরীরে। শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো সে, ফুসফুস তরল পদার্থে ভরে আছে। খক খক করে কাশল। মুখ থেকে হড়হড় করে কি যেন বেরিয়ে আসছে।

রক্ত।

পিছন থেকে সামনে চলে এল নাসের। হাতে একটা ছুরি, গাছের পাতা কুড়িয়ে ফলা থেকে রক্ত মুছছে। নাসের আমাকে ছুরি মেরেছে, ভাবল রিয়াজ। আতঙ্কে দিশেহারা বোধ করল। কি আশ্চর্য, আমি তাহলে মারা যাচ্ছি!

রিয়াজ পড়ে গেল। পড়ার পর তিন সেকেন্ডও বাঁচল না।

চার

আর্মারড কার ভর্তি সৈন্য জঙ্গলের কিনারা থেকে খানিকটা পিছনে থামল, এখন তাদের অপেক্ষার পালা। মিলিটারি পুলিসের ডিটেক্টর ভ্যান জায়গা মত পজিশন নিচ্ছে, যাতে করে রেডিওর পজিশন পিনপয়েন্ট করা যায়। এরপর অনুপ্রবেশকারী বিদেশী অনুচরদের ঘেরাও দিয়ে কচুকাটা করা হবে। মিলিটারি পুলিসরা ধৈর্য ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অপারেশনটার বারোটা বাজানোর ইচ্ছে

তাদের নেই। এমন সব গুজব তাদের কানে গেছে, এই বিপজ্জনক লোকগুলোকে খতম করার জন্যে কোন রকম ঝুঁকি নেয়া চলে না। যুক্তিই বলে দেয়, এদের ব্যবস্থা করতে হলে সৈন্য সংখ্যা কম হওয়া চলবে না। সেজন্যেই বড় একটা দল নিয়ে এসেছে তারা।

ইসরায়েলি মিলিটারি পুলিসের কমান্ডার, একজন মেজর, অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির মানুষ, হিযবুল্লাহ মিলিশিয়াদের প্রতি তার অন্ধ আক্রোশ আছে। মিলিটারি পুলিসদের পজিশন নিতে বলে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে সে।

একটু পরই জঙ্গলের কিনারা থেকে বেরিয়ে এল পাঁচজন লোক। আসলে চারজন লোক হাঁটছে, বাকি একজনকে ক্রাচ দিয়ে বানানো স্ট্রেচারে তুলে বয়ে আনা হচ্ছে। স্ট্রেচারে শোয়া লোকটার পরনে সাদা আলখেল্লা, বাকি তিনজন ঢোলা সালোয়ার আর জোব্বা পরে আছে। পঞ্চম ব্যক্তির মাথায় স্ট্র হ্যাট, পরনে ট্রাউজার আর শার্ট। সে সবার পিছনে রয়েছে, একমাত্র তার হাতেই একটা উজি মেশিনগান–দলের বাকি সবার পিঠের দিকে তাক করা।

আর্মারড কার-এর দিকে মুখ তুলে তাকাল সে। ইসরায়েলি মেজরের দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হাসি উপহার দিল। 'শত্রুরা সারেন্ডার করেছে, মেজর। আমার দায়িত্ব শেষ, এবার যা করার আপনিই করবেন।'

বন্দী চারজন লোককে দেখল মেজর। 'সব মিলিয়ে লোক থাকার কথা ছ'জন। আরেকজন কোথায়?'

'ওদের একজন পাহাড়ের তলায় রয়ে গেছে,' স্ট্র হ্যাট পরা লোকটা জবাব দিল। 'ওখানে থাকাই তার কপালে ছিল।'

'গুড,' বলল মেজর। আর্মারড কার থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল। 'ইরাজ ও আরসালান, মেশিন গানটা নিয়ে এসো। আহুদ, রেডিওতে হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানাও, সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কেফার ভিটকিনে আছেন মোসাড ইন্টারোগেটর অফিসার আহুদ, তিনি হয়তো বন্দীদের ইন্টারোগেট করতে চাইবেন।' ভুরু কুঁচকে এক সেকেন্ড ইতস্তত করল। 'অফিসার আহুদ একজন সিভিলিয়ান, মেয়েদের নখ উপড়াতে এক্সপার্ট।' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নিঃশ্বাস ফেলল। 'নর্দমার কীটদের জন্যে উপযুক্ত শাস্তি একটাই–এক গুলিতে জান কবচ। এসো।'

আর্মারড কার থেকে পঁচিশ গজ দূরে তেপায়ার ওপর মেশিন গান বসাল ওরা, তাক করল লাইমস্টোনের নিচু পাঁচিলের দিকে। ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন সৈন্য ফিল্ড-গ্রে ড্রেস পরে আশপাশে ঘুর ঘুর করছে, এরা নিজেদের গাড়ি রেখে ঢাল বেয়ে হেঁটে এসেছে।

'গুড,' স্ট্র হ্যাটকে বলল মেজর 'এবার ওদেরকে মাটি খুঁড়তে বলো।'

'মাটি খুঁড়তে...'

'বেশি গভীর করার দরকার নেই,' বলল মেজর। 'চল্লিশ সেন্টিমিটারই যথেষ্ট।'

আর্মারড কারের পিছন থেকে কোদাল আর শাবল নামিয়ে ছুঁড়ে দিল এম.পি. পুলিস। মাটি খুঁড়তে শুরু করল রানা। দেখাদেখি কাজে হাত লাগাল নাসের ও হাসানও। শাফি হাঁটু গেড়ে মাটি সরাচ্ছে, সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে চাপা গলায়

ফিসফাস করছে, মেজর বিরক্ত হবে বুঝতে পেরে ঢাল বেয়ে উপত্যকায় নেমে গেল তারা। 'গুড,' পনেরো মিনিট পর বলল মেজর, উঁকি দিয়ে গর্তের গভীরতা পরীক্ষা করল। 'এবার ওদেরকে কাপড় খুলতে বলো।'

ধীরে ধীরে কাপড় খুলল ওরা। ফিল্ড-গ্রে ইউনিফর্ম পরা সৈন্যরা কাছাকাছি কেউ নেই। হিযবুল্লাহ মিলিশিয়া সন্দেহে অনেক নিরীহ মুসলমানকে আগেও এভাবে জ্যান্ত কবর দিতে দেখেছে তারা। ব্যাপারটা শুধু রোমহর্ষকই নয়, নৃশংসও বটে। কাজেই চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। আজ তারা শুধু চোখ ফিরিয়ে নেয়নি, ঢাল বেয়ে গাড়ির কাছে ফিরে গেছে। গাছের ডালে ডালে পাখি ডাকছে, গর্তের কাছে শুধু বন্দীরা আর জল্লাদবাহিনী। মেশিনগানের পিছনে ও পাশে তিনজন মিলিটারি পুলিস; কাছাকাছি রয়েছে মেজর আর দু'জন অতিরিক্ত এম.পি.। ওদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন বন্দী। রানা হিব্রু ভাষায় জানতে চাইল, 'শেষ ইচ্ছে বলে একটা কথা আছে, সেটা কি পূরণ করা সম্ভব? আমি একটা সিগারেট খেতে চাই।'

স্ট্র হ্যাট পরা লোকটা বলল, 'ওদেরকে সিগারেট দেয়া হোক

'বেঈমান আর শত্রুদের প্রতি তোমার দরদ একটু বেশিই দেখা যাচ্ছে,' তিক্ত গলায় বলল মেজর।

স্ট্র হ্যাট এগিয়ে এসে রানাকে একটা সিগারেট দিল, লাইটার জ্বেলে ধরাতেও সাহায্য করল। এক মুহূর্তের ছোট্ট একটা ঘটনা, কিন্তু মেজরের মনে হলো এই এক মুহূর্তেই মারাত্মক আরও কি যেন একটা ঘটে গেছে।

সেটাই মেজরের শেষ অনুভূতি। কারণ সিগারেট দেয়ার সময় স্ট্র হ্যাট তার নিজের উজিটা নগ্ন রানার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। রানার হাতে অস্ত্রটা আগুন ঝরাতে শুরু করল, সরাসরি মেশিন গান ক্রুদের লক্ষ্য করে। বুলেটে ঝাঁঝরা শরীরগুলো ছিটকে পিছিয়ে গেল, মাটিতে পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। বাকি থাকল মেজর, হোলস্টার থেকে ল্যুগারটা অর্ধেকও বের করতে পারেনি। উজিটা ঘুরে গেল, কিন্তু ফায়ারিং পিন খালি চেম্বারে লেগে ক্লিক করে আওয়াজ করল শুধু, কোন বুলেট বেরুল না।

গুলি বেরুবার অপেক্ষায় থাকেনি মেজর, ঘুরে ছুটতে শুরু করেছে। বেশি দূর যেতে পারল না, বেল্ট থেকে ছুরিটা বের করে সজোরে ছুঁড়ে মারল শামিম রোদ লেগে ঝলসে উঠল রূপালি ইস্পাত। ব্যাটল ড্রেস পরা মেজর হঠাৎ স্থির হয়ে গেল, বাঁকা হয়ে গেল পিঠ, তারপর টলতে টলতে কয়েক পা সামনে বাড়ল। সবশেষে সটান আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। সৈনিকদের ইউনিফর্ম খুলে পরতে শুরু করল রানা আর হাসান। মেজরের ইউনিফর্ম রানার গায়ে পুরোপুরি ফিট করল।

লাশগুলো গর্তে ফেলে দ্রুত মাটি চাপা দিল ওরা। আর্মারড কার-এ নিজেদের প্যাক আর অস্ত্র তুলল। শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে রানা, টারেট-এর বাইরে মাথা, কামানো মুখ থমথমে। 'গো,' নির্দেশ দিল ভারী গলায়।

থ্রটলে পা রাখল হাসান। পাহাড়ের নিচে নেমে এসে বাকি দুটো গাড়ির সঙ্গে যোগ দিল আর্মারড কার। সাধারণ সৈন্যরা মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল। তারা জানে মেজরের নেতৃত্বে ইসরায়েলি মিলিটারি পুলিস পাহাড়ের ওপর ঠাণ্ডা

মাথায় কি কাণ্ড করে এসেছে। উপত্যকায় নেমে এসে আর্মারড কার পাকা রাস্তায় পড়ল, কেফার ভিটকিনের দিকে ছুটে চলেছে।

কেফার ভিটকিনের বাসিন্দারা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর আর্মারড কার দেখে বিচলিত বা সচকিত হলো না, অভ্যস্ত হয়ে গেছে। রাস্তার দু'পাশের বাড়ি-ঘরের দিকে না ফিরে নাক বরাবর সোজা তাকিয়ে আছে রানা, শাফিকে বলল, 'নিরাপদ একটা আশ্রয় দরকার আমাদের। কোন গুহা-টুহা নয়।'

মাথা ঝাঁকাল শাফি। শহরের ঠিক বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, 'এখানে ঘোরান।' হাত তুলে ডান পাশটা দেখাল।

বাঁক ঘুরে মেইন রোড ত্যাগ করল রানা, সরু একটা গলি ধরে এগোল গাড়ি, সামনে দেখা যাচ্ছে লোহার একটা গেট, গেটের দুই কবাটের মাঝখানে লোহার চেইন, চেইনের সঙ্গে তালা ঝুলছে। তালার গায়ে সীল-গালা, ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর প্রতীক চিহ্ন চিনতে অসুবিধে হলো না। নিচে নেমে চেইন কাটল শাফি, আর্মারড কার ভেতরে ঢোকার পর ভাঙা চেইনের লিঙ্ক জোড়া লাগাল, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল গেট।

গেটের ভেতর একটা ফার্মইয়ার্ড। দেখেই বোঝা গেল, তাড়াহুড়ো করে জায়গাটা খালি করে চলে গেছে সবাই। ফার্মহাউসের জানালাগুলো খোলা, একটা কবাট সাগর থেকে ছুটে আসা বাতাসে বাড়ি খাচ্ছে পাশের দেয়ালের সঙ্গে। গবাদি পশুর শেডগুলো খালি।

'মিলিটারি পুলিস বা ইন্টেলিজেন্স-এর লোকজন মুসলমানদের তাড়িয়ে দিয়েছে এখান থেকে। শুধু এই একটা নয়, শহরতলির কোন ফার্মেই মুসলমানদের থাকতে দেয়া হয়নি।'

জায়গাটা ঘুরে-ফিরে দেখল রানা। শেডে প্রচুর খড় দেখা গেল। বাড়ির ভেতর বেডরূমে এখনও চাদর আর বালিশ রয়ে গেছে। কিচেনে পাওয়া গেল রিফ্রিজারেটর; তাতে সব্জি, মাংস, জেলি, পনির ও মাখন রয়েছে।

বাড়িটা থেকে বা ফার্মইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে যাবার পথগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। হালকা গাছপালার ভেতর বাড়িটা, চারধারে ছোট-বড় নালা ও লম্বাটে গর্ত আছে। সবচেয়ে কাছের বাড়ি দুশো গজ দূরে, এখান থেকে সেটার দেয়াল শুধু দেখা যায়, খালি–কোন জানালা-দরজা নেই।

আর্মারড কারটা গোলাঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়া হলো। কিচেনে জড়ো হলো সবাই, চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল রানা। পায়ের চারপাশে মাছি ভন ভন করছে। পশ্চিমে হেলে পড়ছে সূর্য, হলদেটে রোদ, মোচড় খাচ্ছে নীলচে ধোঁয়া। রানার মনে হলো একটানা এক বছর ঘুমাতে পারলে তবে যদি ক্লান্তি দূর হয়।

নিস্তব্ধতা ভেঙে নাসের বলল, 'কাফেতে যাওয়া দরকার।'

বিপদের কথা ভাবছে রানা। 'কিন্তু আপনার স্ত্রী যদি মুখ খুলে থাকে, তাহলে?' মনে মনে ভাবছে, নাসেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলে স্বস্তিবোধ করত।

'মুখ খুলে থাকুক বা না থাকুক, ঝুঁকিটা আমাদের নিতেই হবে,' জবাব দিল

নাসের।

অনেক আগে থেকেই নাসেরকে দুর্বল একটা লিঙ্ক বলে মনে করছে রানা। তবে এ-ও সত্যি, রিয়াজকে পালাতে দেখে সে-ই তাকে ছুরি মারে। অবশ্য, নাসেরের সততা এই মুহূর্তে কোন প্রসঙ্গ নয়, প্রসঙ্গ হলো মোবারককে খুঁজে বের করা। সত্যি দুঃখিত, মনে মনে বলল রানা—তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

ওদের চোখের আড়ালে নাসের কি ভূমিকা পালন করবে, বলা সম্ভব নয়। সে যদি স্ত্রীর প্রাণের বিনিময়ে ওদেরকে ধরিয়ে দেয়ার চুক্তি করে ইসরায়েলিদের সঙ্গে?

রানার চোখ দেখে মনের কথা পড়ে ফেলল হাসান। শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল, 'কাফেতে আমি যাব। আমি একা।'

দশ মিনিট পর কেফার ভিটকিন থেকে পশ্চিম দিকে রওনা হলো ওরা, বন্দরে যাচ্ছে। শ্রমিকদের জন্যে নির্ধারিত নীল ক্যানভাস স্যুট আর কালো বেরেট পরেছে হাসান, ফার্মহাউসের ওয়ার্ড্রোব থেকে পেয়েছে। সঙ্গে করে কাগজ-পত্র নিয়ে এসেছে, নিজেকে স্থানীয় বাসিন্দা বলে পরিচয় দিতে অসুবিধে হবে না। নাসেরের পরনে নীল ট্রাউজার, মাথায় বেরেট; তার কাগজ-পত্রেও কোন খুঁত নেই। তবে সবার কাপড়ই নোংরা, রানা ছাড়া কেউই দাড়ি কামায়নি বা গোসল করেনি। কাঁচা রসুন চিবাচ্ছে ওরা, আঙুলের ফাঁকে কাদা মাখিয়েছে। সবাই ভাববে খেত থেকে বেরিয়ে সরাসরি কাফেতে যাচ্ছে।

পথে একটা মেয়েকে দেখল হাসান। সুন্দরী না হলেও, চোখ দুটো ভারি সুন্দর, মাথায় লম্বা কোঁকড়া চুল। চোখাচোখি হতে হাসল হাসান। মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে নিল।

বন্দরের উত্তর দিকে দুই সরু গলির মুখে গোল্ডফিশ কাফে। একটা গলিতে ঢুকে হাঁটছে ওরা, শেষ মাথায় মোটরসাইকেলে বসা দু'জন ইসরায়েলি সামরিক অফিসারকে দেখা গেল। পার্কিং এরিয়ায় মোটরসাইকেল থামিয়ে সিগারেট টানছে তারা, কি নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে নিজেদের মধ্যে। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর একটা আর্মারড কার নিখোঁজ হয়েছে, এ-খবর এখনও তারা পায়নি, পেলে এখানে এভাবে অলস সময় কাটাতে পারত না।

কাফের সামনে এসে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল নাসের। 'ভেতরে ঢুকুন,' বলল হাসান, সুরটা প্রায় কঠিন। নাসের ইতস্তত করছে দেখে দরজাটা খুলে তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

গোল্ডফিশ কাফে বিশ-বাইশ ফুট লম্বা। ভেতরের কোণে একটা বার। জনা বিশেক লোক বসে আছে, মেয়ের সংখ্যা পাঁচ কি ছয়। কোণের এক টেবিলে বসে দাবা খেলছে দু'জন সৈনিক। তাদেরকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল নাসের। হাসান তার হাতে খোঁচা মারল, ফিসফিস করে বলল, 'ক্যামোফ্লেজ।' বলল বটে, তবে নিশ্চিতভাবে নিজেও জানে না।

ঢোক গিলল নাসের, কণ্ঠা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে। ভিড় ঠেলে বার-এর দিকে এগোল সে। আলখেল্লা বা ঢোলা জোব্বা পরা এক মধ্যবয়স্ক লোকের পাশে

এসে দাঁড়াল। লোকটার চোখ দুটো টকটকে লাল, গোঁফ জোড়া অস্বাভাবিক চওড়া, মাথায় বেরেট। বার-এর পিছনে দাঁড়ানো মোটাসোটা লোকটাকে নাসের বলল, 'আমাকে আর আমার বন্ধু অ্যাডমিরালকে কফি দাও হে।'

বারম্যান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখল নাসেরকে। 'ইস্রাফিল?'

'আফলাতুন,' বিড়বিড় করল নাসের। লেবানিজ রেডিও পাস ওয়ার্ড প্রচার করেছে, সন্দেহ নেই। নাসেরের ভয় অবশ্য কাটল না। বারম্যান হিযবুল্লাহ মিলিশিয়ার ইনফর্মার, জানে সে; কিন্তু তা সত্ত্বেও চেইনের পরবর্তী লিঙ্ক জোড়া লাগাতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে।

বারম্যান কফি পরিবেশন করল, তারপর কাগজে পেন্সিল ঘষে ঘষে বিল লিখল। কাগজটা নিয়ে হাসানকে দিল নাসের। বিলে লেখা রয়েছে—মোহাম্মাদ মোবারক হোসেন, ১৩, ডামুর, মোহরার। পকেট থেকে টাকা বের করল হাসান, টাকার সঙ্গে বিলটাও ফিরিয়ে দিল বারম্যানকে। টাকাটা দেরাজে রাখল সে, বিলটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে।

'দোয়া করি আপনারা সফল হন। গুজব ছড়িয়েছে পাহাড়ে ওদের ছ'জন মারা গেছে...'

চমকে পাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকাল নাসের।

'বিলটা আমি দেখলাম,' বলল লোকটা। 'আমি হিযবুল্লাহ কমান্ড্যান্ট খলিল আহমেদ...'

'একটু পর কারফিউ শুরু হবে,' বলে নাসেরের হাত ধরে টান দিল হাসান।

'এখানে আমাদের আরও লোকজন আছে, প্রয়োজনে...'

নাসেরকে ঠেলে কাফের দরজার দিকে এগোল হাসান। এরচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতি আর হতে পারে না। এরইমধ্যে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর লোকজন খুন হবার কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে। যে-কোন মুহূর্তে তল্লাশী শুরু হবে।

কাফে থেকে বেরিয়েই হাসানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নাসের। এক লোকের সঙ্গে কথা বলছে সে। লোকটা খাটো, গায়ে ওভারকোট, মাথায় উলেন টুপি। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল হাসান, কারণ লোকটাকে আলিঙ্গন করছে নাসের। তার গলা থেকে যে শব্দটা বেরিয়ে আসছে সেটা হাসির নাকি কান্নার, বোঝা গেল না মাথার বেরেট চোখের ওপর নামিয়ে এনে আরেক দিকে এগোল হাসান।

হঠাৎ করে খাটো লোকটা হিব্রু ভাষায় বলল, 'কসম লাগে, চুপ করো!' এমন ঝাঁকি খেলো হাসান, যেন গুলি খেয়েছে। চেহারায় অবিশ্বাস, হাঁ হয়ে গেছে। 'শান্ত হও। পুরুষমানুষের মত আচরণ করো।'

খাটো লোকটা আসলে পুরুষ নয়, মেয়ে—লায়লা।

হাসান বলল, 'নাসের, এখান থেকে আমাদের বেরুতে হবে।'

মাথা নাড়ল লায়লা। 'আমি নই, আপনারা।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল নাসের, স্ত্রীর কথা বুঝতে পারছে না। আনন্দে পানি বেরিয়ে এসেছে চোখে, লায়লার চেহারা উদ্ভাসিত লাগছে, যেন কোন দেবী।

'যাও, নাসের, সময় নষ্ট কোরো না,' ফিসফিস করল লায়লা।

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল হাসান। লায়লাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও তাজা

লাগছে। শরীরের কোথাও নির্যাতনের চিহ্নমাত্র নেই। নয়মাস চলছে তার। ভরাট স্বাস্থ্য। লক্ষণ ভাল বলার উপায় নেই। ইসরায়েলিদের হাতে ধরা পড়েছিল মেয়েটা, অথচ ওরা তার কোন ক্ষতি করেনি। 'আমরা শুনেছি আপনাকে ওরা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।'

'ঠিকই শুনেছেন।' গলির দু'দিকে দ্রুত চোখ বুলাল লায়লা। আশপাশে কেউ নেই। গোধূলির ছায়া দ্রুত গাঢ় হচ্ছে। 'তবে আমাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে। পেটে বাচ্চা তো, তাই।'

লায়লাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল হাসান। 'ঠিক কি ঘটেছে?'

'ওরা আমাকে হাজারটা প্রশ্ন করল। বললাম কিছুই আমার জানা নেই। নিজেদের মধ্যে তর্ক করল ওরা—পেটে বাচ্চা নিয়ে কোন মেয়ে মিথ্যে কথা বলবে না। কাজেই ছেড়ে দিল।' হাসছে লায়লা।

'এখানে আমরা আসব, আপনি তা জানলেন কিভাবে?'

'কেফার ভিটকিনে আসছেন, এ তো জানা কথা। আর কেফার ভিটকিনে তথ্য পাবার একটাই উৎস—গোল্ডফিশ। আশেপাশে পঞ্চাশ বর্গ মাইলে বিশ হাজার হিযবুল্লাহ গেরিলা লুকিয়ে আছে, মোবারকই তাদের লিয়াজোঁ...'

'তাই?' গোটা ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য লাগছে হাসানের। ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এত সহজে ছেড়ে দিল কেন লায়লাকে? একটাই কারণ থাকতে পারে, লায়লাকে তারা অনুসরণ করতে চেয়েছে। 'মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে, লায়লা। এখানে আপনার আসাই উচিত হয়নি। নির্ঘাত আপনার ওপর নজর রেখেছে ওরা। নাসের, চলুন!'

'লায়লা আমাদের সঙ্গে যাবে,' ভারী গলায় বলল নাসের।

লায়লা মাথা নাড়ল। 'নাসের, বোকামি কোরো না। তোমরা যাও।'

'না।'

ঘুরে হাঁটা ধরল হাসান, হাত দুটো পকেটে, দৌড়বার ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্টে দমিয়ে রেখেছে। ফার্মইয়ার্ডের দিকে যাচ্ছে সে। পিছন থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এল—একজোড়া ভারী পদক্ষেপ, আরেক জোড়া লঘু। হঠাৎ দু'জোড়া পায়ের আওয়াজই থেমে গেল। হাসান হেঁটেই চলেছে, গতি আরও বাড়িয়ে দিল। মনে মনে ভাগ্যকে অভিশাপ দিচ্ছে সে। বিলে লেখা ঠিকানাটা দেখেছে নাসের। তার মুখ থেকে সেটা জেনে নিতে ইসরায়েলিদের খুব বেশি সময় লাগবে না। গোটা ব্যাপারটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। এখন আর এই মিশন সফল হবার প্রায় কোন সম্ভাবনাই নেই।

শহরের বাইরে বেরিয়ে এসে হাঁটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল হাসান। সামনের দিক থেকে ট্রাক এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে আসছে শুনে রাস্তার পাশের ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়ল। সৈন্য ভর্তি ট্রাকটা পাশ কাটিয়ে গেল তাকে। কিন্তু নাসের আর লায়লা গা ঢাকা দেয়নি। ট্রাকটা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্যাব থেকে নিচে নামল একজন অফিসার। তার হুঙ্কার শুনতে পেল হাসান, 'পেপারস!'

কি ঘটতে যাচ্ছে দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে সায় দিল না মন। ঝোপের আড়াল থেকে না বেরিয়ে দ্রুত ফার্মইয়ার্ডের দিকে এগোল হাসান। দশ মিনিটের

মধ্যে পৌঁছে গেল সে। কি ঘটেছে রিপোর্ট করল রানাকে।

'এখানে আর এক মুহূর্তও নয়,' বলল রানা। 'লায়লা বা নাসের মুখ খুললে সবাই আমরা মারা পড়ব।'

খেতের ওপর দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব হাঁটছে ওরা। নাহিদকে কাঁধে তুলে নিয়েছে শামিম। কারুরই ভাল ঘুম হয়নি, এলোমেলো পা ফেলছে। ফসল ভরা খেত, আড়াল পেতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। সন্ধ্যার ম্লান আকাশের নিচে শহরটা অন্ধকার, পিছনে পড়ে থাকল। খেত থেকে ওদেরকে মেঠো পথে তুলে আনল শাফি, তারপর নিচু একজোড়া রিজ পেরোল ওরা। কেফার ভিটকিন-এর দিক থেকে এঞ্জিনের ভারী আওয়াজ ভেসে আসতে শুনল ওরা। দীর্ঘ একটা পাথুরে গ্যালারি বেয়ে নিচে নামতে হলো। রে-র অপর দিকে ইসরায়েলি সৈন্যরা নড়াচড়া করছে। তারা কোন অ্যাকশন নিচ্ছে কিনা, নিলে কাদের বিরুদ্ধে, এখান থেকে বোঝার কোন উপায় নেই। ওরা শুধু প্রার্থনা করতে পারে, নাসের আর লায়লা নিরাপদে আছে।

'এখানে থামুন,' বলল শাফি।

পাথুরে একটা গলিতে পৌঁছেছে ওরা, ঢালু হয়ে নেমে গেছে সেটা। গলির শেষ মাথায় পানির বিস্তৃতি। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল শাফি।

রানা বলল, 'শামিম? রেকি?'

একটা নিচু পাঁচিলের আড়ালে নাহিদকে শুইয়ে দিল শামিম, হাতে ধরিয়ে দিল একটা উজি, তারপর সে-ও হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হলো। ফলের একটা বাগান পেরিয়ে গ্রামে ঢুকল শামিম। প্রথমে একটা, তারপর একসঙ্গে কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করল। এক বাড়ির জানালা খুলে বুড়ো এক লোক কাকে যেন অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিল। একটা ঢালের মাথায় উঠে সাগরের দেখা পেল শামিম। নিচে একটা জেটি দেখা যাচ্ছে, শেষ প্রান্তে কয়েকটা জেলে-নৌকা বাঁধা। অটল দাঁড়িয়ে আছে শামিম, আশপাশে কিছু না নড়লেও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

ধৈর্যে মেওয়া ফলে। জেটির গোড়ায় ছোট একটা শেড, সেটার সামনে দেশলাই জ্বালল কেউ—কাঠিটার আলোয় ইস্পাতের একটা হেলমেট উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দ্বিতীয় হেলমেটটা পরিষ্কার দেখা গেল না, শুধু কিনারার অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল।

এখনও ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। কুকুরগুলোও থামছে না। একই পথে ফিরে এল শামিম। পাঁচিল টপকে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা।

'পাহাড়ের ওদিকে পিলবক্স,' বলল রানা। 'হারবার কাভার করছে।'

'জেটিতে দু'জন সেন্ট্রি,' বলল শামিম। 'এদিকে কোন পিলবক্স নেই।'

হাসান বলল, 'গ্রামেও কোন সৈন্য নেই। জেটি থেকে গ্রামে ঢোকার পথে তিনটে বাড়ির পর মোবারককে পাওয়া যাবে।'

'নাহিদকে তোলো,' নির্দেশ দিল রানা।

গ্রামে ঢোকার পর কুকুরগুলো এবার ছুটে এল। মাটিতে হাঁটু গেড়ে নরম সুরে

ওগুলোকে কাছে ডাকল শামিম, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে বোঝাতে চেষ্টা করল ওরা আসলে শত্রু নয়, বন্ধু। অদ্ভুত ব্যাপার, সবগুলো কুকুর একযোগে বোবা হয়ে গেল। নির্দিষ্ট বাড়ির পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ও-ই দরজা খুলল, ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল শাফি আর হাসান। কিচেন টেবিলে বসে থাকা লোকটা হঠাৎ মুখ তুলেই চমকে উঠল।

লোকটা রোগা-পাতলা, মাথায় টাক, নাকটা ভাঙা, দাঁতগুলো হলদেটে। বাম হাতে একটা চামচ, ডান হাতে এক টুকরো রুটি। কাঁচের বাটিতে তরল কিছু আছে, রুটি ডুবিয়ে খেতে যাচ্ছিল। হাঁ করে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। শাফি বলল, 'আমরা অ্যাডমিরাল আফলাতুনের বন্ধু। আপনি আহ্‌মেদ ইস্রাফিল মোবারক?'

কালো চোখ সরু হলো। বন্ধ হলো মুখ, রুটি চিবাচ্ছে। মাথা ঝাঁকিয়ে শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল, 'টাকা এনেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনারা সংখ্যায় খুব বেশি। একজন কথা বলবেন। কাছেপিঠে সৈন্য আছে।'

'পিলবক্সে চারজন দু'জন জেটিতে,' বলল রানা। 'এই তো সব?'

মাথা ঝাঁকাল মোবারক। 'টহল পার্টি না আসা পর্যন্ত, হ্যাঁ।' লোকটার শান্ত আচরণে ভরসা করার মত কিছু যেন আছে। স্টোভের পাশের একটা চেয়ারে নাহিদকে বসিয়ে দিল শামিম। নাহিদের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। চেহারা নীলচে সাদা।

জানালার কাঁচে বৃষ্টির শব্দ ছাড়া ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। বাতাসে টমেটো, রসুন, মরিচ আর মাংসের গন্ধ ভাসছে। ফ্রাইং প্যানে একটা ভাজা ডিম দেখা যাচ্ছে। 'আপনারা আমার মেহমান, যেখানে যা পান সব খেয়ে ফেলুন–শুধু যাবার সময় দয়া করে দামটা ধরে দেবেন।'

খেতে বসে কেউ তেমন কথা বলল না। রানা শাফির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইনফরমেশন।'

শাফির প্রশ্ন শুনে মোবারক বলল, 'আমি গরীব জেলে। টাকা না পেলে খাব কি?'

নিজের প্যাক খুলে ওয়াটারটাইট বক্সটা বের করল রানা। সেটা খুলে মোবারককে দেখাল। 'পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার। শুধু তথ্য নয়, ট্র্যান্সপোর্টও দরকার আমাদের।'

প্রৌঢ় মোবারকের চোখ জোড়া চকচক করছে। 'সব নয়, অর্ধেক টাকা নেব আমি।'

'তথ্য না দিলে একটা টাকাও পাবেন না। অর্ধেক কেন চাইছেন?'

'কারণ তথ্যগুলো আপনাদের জন্যে দুঃসংবাদ।'

'বলুন শুনি।'

'কথাটা সত্যি–সাবমেরিনগুলো আমি দেখেছি,' বলল মোবারক। 'ওগুলো হেলাল জাললু নামে এক জায়গায় আছে।'

ইসরায়েলি উপকূলের ম্যাপটা স্মরণ করল রানা। প্রায় প্রতিটি বন্দরেই গেছে ও, বাকিগুলোর নাম শুনেছে। কিন্তু হেলাল জাললু নামে কোন বন্দরের নাম এই প্রথম শুনল। মোবারক ওদেরকে সম্ভবত মিথ্যে তথ্য দিচ্ছে। 'কোথায় সেটা?'

'এখান থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে,' বলল মোবারক, শুনে রানার শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল বেড়ে গেল।

'জায়গাটা আমি চিনি,' ওর কানে ফিসফিস-করল শাফি।

রানা বলল, 'আমাদের একটা ম্যাপ দরকার।'

পাঁচ

মোবারকের কিচেন টেবিলে বিছানো অ্যাডমিরাল্টি চার্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওরা। উপকূল রেখায় সমতল সৈকতের প্রায় কোন চিহ্নই নেই, চড়াই-উৎরাইই বেশি, কিনারার নিচে জলমগ্ন গুহার সংখ্যাও কম নয়। হেলাল জাললুকে বে-র একটা বাহু ঘিরে রেখেছে, চার্টে সেটার নাম লেখা রয়েছে দায়ান দায়ান।

বে-তে ঢোকার মুখটা একশো গজের বেশি চওড়া হবে না, তবে ভেতরে পানির গোলাকার বিস্তৃতি দুই মাইল, গভীরতা কম-বেশি বিশ ফ্যাদম। বে থেকে জমিনের দিকটায় দায়ান দায়ান গ্রাম। পেনিনসুলার ডগায় একটা প্রাচীন দুর্গ দেখা যাচ্ছে। দুর্গের নিচে কয়েক সারি বিল্ডিং।

'ওই দুর্গ থেকে ইসরায়েলিরা মাত্র কিছু দিন ধরে হারবারে ঢোকার পথটার ওপর নজর রাখছে,' ওদেরকে জানাল মোবারক। 'ওদের সঙ্গে মেশিনগান আর মর্টার আছে। আরও আছে একটা ম্যাগাজিন, সুরক্ষিত। দুর্গটাকে আসলে অ্যামিউনিশন, মিসাইল আর টর্পেডোর গুদাম হিসেবেই ব্যবহার করছে ওরা। এছাড়াও,' পেনিনসুলার সরু গলায় মোটা একটা আঙুল রাখল সে, 'এখানে দীর্ঘ একটা পাঁচিল আছে। পুরানো পাঁচিল, তবে মেরামত করা হয়েছে। দায়ান দায়ান-এ ঢোকার এটাই একমাত্র পথ, কাজেই পাঁচিল টপকাতে হবে। হারবার বাদে বাকি অংশে খাড়া পাহাড়। হারবারে পৌঁছুবার আগে কাঁটাতারের বেড়াও পেরুতে হবে, সৈকতে মাইনও পোঁতা হয়েছে। পাঁচিলের প্রান্ত থেকে পুরানো ফিশ ফ্যাক্টরি পর্যন্ত সম্ভাব্য সবরকম ডিফেন্স ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করা হয়েছে। হারবারে ইসরায়েলি জাহাজ আছে, ডক-কর্মীদের নিয়ে নিয়মিত আসা-যাওয়া করে—একজোড়া মার্চেন্ট শিপ। ফিশ ফ্যাক্টরির জেটিতে কার্গোও খালাস করে। ওগুলো মার্চেন্ট শিপ হলেও ডেকে মেশিন গান ফিট করা আছে, হারবার কাভার করে।'

'সাবমেরিনগুলো কোথায়?'

মোবারক ব্যাখ্যা করল। ফিশ ফ্যাক্টরিটা বিশাল, মালিক এক আমেরিকান কোটিপতি। চারটে জেটি, একটা ড্রাই ডক সহ অনেক বোট তৈরি করেছিল সে। কিন্তু পর্যাপ্ত মাছ না পাওয়ায় ফ্যাক্টরি ফেলে চলে গেছে। তবে বিল্ডিংগুলো রয়ে গেছে। ব্যাংকের লোন শোধ না করায় লোকটার কোম্পানির সঙ্গে কেস চলছে। সেই সুযোগটাই ব্যবহার করছে ইসরায়েলি নৌ-বাহিনী। ফ্যাক্টরিতে তারা হঠাৎ করে জাহাজ ও সাবমেরিন মেরামত শুরু করেছে। জেটি বা প্ল্যাটফর্মের ওপর প্রচুর ক্রেন আছে।

রানা আবার প্রশ্ন করল, 'হঠাৎ ছোটখাট একটা গ্যারিসন গড়ে উঠেছে, এই তো? সব মিলিয়ে ওখানে কতজন সৈন্য থাকে?'

মোবারক জানাল, এরকম একটা সুরক্ষিত জায়গায় কেউ ঢুকতে পারে না, কাজেই সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন তথ্য তার কাছে নেই। তবে তার ধারণা হাজার দুয়েকের কম হবে না, টেকনিশিয়ান সহ। তবে শুধু যে নৌ-বাহিনীর লোক আছে, তা নয়। পাহারার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সকে। নেতৃত্বে আছে খুব বড় কোন অফিসার, কালো ইউনিফর্ম পরা। নির্ঘাত একজন জেনারেলই হবেন। কিংবা একজন অ্যাডমিরাল।'

'নিজেদের দুটো জাহাজ থেকে সাপ্লাই পায় ওরা,' বলল রানা। 'কিন্তু পাওয়ার পায় কোত্থেকে?'

মোবারক ব্যাখ্যা করল। দুর্গের পিছনে ছোট্ট একটা লোকালয় আছে, ওখানেই হারবারের লোকজন বসবাস করে। ব্যারাক আর দুর্গের মাঝখানে একটা বিল্ডিং আছে, ইসরায়েলিরা সেখানে অনেকগুলো ডিজেল এঞ্জিন আর জেনারেটর বসিয়েছে। বিল্ডিংটা সারাক্ষণ পাহারা দেয়া হয়। ওদিকের একটা গুহার ভেতর মেশিন গান আর মর্টারও আছে।

চেয়ারে বসে চোখ বুজে ছিল শামিম, কথা বলে ওঠায় বোঝা গেল ঘুমায়নি। 'আপনি জায়গাটা সম্পর্কে সব কথাই দেখছি জানেন, মোবারক। কিভাবে?'

'হেলাল জাললুতে মাছ ধরতে যায় আমার বন্ধুরা, তারাই এ-সব তথ্য দিয়েছে আমাকে।'

'হেলাল জাললুতে এখনও মাছ ধরা হয়? ইসরায়েলি সৈন্যরা জেলেদের বাধা দেয় না?'

'হাজার বছর ধরে মাছ ধরছে, এটাই তাদের পেশা,' বলল মোবারক। 'নিষেধ করলে কয়েকশো পরিবার না খেতে পেয়ে মারা পড়বে।' সে আরও জানাল, হারবার থেকে শহর পর্যন্ত একটা রেলপথও আছে। হারবারে বিভিন্ন দেশের জাহাজ ভিড়ত, কাস্টমসকে ঘুষ দিলে যে-কোন পণ্য খালাস করা সম্ভব ছিল। অবশ্য ইসরায়েলি সৈন্যরা গ্যারিসন তৈরি করার পর বিদেশী জাহাজ আসা বন্ধ হয়ে গেছে।

এতক্ষণে মুখ খুলল শাফি, 'কথাটা সত্যি।'

'তুমি জায়গাটা চেনো?' আবার চোখ খুলল শামিম।

'বিপজ্জনক জায়গায় ঢুকতে হলে স্মাগলার হতে হয়, কাস্টমসকে ঘুষ দিতে জানতে হয়,' জবাব দিল শাফি। 'ওখানে আমার বন্ধু আছে। তবে সাবমেরিনগুলো আমি দেখিনি।'

'ছিল,' বলল মোবারক।

'মানে?' সিধে হয়ে গেল শাফির শিরদাঁড়া।

'আকমল হাবিবের কথা বলছি,' বলল মোবারক। 'এ-সব তথ্য তার কাছ থেকেই পেয়েছি আমি, মাস দুই আগে।'

শাফি বলল, 'তার সঙ্গে আমার চার মাস আগে দেখা হয়েছে।' শামিমের দিকে তাকাল সে। বেঈমানী করা হচ্ছে বুঝতে পারলে শামিম তাকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে চায় না শামিম সন্দেহ করুক কোন তথ্য গোপন করা হচ্ছে।

মাথা ঝাঁকাল শামিম। 'এ-সব তথ্য আমাদের খুব কাজে লাগবে।'

শাফির পেশীতে ঢিল পড়ল।

মোবারক বলল, 'আকমল হাবিবকে দায়ান দায়ান গ্রামে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ইসরায়েলিদের হাতে ধরা পড়ে যায় বেচারা। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে গ্রামের একটা গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তার লাশ। কাক-শকুন খেয়ে ফেলেছে, এখন শুধু কঙ্কালটা দেখতে পাবেন।' একটু থেমে গলা খাদে নামাল সে। 'যে খেলাটা আপনারা খেলতে যাচ্ছেন, সেটা ভয়ঙ্কর।'

'যুদ্ধ করতে এসেছি, ভয় দেখাচ্ছেন কেন?' কটমট করে তাকাল শামিম।

কিচেনে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'সাগরে ইসরায়েলিদের ডিফেন্স ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে কি জানেন?'

'সাগরে তেমন কোন ডিফেন্স ফ্যাসিলিটি নেই,' বলল মোবারক। 'জেটির চারপাশে অ্যান্টি-সাবমেরিন নেট আছে। নেট-এর পর পাহাড়-প্রাচীর, আশি মিটার উঁচু। পাহাড়-প্রাচীরের নিচে সাগর। পানিতে প্রবল আলোড়ন, সাদা ফেনা ছাড়া কিছুই দেখার নেই। মাস চারেক আগে মাছের আড়তদার পারভেজের বোট পাহাড়-প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গেছে, পাঁচিলের নিচে। ক্রু সহ ডুবে গেছে আড়তদার। বিশাল নৌকাটা নাকি এখনও আছে ওখানে, মানে যতটুকু থাকা সম্ভব আর কি। ভাটার সময় নাকি দেখা যায়।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'আর কিছু জানার নেই আমাদের। আপনার বোটটা কোথায়?'

'স্যার?'

'ওটা আমাদের দরকার।'

আড়চোখে রানার হাতের দিকে তাকাল মোবারক। চ্যাপ্টা টিনের বাক্সে নগদ মার্কিন ডলার আছে।

রানা বলল, 'আমরা ল্যান্ড করার পর টাকা পাবেন, তার আগে নয়। রাজি?'

এই লোকের সঙ্গে তর্ক করে পারা যাবে না, বুঝল মোবারক। 'ঠিক আছে। রাজি।'

'কখন আমরা রওনা হব?'

'চারটের সময় হারবারে পানি থাকবে,' বলল মোবারক। 'ওই সময় সেন্ট্রিরা খুব একটা সতর্ক থাকে না, বেশিরভাগই ঘুমায়। আপনারা জেটির কাছাকাছি লুকিয়ে থাকবেন। বোটে ওঠার সময় হলে পাঁচ সেকেন্ডের জন্যে আলো জ্বালব আমি।'

'ইসরায়েলি সৈন্যরা চ্যালেঞ্জ করলে?' জানতে চাইল শামিম।

'আমি একজন জেলে, আমার বোট ওরা চেনে,' বলল মোবারক। 'বোটে ইসরায়েলি পতাকা উড়বে। আপনাদের সঙ্গে বিভিন্ন টাইপের ড্রেস আছে, আমি ধরে নিচ্ছি। কিন্তু বোটে ওঠার পর জেলেদের কাপড় পরতে হবে। সে-সব আমি যোগাড় করে রাখব।'

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা, কেফার ভিটকিনের দিক থেকে গোলাগুলির

আওয়াজ ভেসে এল, তারপরই শোনা গেল গ্রেনেড বিস্ফোরণের কয়েকটা শব্দ চেয়ারে হেলান দিয়ে বৃষ্টির আওয়াজ শুনছে ও। ঘুম তাড়াবার জন্যে কফি খাচ্ছে কিন্তু চোখ দুটো আপনাআপনি বুজে এল। হাসান আর শাফি এরইমধ্যে নাক ডাকতে শুরু করেছে। নাহিদ চুপচাপ বটে, কিন্তু নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঘড় ঘড় শব্দ বেরুচ্ছে বন্ধুকে বাঁচানো সম্ভব নয়, উপলব্ধি করে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল রানার

খানিক পর ঘুমিয়ে পড়ল ও।

ঘুম ভাঙল অন্ধকারে। মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছে, মুখের ভেতরটা বিস্বাদ লাগছে, মাথায় ব্যথা। অন্ধকারে কথা বলে উঠল কেউ, পাশ থেকে গলাটা শামিমের। 'বাইরে লোকজন, মাসুদ ভাই।'

দরজায় নক হলো। বাইরে থেকে নাসেরের গলা ভেসে এল, 'ইস্রাফিল' আফলাতুন!'

দরজা খুলে দিয়ে মোবারক বলল, 'আসুন।'

ভেতরে ঢুকল নাসের, সঙ্গে লায়লা। ল্যাম্পের ম্লান, হলদেটে আলোয় চারদিকে তাকাল ওরা, কাউকেই পরিষ্কার চিনতে পারল না। 'মেজর রানা, আমি নাসের

'খুশি হলাম,' ম্লান সুরে বলল রানা।

কিচেনে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

নাসের আবার বলল, 'হাসান সব বলেছে, আশা করি। লায়লাকে ওরা ছেড়ে দেয়। পথে ইসরায়েলি সৈন্যরা আমাদেরকে থামিয়েছিল। কাগজ-পত্র দেখে আটকায়নি। গ্রামের মাথায় একটা গোলাঘরে লুকিয়ে ছিলাম আমরা। পাহারায় ছিলাম, ওখান থেকে রোডটা দেখা যায়। কেউ এদিকে আসেনি। ইসরায়েলিরা আমাদেরকে হারিয়ে ফেলেছে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে রানা বলল, 'এখান থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শুনেছি আমরা।'

'গোল্ডফিশ কাফেতে গোঁফঅলা কমান্ড্যান্ট-এর কথা মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল নাসের। 'সে হিযবুল্লাহ মিলিশিয়ার লীডার, সঙ্গে সত্তরজন লোক আছে কমান্ড্যান্ট আমাকে কথা দিয়েছে, ইসরায়েলিদের তারা ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে'

রানা কোন মন্তব্য করল না। মোবারককে বলল, 'বোটটা আনার ব্যবস্থা করুন। কতক্ষণ লাগবে?'

'সৈকতে পৌঁছুতে? আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছুতে পারি।' নোংরা ওয়েস্ট কোট থেকে পকেট-ঘড়ি বের করল মোবারক। 'তবে সাড়ে চারটের দিকে পৌঁছব মনে রাখবেন, সেন্ট্রিদের চোখে ঘুম থাকলেও, প্রতি ঘণ্টায় ফিল্ড টেলিফোনে রিপোর্ট পাঠায় ওরা। কাজেই খুব সাবধানে যাবেন।' পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে

হাতঘড়ি দেখল রানা, আড়াইটা বাজে। 'নাহিদকে জাগাও এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমরা।'

নাসের জানতে চাইল, 'কমান্ড্যান্টকে নিয়ে কি করা হবে?'

'মানে?'

'সত্তরজন মিলিশিয়াকে নিয়ে ভোরের আগেই এখানে পৌঁছুবে

'লোকটা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে,' বলল লায়লা।

'মাতাল হোক বা না হোক, তাকে আমি চিনি। বলেছে যখন, সময়মতই পৌঁছুবে,' বলল নাসের।

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল নাহিদ। মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল। হঠাৎ তার হাতে একটা রিভলভার বেরিয়ে এসেছে। 'রানা ভাই, সেক্ষেত্রে একজনকে পাহারায় রেখে যেতে হবে তোমাদের।'

কথা না বলে নাহিদের হাতে ধরা রিভলভারের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

নাসের বলল, 'কমান্ড্যান্ট নিজের লোকদের নেতৃত্বে থাকতে চাইবে, আপনার নেতৃত্ব সে মানবে না।'

'কে নেতৃত্ব দেবে সেটা প্রসঙ্গ নয়,' রানার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে নাহিদ। 'আমি আমার লীডারের কাছে পিছনে থেকে যাবার অনুমতি চাইছি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'নাহিদ, এ সম্ভব নয়।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল ও, এক পা সামনে এগোল। হাত পাতল। 'রিভলভারটা দাও, নাহিদ, প্লীজ।'

'না,' ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে নাহিদের ঠোঁটে, সারা মুখ ব্যথায় কাতর। 'না, মাসুদ ভাই, আমার সময় শেষ। কাজেই আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি না। তোমরা যদি জোর করে নিয়ে যেতে চাও, সময়ের খানিক আগে মরতে হবে আমাকে–নিজের হাতে।'

পিছিয়ে এসে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল রানা। নাহিদকে চেনে; জানে, মুখে যা বলছে কাজেও তাই করবে। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে চিন্তা করল কয়েক সেকেন্ড। নাহিদকে ফেলে যেতে হবে, এই চিন্তাটাই অসুস্থ করে তুলছে ওকে। তবে এ-ও সত্যি যে নাহিদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল। তাকে অপারেশনের এই শেষ পর্যায়ে সঙ্গে রাখা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ, পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হবে ওরা।

নাহিদ আবার মুখ খুলল। 'সহজ যুক্তি, মাসুদ ভাই। বোটে চড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, কাকে তোমরা সঙ্গে নিতে চাইছ? আমার মৃত্যু তো সময়ের ব্যাপার মাত্র।'

'কিন্তু,' নাসের বলল, 'আপনি মোবারকের বাড়িতে থাকতে পারবেন না। সৈন্যরা এটাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।'

'যে গোলাঘরটায় আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেটা নাহিদের বিশ্রাম নেয়ার জন্যে আদর্শ জায়গা,' মুখ থেকে হাত নামিয়ে বলল রানা। 'ওখান থেকে রোড, হারবার দেখা যায়–কমান্ড পোস্ট হিসেবেও মন্দ নয়। হাসান, নাহিদকে একটা উজি দাও। নাহিদ, কমান্ড্যান্টকে আমরা তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।' চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল ও, বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল। 'মিশন সফল হোক বা না হোক, আমাদের একজনও যদি বেঁচে থাকে, তোমাকে সে নিতে আসবে।'

'আমার মা আর বউ, ওদেরকে জানিয়ো, মাসুদ ভাই,' বিড়বিড় করল নাহিদ।

কথা বলতে গিয়ে পারল না রানা। দু'তিনবার কাশতে হলো। 'হ্যাঁ, অবশ্যই–বলব, তোমার সাহায্য ছাড়া এতদূর আমরা আসতে পারতাম না।'

জোর করে নিঃশব্দে হাসল নাহিদ। 'বাড়িয়ে বলার স্বভাবটা তোমার গেল না দেখছি!'

হাসানের দিকে তাকাল রানা। 'নাহিদকে গোলাঘরে রেখে আসার ব্যবস্থা

করো।'

নাহিদকে নিয়ে চলে গেল হাসান। যাবার আগে সবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল নাহিদ।

শামিম বলল, 'এই ক্ষতি পূরণ হবার নয়। ওর সাহসের কোন তুলনা হয় না।'

চুপচাপ সব দেখছিল লায়লা, চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এসেছে। শামিমের কথা শেষ হতে নীরবে মাথা ঝাঁকাল। ভেজা চোখ লুকাবার জন্যে ওদের দিকে পিছন ফিরল রানা।

এক মিনিট পর নজর রাখার জন্যে লায়লাকে বাইরে পাঠিয়ে দিল নাসের। তারপর রানার পাশে এসে বলল, 'লায়লাও আমাদের সঙ্গে বোটে থাকছে।'

'কেন?'

'ওকে রেখে গেলে মুখ খুলতে পারে,' বলল নাসের। 'মাছ ধরার নৌকায় মেয়েরা প্রায়ই থাকে, সৈন্যরা ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেবে।'

রানা ভাবল, লায়লা নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা। শুধু এই মেয়েটার কারণেই না অপারেশনটা ভেস্তে যায়। লায়লা অবশ্য জানে না বোট নিয়ে কোথায় যাচ্ছে ওরা, কেনই বা যাচ্ছে। কিন্তু ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর হাতে আরেকবার ধরা পড়লে, তারা ওকে কথা বলাবেই। লায়লা সব কথা না জানলেও, অনেক কথাই জানে। মুখ খুললে সর্বনাশের আর বাকি থাকবে না কিছু।

অবশ্য এরইমধ্যে যদি মুখ খুলে না থাকে। 'ঠিক আছে, আপনার স্ত্রীকে ডাকুন,' বলল রানা।

চারটে বাজতে বিশ মিনিট বাকি থাকতে মোবারকের বাড়িতে ফিরে এল হাসান। নাহিদকে দুই কিলো জেলিগনাইট, ছ'টা গ্রেনেড, উজি, রিভলভার আর ফ্লাস্ক ভর্তি কফি দিয়ে এসেছে সে।

কিচেন টেবিলে নোংরা একটা গ্লাস আর একটা প্লেট ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, টেবিল বা অন্য কোথাও এমন কিছু নেই যা দেখে বোঝা যাবে এখানে সাতজন পুরুষ আর একটা মেয়ে রাত কাটিয়েছে। পিঠে প্যাক, হাতে উজি, তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে রানা। হাসান বাক্সগুলো কাঁধে তুলল। শান্তি মিশনের সদস্যরা পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল, বাগানের দেয়াল টপকে সমতল পাহাড় চূড়া অর্থাৎ খোলা খেত ধরে এগোচ্ছে। এই চূড়ার কিনারা থেকে সেন্ট্রিদের ওপর নজর রাখছে শামিম। বাতাসের গতি কমে গেছে। বে-র পানি প্রায় নিস্তরঙ্গ। জেটির কাছে কয়েকটা ফিশিং বোট ছিল, একটা অদৃশ্য হয়েছে। বে-র চারপাশ হালকা কুয়াশায় ঢাকা, ডিজেল এঞ্জিনের শব্দ শুনে বোঝা গেল, জেলেরা রওনা হবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। এখন শুধু জোয়ার আসার অপেক্ষা সেন্ট্রিদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না জেটির আশপাশে।

শামিমের সঙ্গে কথা বলল রানা, 'সেন্ট্রিরা তিনটে পঞ্চান্ন মিনিটে রেডিওতে অল-ক্লিয়ার মেসেজ পাঠাবে হেডকোয়ার্টারে। ওরা মেসেজ পাঠাবার পর অ্যাকশনে যাব আমরা। কেটে পড়ার জন্যে সময় পাব আধ ঘণ্টা।'

'আধ ঘণ্টা?' পাশ থেকে অচেনা এক লোক বলল, অন্ধকারে তাকে দেখতে না পেলেও সস্তা মদের গন্ধ পেল রানা। 'স্যার, আমি হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, আপনাদের আমরা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময় পাইয়ে দেব।'

ধীরে ধীরে ঘুরল রানা।

'মেজর রানা,' বলল লোকটা। 'আপনার সম্পর্কে শুনেছি। আমি কমান্ড্যান্ট খলিল আহমেদ, আপনার হুকুম তামিল করার জন্যে প্রস্তুত।'

'এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম,' রানাকে বলল নাসের। 'সাবেক হিযবুল্লাহ কমান্ড্যান্ট...'

রানা শুধু উদ্বিগ্ন নয়, বিরক্তও বোধ করল। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট বলে একটা কথা আছে। নাসেরকে থামিয়ে দিয়ে কঠিন সুরে মধ্যবয়স্ক কমান্ড্যান্টকে নির্দেশ দিল, 'আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ আমরা, কমান্ড্যান্ট আপনি সময়মতই পৌছেছেন কিন্তু যদি সাহায্য করতে চান, দলবল নিয়ে মেজর নাহিদের নেতৃত্বে কাজ করতে হবে আপনাকে গ্রামের ওপর গোলাঘরে রিয়ারগার্ড হেডকোয়ার্টার তৈরি করা হয়েছে, সেখানে গিয়ে মেজর নাহিদের কাছ থেকে নির্দেশ নিন। ভাল কথা, আপনার লোকদের বলে দিন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে, এবং কোন রকম আওয়াজ করা চলবে না।'

কমান্ড্যান্ট পাথর হয়ে গেল। নিচে, ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে, জেটির পাশে একজন ইসরায়েলি সৈন্যকে ধীর পায়ে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে। অপর সৈনিক নিশ্চয়ই ফিল্ড টেলিফোনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তিনটে পঞ্চান্ন মিনিটে হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করবে। কমান্ড্যান্ট বলল, 'রিয়ারগার্ড অ্যাকশন? আহত একজন মেজরের অধীনে? আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি...'

'এই, এই, সাবধান!' চাপা গলায় বলল হাসান। 'সরে এসো ওখান থেকে!' স্তূপ করা ইকুইপমেন্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গাঢ় কয়েকটা ছায়ামূর্তি। 'তোমাদের উদ্দেশ্যটা কি...

কথা শেষ হলো না, হাসানের মাথার পাশে কিছু একটা বিস্ফোরিত হলো। রাইফেলের গুলি, বুঝতে দু'তিন সেকেন্ড সময় লেগে গেল তার। কমান্ড্যান্টের গর্বিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে, 'আমরা হিযবুল্লাহ মিলিশিয়া, কথার চেয়ে কাজে বিশ্বাসী।' জেটির দিকে আবার গুলি করল সে।

ইসরায়েলি সেন্ট্রির কাছ থেকে তিন ফুট দূরে লেগেছে বুলেট, চোখের পলকে ডাইভ দিয়ে সরে গেছে সে আড়ালে দ্বিতীয় বুলেটটা খালি জেটিতে কোথাও লাগল।

ইতিমধ্যে মাটিতে শুয়ে পড়েছে রানা। রাগে পিত্তি জ্বলছে, তবে এখন আর কিছু করার নেই–ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে নাহিদ, তুমি একা হয়ে গেলে, ভাই–ভাবল ও। হাসান আর শামিম অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, যেমনটি আশা করেছিল। ডাকল, 'শামিম?'

'পিল বক্স আমার দায়িত্বে,' অন্ধকার থেকে শামিমের গলা ভেসে এল।

'গুড হাসান?'

'আমি সেন্ট্রিদের ব্যবস্থা করব,' জবাব দিল হাসান

হাতঘড়ি দেখল রানা। তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। সন্দেহ নেই, রেডিওতে চিৎকার করছে সেন্ট্রি–রিইনফোর্সমেন্ট পাঠাও, আমরা আক্রান্ত হয়েছি!

নিস্তব্ধতা এমন ভৌতিক আর অটুট, কল্পনা করা কঠিন যে এইমাত্র গোঁয়ার আর গর্দভ একজন সাবেক হিযবুল্লাহ কমান্ড্যান্ট শান্তি মিশনের অপারেশন ব্যর্থ করার জন্যে যে কাজটি করা দরকার ঠিক সেটাই করে বসেছে। তারপর, উপত্যকার পাশের দ্বিতীয় পাহাড় চূড়ায়, গ্রামের মাথায়, ঝলসে উঠল আগুন। পিলবক্সের ইসরায়েলিরা অ্যাকশন নিতে যাচ্ছে।

মেশিনগানের আওয়াজ ভেসে এল কয়েক সেকেন্ড পর, হেভি-ক্যালিবার বুলেট ছুঁড়ছে ওরা। ঝাঁকি খেয়ে কমান্ড্যান্টের এক লোক পড়ে গেল, বাকি সবাই ডাইভ দিয়ে শুয়ে পড়ল, তাদের বেশিরভাগই মধ্যবয়স্ক। 'হায় আল্লাহ! কি ঘটল?' জানতে চাইল কমান্ড্যান্ট।

লায়লার পাশে শুয়ে আছে নাসের, স্ত্রীর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরেছে। 'শালা বুড়ো!' এত রেগে গেছে, ইচ্ছে থাকলেও আর কোন গাল দিতে পারল না।

শাফি দমকা বাতাস অনুভব করল, পাশ কাটিয়ে গেল তাকে। একটু পর বুঝতে পারল বাতাস নয়, কারণ বাতাস কথা বলে না। 'পাঁচ মিনিট পর নেমে এসো,' রানার গলা। 'ইকুইপমেন্ট নিয়ে।'

দুলকি চালে দৌড়ে গ্রামটা পেরিয়ে ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠছে শামিম, বেশি পরিশ্রম করে হাঁপিয়ে উঠতে রাজি নয়। পিলবক্সটা এই মুহূর্তে সরাসরি তার মাথার ওপর, দৃষ্টিপথের ওপর দিয়ে সারি সারি ছুটে যাচ্ছে ট্রেসারগুলো। রাত হবার আগেই পিলবক্সটা দেখে নিয়েছে সে, স্রেফ একটা কংক্রিট বক্স, দরজাটা ইস্পাতের, গায়ে একটা ফাটল আছে, সেই ফাটল দিয়ে মেশিন গানের ব্যারেলই শুধু বেরুতে পারে বাইরে–সৈকত আর বে কাভার করার জন্যে যথেষ্ট।

সাগরে কি যেন একটা নড়ছে। সম্ভবত একটা ফিশিং বোট। কাঠামোটা ধোঁয়াটে কুয়াশায় ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। গতি কমিয়ে হাঁটতে শুরু করল শামিম। আশপাশে কোথাও সেন্ট্রি না থেকে পারে না। মাটিতে শুয়ে পড়ল। পাহাড়ের গায়ে গুঁড়ি মেরে বসে আছে এক লোক, নড়াচড়া দেখে নার্ভাস বলে মনে হলো, উল্টোদিকের পাহাড়চূড়া লক্ষ্য করে ছোঁড়া বুলেটের আওয়াজে প্রতিবার কেঁপে উঠছে। তাকিয়েও আছে সেদিকে, অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই।

পিছন থেকে প্রথমে তার গলা চেপে ধরল শামিম, তারপর ছুরিটা বুকে ঢুকিয়ে দিল। ধীরে ধীরে লাশটা মেঝেতে নামাল শামিম, হেলমেট খুলে নিজের মাথায় পরল। ধীর পায়ে হেঁটে পিলবক্সের দরজার দিকে এগোল সে। পকেট থেকে গ্রেনেড বের করল, প্রকাণ্ড হাতে কালো কয়েকটা ডিম। বাম হাতে দুটো রাখল, লিভার খোলা হয়নি। তৃতীয়টা থাকল ডান হাতে। এক পশলা গুলিবর্ষণ শেষ হবার অপেক্ষায় থাকল সে। তারপর গ্রেনেড ঠুকল ইস্পাতের দরজায়। 'ওহে,' চিৎকার করে হিব্রুতে বলল, 'তোমাদের বানচোত সেন্ট্রি কোথায় মরতে গেছে?'

পিলবক্সের ভেতর থেকে ভোঁতা গুঞ্জন ভেসে এল।

'মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, মেজর সিমন বারেক!' গর্জে উঠল শামিম। 'দিস ইজ

অ্যান এক্সারসাইজ! ওপেন আপ!'

ইস্পাতের দরজা খুলে গেল। দোরগোড়ায় দাঁড়ানো লোকটা তারা জ্বলা আকাশের গায়ে হেলমেট পরা কাঠামোটাই শুধু দেখতে পেল, চেহারাটা অন্ধকারে ঢাকা। 'ইয়েস, স্যার?' বেরিয়ে এল সে।

লাথি মেরে আবার ভিতরে পাঠিয়ে দিল তাকে শামিম, পিন খোলা দুটো গ্রেনেড অনুসরণ করল। পিলবক্স যখন বিস্ফারিত হলো, দরজা লাগিয়ে দিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ততক্ষণে পঞ্চাশ ফুট নিচে নেমে গেছে সে।

ছয়

সৈকতে সেন্ট্রি রাখা হয়েছে অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে, বিশেষ করে স্মাগলারদের ওপর নজর রাখার জন্যে। সশস্ত্র হামলা ঠেকাবার কথা কখনোই ভাবেনি তারা, সময় কাটে ঘুষের টাকা গুনে। হাসানকে নিয়ে রানা যখন জেটিতে পৌঁছুল, সেন্ট্রিরা গার্ড পোস্টে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, উচ্চকণ্ঠে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে, টেলিফোনে চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে।

রানা আশা করছে, মোবারক যেন দেরি করে না ফেলে। পাঁচ মাইলের মধ্যে প্রচুর ইসরায়েলি সৈন্য আছে, কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই তারা পৌঁছে যাবে।

লাথি মেরে কাঠের দরজাটা খুলে ফেলল রানা। হাতে টেলিফোনের রিসিভার, একজন সেন্ট্রি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। দু'জনেই মোটাসোটা, কারুরই বয়েস পঞ্চাশের কম নয়। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, একজনও ওদের দিকে রাইফেল তুলল না। প্রায় যন্ত্রচালিতের মত একযোগে হাত তুলল মাথার ওপর।

'চাবি,' বলল রানা।

একজন সেন্ট্রি পকেট থেকে চাবি বের করে রানার হাতে গুঁজে দিল।

'রাইফেল ফেলে দাও,' নির্দেশ দিল রানা। পাথুরে মেঝেতে ধাতব আওয়াজ তুলল একজোড়া রাইফেল। ওগুলো তুলল ও, একটা হাসানের হাতে ধরিয়ে দিল, অপরটা উল্টো করে টেলিফোন সেটটায় কয়েকটা বাড়ি মারল। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল হাসান।

'কথাগুলো মন দিয়ে শোনো,' সেন্ট্রিদের বলল রানা। 'এটা একটা ইরাকী হিযবুল্লাহ জয়েন্ট অপারেশন। ইরানী-হিযবুল্লাহ মিলিশিয়া, মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইসরায়েলি সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। ওরা কেউ আমাদেরকে সাহায্য করেনি, তাই আমাদের মিশন ব্যর্থ হয়ে গেছে। একটা সাবমেরিন আমাদেরকে তুলে নিতে এসেছে, আমরা চলে যাচ্ছি। কি বলছি বুঝতে পারছ তো?'

একযোগে মাথা ঝাঁকাল সেন্ট্রিরা।

'তোমরা তোমাদের কমান্ডিং অফিসারকে তথ্যগুলো জানাবে,' আবার বলল রানা। 'আমরা, ইরাকীরা, একটা কমান্ডো অপারেশনে এসেছিলাম, কিন্তু কারও কোন সহযোগিতা না পাওয়ায় টার্গেট খুঁজে পাইনি। অফিসারকে জানাবে, আবার

আমরা ফিরে আসব–অদূর ভবিষ্যতে। সেবার সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে আসব, কাজেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে না।'

প্রয়োজন নেই, তবু ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাচ্ছে সেন্ট্রিরা।

বাইরে বেরিয়ে এল রানা ও হাসান। দরজায় তালা লাগাল রানা। কান পাততে হলো না, ট্রাক বহরের আওয়াজ ভেসে এল বাতাসে। রিইনফোর্সমেন্ট পৌঁছে গেছে।

ঢাল বেয়ে জেটিতে নেমে এল নাসের, সঙ্গে রয়েছে শাফি আর লায়লা। প্যাক আর বাক্সগুলো নিয়ে আসতে ভোলেনি ওরা। ফিরে এসেছে শামিমও। দিগন্তরেখার কাছ থেকে সৈকতের দিকে ছুটে আসছে একটা ফিশিং বোট, আকাশের গায়ে মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। শাফিকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার শালা, মানে বুড়ো গাধাটা কোথায়?'

'সৈন্যদের ঠেকাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

'যাও, তাকে গিয়ে সাবধান করো–ইসরায়েলি সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করলে তাকে খুন করার জন্যে কমান্ডো পাঠাব আমি। ভুলটা ভেঙে দিয়ো, বলবে আমরা ইরাকী ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট। আরও বলবে, সাবমেরিনে চড়ে ফিরে যাচ্ছি আমরা। সেন্ট্রিদেরও তাই বলা হয়েছে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। যাও!'

শাফি অন্ধকারে হারিয়ে গেল। নাসের ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। 'ও আল্লাহ্, ফিশিং বোট এখনও আসছে না কেন!'

'আমি কি সাগর, আমার দিকে তাকিয়ে বোট খুঁজছেন?'

সাগরের দিকে তাকাতেই জেটির শেষ প্রান্তে বোটটাকে দেখতে পেল নাসের। লায়লার নিরাপত্তা নিয়ে এত বেশি চিন্তিত সে, মাথাটা ঠিকমত কাজ করছে না। বলল, 'এখন যদি ট্রাক ভর্তি ইসরায়েলি সৈন্য সৈকতে নেমে আসে, বোটটা ডুবিয়ে দেবে।'

হ্যাঁ, ভাবল রানা। শুধু বোট ডোবাবে? তিক্ত হাসি ফুটল ঠোঁটে। নাহিদের কথা মনে পড়ে গেল। গুডলাক, দোস্ত। বেঁচে থাকলে তো কথাই নেই, প্রার্থনা করি মৃত্যুর পর হলেও যেন দেখা হয় আবার।

ট্রাক এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে বোঝা গেল, ওগুলো গ্রামের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে।

জেটি ধরে ছুটে আসছে এক লোক। মোবারক। 'আসুন, স্যার! তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! বোটে উঠুন!'

ফিরে এল শাফি, অন্ধকারে হাঁপাচ্ছে। 'বলেছি।' জেটি ধরে ছুটল সে, বাকি সবাই তার সামনে। বোটের প্রপেলার পানিতে আলোড়ন তুলছে। আকাশে মেঘ না থাকারই মত, বেশ অনেকগুলো তারা দেখা যাচ্ছে। তারা আর সাগরের মাঝখানে উঁচু হয়ে রয়েছে বোটের বো। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে থাকল গোটা পরিবেশ। পরমুহূর্তে গোটা উপত্যকাটাই যেন আগ্নেয়গিরির মত বিস্ফারিত হলো।

জেলিগনাইটে টাইম পেন্সিল ঢুকিয়ে গোলাঘর থেকে বেরিয়ে এল যেন মুমূর্ষু এক পশু। বাঁক নিয়ে হেডলাইটের আলো এখনও রাস্তায় পড়েনি, কখনও শরীরটাকে

গড়িয়ে দিয়ে, কখনও মাটিতে নিতম্ব ঘষে এগোচ্ছে নাহিদ–রাইফেল, রিভলভার, গ্রেনেড আর জেলিগনাইটের বোঝা চুম্বকের মত পিছন দিকে টানছে যেন। রাস্তার মাঝখানে গর্তের ভেতর জেলিগনাইট রেখে পাশের ঝোপে লুকিয়ে থাকল, হাতে গ্রেনেড, পাশে রাইফেল ও রিভলভার।

একে একে বাঁক ঘুরল তিনটে ট্রাক, একটার পিছনে আরেকটা। প্রতিটি ট্রাকে তিল ধারণের জায়গা নেই, গিজ গিজ করছে রাইফেলধারী সৈন্য, প্রতিটি ক্যাবের মাথায় মেশিন গান ফিট করা।

প্রথম ট্রাক পার হয়ে গেল, জেলিগনাইট ফাটল না। পিন খুলে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ল নাহিদ। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, দুর্বল হাতে ছোঁড়া গ্রেনেড ট্রাক থেকে বেশ খানিক দূরে পড়ল। দ্বিতীয় ট্রাক জেলিগনাইটের ওপর চলে এল। আরেকটা গ্রেনেড ছুঁড়ল নাহিদ। তারপর কি হলো, দেখার জন্যে নাহিদ বেঁচে নেই। প্রথম গ্রেনেড আর জেলিগনাইট একসঙ্গে বিস্ফোরিত হলো। রাস্তা, পাশের জঙ্গল, দু'পাশের ঘর-বাড়ি, তিনটে ট্রাক, নাহিদ, এমনকি আকাশের কয়েকটা বাদুড় পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আশপাশের এলাকা, গোটা উপত্যকা, এমন কাঁপতে শুরু করল, যেন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। বিরাট জায়গা জুড়ে তৈরি হলো অগ্নিকুণ্ড, শিখাগুলো আকাশ ছুঁতে চাইছে।

শেষ আরও একটা ট্রাক পিছিয়ে পড়েছিল, বাঁক ঘুরেই দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা। একশো গজ দূর থেকে আগুনের আঁচ লাগছে গায়ে। একজন মেজরের নেতৃত্বে ট্রাক থেকে নেমে পড়ল সৈন্যরা, উজি আর রাইফেল নিয়ে ছুটল তারা আরেক দিকে, ঘুরপথে সৈকতে পৌঁছুবে।

শক ওয়েভের ধাক্কায় ঝাঁকি খেলো মোবারকের বোট আলবিদা। হুইলহাউসে রয়েছে সে, রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটেছে দেখার জন্যে কাউকে পাঠাবেন নাকি?'

কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারছে রানা। নাহিদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথাটা নত হয়ে আছে, যেন ধ্যানে বা প্রার্থনায় মগ্ন।

রানার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে মোবারক অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, 'স্যার, আমার টাকাটা এবার পেতে পারি...'

সৈকত থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হতে থেমে গেল সে।

সাগরের পানি অন্ধকারে কালো আর মসৃণ ছিল, শেষ ট্রাকের সৈন্যরা মেশিনগান থেকে ফায়ার শুরু করায় পানির সারফেস টগবগ করে ফুটতে শুরু করল। এক পশলা বুলেট ঢুকল হুইলহাউসে। আওয়াজ শুনে মনে হলো মোবারক হেসে উঠল, 'হে-হে, টাকা...উফ!' হুস করে শব্দ হলো নাক থেকে, যেন ফুসফুস খালি করতে চাইছে। কয়লা ভর্তি বস্তার মত হুইলহাউসের ডেকে পড়ে গেল সে। হাঁটু গেড়ে তার পালস পরীক্ষা করল রানা। নেই। মারা গেছে।

মুখ তুলে বাইরে তাকাল রানা। ভোর হয়ে আসছে। হাসানকে দেখতে পাচ্ছে, ডেকে মাথা নিচু করে বসে আছে, হাড়সর্বস্ব হাঁটু জোড়া কানের পাশে। মোবারককে ডিঙিয়ে এসে হুইলটা ধরল রানা, চার্টে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল কোন দিকে যেতে হবে। পশ্চিম দিকে রওনা হলো আলবিদা।

*

দিগন্তরেখার ওপর দুর্গ-প্রাকারের মত কুয়াশার পাঁচিল. পাঁচিলের মাথায় রক্তরঙা সূর্য উঁকি দিল।

শামিম খুব কম কথা বলে, হঠাৎ রানার পাশ থেকে যেন আপনমনেই বিড়বিড় করল, 'মাসুদ ভাই, নাহিদ মারা যাওয়ায় এই অপারেশনে আমাদের ব্যর্থ হওয়া চলবে না হয় আমরা জিতব, নাহয় খুন হয়ে যাব–নাহিদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানাবার অন্য কোন বিকল্প নেই।'

রানা বিষণ্ন, কৃতজ্ঞতায় অধোবদন

তারপুলিনে মুড়ে মোবারকের লাশটা পানিতে ফেলে দেয়া হলো, সঙ্গে কিছু বাতিল লোহা ভরে। তার আগে জানাজা পড়েছে শাফি। নিঃশব্দে তলিয়ে গেল লাশটা।

খানিক পর আকাশে আবার মেঘ জমতে শুরু করল. অদৃশ্য হলো সূর্য। গন্তব্যে পৌঁছুতে বারো ঘণ্টা লাগবে ওদের।

আলবিদা পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা, সামনের দিকে উঁচু আর পিছন দিকে খাটো একটা মাস্তুল আছে। পাল তোলার আয়োজন থাকলেও, ব্যবহার করার দরকার পড়বে না বলেই ধারণা করল রানা। বোটের মাঝখানে বড় আকৃতির ফিশ-হোল্ড। সিঙ্গেল-সিলিন্ডার ডিজেল এঞ্জিন। বুলেটে ঝাঁঝরা হুইলহাউসে একটা কমপাস থাকলেও সেটা কতটুকু নিখুঁত কাজ করছে বলা কঠিন। অ্যাডমিরাল্টি চার্টটা অনেকদিনের পুরানো, তাতে আবার কয়েক ঘণ্টা আগে রক্তের দাগ লেগেছে। ফাইভ নট স্পীডে এগোচ্ছে আলবিদা। শাফি সাবধান করে দিল, সামনে থেকে ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীর টহল বোট আসতে পারে।

একটা লকার খুলে ব্র্যান্ডির কয়েকটা বোতল পেল শামিম, আরও রয়েছে কয়েকটা দেশের ভাঁজ করা পতাকা। হলুদ একটা পতাকার ভাঁজ খুলে রানাকে দেখাল। 'কোয়ারানটিন,' বলল সে। 'বোটে রোগ ছড়িয়ে পড়লে ওড়ানো হয়।' এই প্রথম দাঁত দেখা গেল, অর্থাৎ হাসছে সে 'কিংবা চোরাই মাল থাকলে।'

'মোবারক বলেছিল, বোটে একটা তুর্কী পতাকা আছে।'

একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল সেটা বেশ বড় পতাকা। রানার নির্দেশে মাস্তুলে ওড়ানো হলো সেটা। আলবিদা এখন তুর্কী বোট। তুর্কীদের সঙ্গে ইসরায়েলিদের গলায় গলায় ভাব না থাকলেও, শত্রুতা নেই। দুই দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব আছে।

বাতাসের গতি বাড়ছে। সামনে কুয়াশা হালকা হয়ে আসছে। 'কফি?' জিজ্ঞেস করল হাসান

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'সবার জন্যে বানাও।'

ধাপ বেয়ে গ্যালিতে নেমে গেল হাসান। খানিক পর রানা আর শামিমের জন্যে ধূমায়িত দু'কাপ কফি নিয়ে ফিরে এল কফি খেয়ে শামিমকে হুইলের দায়িত্ব দিয়ে লম্বা একটা বেঞ্চে শুয়ে পড়ল রানা। শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

হাসানকে নিয়ে ডেকে বেরিয়ে গেল শাফি, জাল ফেলে মাছ ধরার অভিনয় করতে হবে।

চার ঘণ্টা পর ঘুম ভাঙল রানার। ইতিমধ্যে প্রচুর মাছ ধরা পড়েছে। সাগর শান্ত, যদিও আকাশে মেঘ আরও বেড়েছে, বাতাসের গতিও খুব বেশি। 'ঘুমিয়ে নাও,' চার্ট আর কমপাস দেখে নিয়ে হাসানকে বলল রানা। 'চার ঘণ্টা। ঘুম থেকে উঠে ইকুইপমেন্ট চেক করবে। তারপর আমি ব্রিফ করব।'

ফো'ক্যাসলে চলে এল হাসান। এখানে নিজের বাঙ্কে নাক ডাকাচ্ছে নাসের। নিচের বাঙ্কে লম্বা হলো সে।

চোখে বিনকিউলার, ইসরায়েলি গানবোট থেকে আলবিদার দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাপটেন সিমন পেরেজ। আলবিদা তার পরিচিত বোট, মালিক মোবারককে সে চেনে, ইসরায়েল আর সাইপ্রাসের মাঝখানে চোরাই পণ্য নিয়ে আসা-যাওয়া করে। স্মাগলারদের বোট থেকে নিয়মিত ঘুষ খায় সে, এই ঘুষের টাকায় তেল আবিব আর জেরুজালেমে পাঁচ-সাতটা বাড়ি কিনেছে। কিন্তু ন্যাভাল হেডকোয়ার্টার থেকে রেডিও মেসেজ এসেছে, প্রতিটি ফিশিং বোট সার্চ করতে হবে, দেখতে হবে বিস্ফোরক আর অস্ত্র আছে কিনা, সঙ্গে কাগজ-পত্র থাকুক বা না থাকুক, বোটে অচেনা বা বিদেশী কোন লোক থাকলে অবশ্যই গ্রেফতার করতে হবে। আলবিদার দিকে তাকিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে পেরেজ। বোটটা তার চেনা, কিন্তু মোবারককে দেখা যাচ্ছে না। তবে চেনা এক লোককে দেখতে পাচ্ছে সে—শাফি। শাফিও স্মাগলার, তবে তার নিজস্ব বোট নেই, ভাড়া করা বোট নিয়ে স্মাগলিং করে, তা-ও বছরে মাত্র দু'একবার। প্রশ্ন হলো মোবারকের বোটে শাফি কেন থাকবে? মোবারক তো কাউকে বোট ভাড়া দেয়ার লোক নয়। তাছাড়া, আলবিদায় আর যারা রয়েছে তাদের কাউকেই চেনে না সে।

হেলমসম্যানকে বোট থামাবার নির্দেশ দিল ক্যাপটেন। আলবিদার কাছ থেকে একশো ফুট দূরে স্থির হলো গানবোট। পেরেজ লক্ষ্য করল, ডেকে দাঁড়িয়ে মাছ ধরছিল শাফি, সঙ্গে আরেকজনকে নিয়ে। গানবোট দেখে জাল গুটিয়ে আনছে তারা। মাছ রাখার ঝুড়িগুলোয় কি আছে দেখা দরকার। বোটটাও ভাল করে একবার সার্চ করতে হবে।

হুইলহাউস থেকে গলা বের করে রানা জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার?'

'রুটিন ইন্সপেকশন,' জবাব দিল শাফি, রানার দিকে সরাসরি তাকাল না। 'ক্যাপটেন পেরেজ ঘুষ খায়, আলবিদায় তুর্কী পতাকা উড়তে আগেও দেখেছে সে। তবে আমাকে এই প্রথম দেখছে। তাকে হয় টাকা দিতে হবে, নাহয় মদের বোতল।'

'কি যেন বলছ না তুমি?' চাপা স্বরে অভিযোগ করল নাসের।

রানা জানতে চাইল, 'শাফি? ঘুষই যদি খায়, আমাদের দিকে রাইফেল তাক করে আছে কেন ওরা? আগে কখনও এরকম করতে দেখেছ?'

'না,' ইতস্তত করে বলল শাফি। গানবোটের ফোরডেকে দাঁড়ানো নৌ-সেনাদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে সে। 'পেরেজের সঙ্গে ওরা নতুন লোক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল রানা, নিরীহ একজন জেলে যেমন হাসে, খোশমেজাজী ও সরল—গানবোটের নৌ-সেনারা যাতে কিছু সন্দেহ না করে। কিন্তু হাসিটা ওর চোখ স্পর্শ করেনি। তাকিয়ে আছে মরচে ধরা, রঙ চটা বোর দিকে। ডেকে, ব্রিজ-এর পাশে দু'জন লোক রয়েছে, সামনে একটা সেভেনটিফাইভ এমএম গান। ক্যাপটেন ব্রিজ থেকে এখনও বেরোয়নি। ব্রিজের সামনে আরও দু'জন লোক সাব-মেশিনগানের পাশে দাঁড়িয়ে। সাব-মেশিনগান হালকা অস্ত্র, আলবিদার স্টীল বডির তেমন কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে সেভেনটিফাইভ এমএম গান মোবারকের বোটকে স্রেফ গুঁড়িয়ে দেবে।

কিন্তু গানগুলো আসল সমস্যা নয়। আসল সমস্যা দুই মাস্তুলের মাঝখানে রেডিও এরিয়ালের জঙ্গলটা।

বিপদের সময় বিদ্যুৎবেগে কাজ শুরু করল রানার মাথা। মাত্র একটাই উপায় আছে বিপদ থেকে বাঁচার। শান্তভাবে হেঁটে এসে মেইন হ্যাচ বন্ধ করে দিল ও। পেট্রল বোটের উদ্দেশ্যে হিব্রু ভাষায় চেঁচাতে শুরু করেছে শাফি। গানবোট থেকেও চিৎকার করছে ওরা। ডেক থেকে জাল তুলে এক পাশে সরিয়ে রাখল রানা, তারপর ফিরে এল হুইলহাউসে। 'শুয়ে পড়ুন,' লায়লাকে বলল, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে শাফির হাত থেকে নিজের হাতে নিল হুইল, তারপর বন বন করে স্টারবোর্ডের দিকে ঘোরাল সেটা। ঘুরে গিয়ে নাক বরাবর সোজা গানবোটের দিকে ছুটল আলবিদা, ঠিক মাঝখানে আঘাত করবে।

মেগাফোনে হুঙ্কার ছাড়ছে পেরেজ। এটা তার একটা ভুল। যখন বুঝতে পারল চেঁচিয়ে কোন লাভ নেই, আলবিদা বিশ ফুটের মধ্যে চলে এসেছে। সেভেনটিফাইভ এমএম একবার মাত্র গর্জে উঠল। আলবিদার হুইলহাউসকে পাশ কাটিয়ে বাতাসে শিস কেটে ছুটে গেল শেল, বিস্ফোরিত হলো দুশো গজ দূরে খাড়া পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে। সাব মেশিনগান থেকে ফায়ার শুরু হলো। গানবোট ঢেউয়ের তালে তালে দোল খাচ্ছে, বুলেটগুলো হাত-পাখার আকৃতিতে ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। অকস্মাৎ আলবিদার ফোরহ্যাচ থেকে যমদূতের মত উদয় হলো শামিম আর হাসান। উজির ব্রাশ ফায়ারে ইসরায়েলি গান ক্রুদের ঝাঁঝরা করে দিল শামিম। রক্তে ভেসে গেল ডেক। একজন কি দু'জন ডাইভ দিয়ে আড়াল নিল। মরুক বা না মরুক, ওরা আগ্নেয়াস্ত্রের কাছ থেকে দূরে থাকলেই খুশি শামিম। হাসানের টার্গেট সাব মেশিনগান ক্রু। তার গুলি করা শেষ হতে আলবিদা একটা ঢেউয়ের নিচে নেমে এল। গানবোট ঢেউয়ের মাথায়। একটা বোট উঠছে, আরেকটা নামছে। গানবোটের বাদামী খোলে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল আলবিদার বো। ধাতব সংঘর্ষের কর্কশ আওয়াজে রিরি করে উঠল শরীর। গানবোটে আলবিদার বো প্রায় গেঁথে গেছে, ইসরায়েলি গানাররা সাইট যথেষ্ট নিচু করতে না পারায় লক্ষ্যস্থির করতে পারছে না। এই সুযোগে আবার শামিমের হাতে জ্যান্ত হয়ে উঠল উজি, পেট্রল বোটের খোলে জ্যামিতিক রেখা তৈরি করছে সে, এমন এক জায়গায় যেখানে রেডিওটা থাকার কথা। চারটে গ্রেনেডের পিন খুলল হাসান, নিচের ঠোঁট বাঁকা হয়ে মুখের ভেতর ঢুকে গেল। পেট্রল বোটের ডেক লক্ষ্য করে একটার পর একটা ছুঁড়ল ওগুলো, ডেকে পড়ে ড্রপ খাওয়ার আওয়াজ হল। কানে হাত দেয়ার

সময় পেল না, তার আগেই ওগুলো বিস্ফোরিত হলো একের পর এক। ইংরেজি টি হরফের মত জোড়া লেগে আছে বোট দুটো, আলবিদার বো পেট্রল বোটের ভেতর বেশ খানিকটা সেঁধিয়ে গেছে। ওটার মরচে ধরা প্লেটে বড়সড় একটা গর্ত তৈরি হয়েছে।

বোটের তলায় একটা ঢেউ এল। আলাদা হয়ে গেল বোট দুটো। ইস্পাত ভাঙা বা ছেঁড়ার শব্দ অসহ্য লাগল কানে। হুইল ঘুরিয়ে আলবিদার বো আরেক দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছে রানা।

'ফায়ার!' গর্জে উঠল ক্যাপটেন পেরেজ। গ্রেনেড বিস্ফোরণের আওয়াজ তার কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। রেডিওর এরিয়াল ধ্বংস হয়ে গেছে, ছেঁড়া ঝুরির মত দোল খাচ্ছে বাতাসে। ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ক্যাপটেন, সেই সঙ্গে অনুভব করল গানবোটের নাড়াচড়ায় আড়ষ্ট একটা ভাব এসে গেছে। 'ফায়ার!' আবার গর্জে উঠল। ইতিমধ্যে বিশ গজ দূরে সরে গেছে আলবিদা। ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপ্টেন দেখল সাব মেশিনগানের ক্রুরা ডেকে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে, একজনও নড়ছে না। ফোরডেকের সেভেনটিফাইভ-এমএম অক্ষত, কিন্তু আশপাশে গানাররা কেউ নেই। হঠাৎ অনুভব করল, তার পা ভিজে। বুঝতে বাকি থাকল না যে গানবোট ডুবে যাচ্ছে। সাহায্য পাবার জন্যে মুখ খুলতে গেল, কিন্তু কোথায় রেডিও? তারপর ভাবল, রেডিওর অপরপ্রান্তে তার কাজিন কি ভাবত যদি শুনত যে একদল স্মাগলার ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীর একটা পেট্রল বোট ডুবিয়ে দিয়েছে?

পেরেজ উপলব্ধি করল, তার আয়ু শেষ। শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকল সে, চেহারা কঠিন, মুখ বন্ধ।

বিশ সেকেন্ড পর পানির তলায় তলিয়ে গেল গানবোট। প্রচুর বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছু দেখার থাকল না। একটু পর শুধু একটা টুপি ভেসে উঠল সারফেসে।

দুপুরের দিকে মেঘ কেটে যেতে শুরু করল। সমুদ্রযাত্রায় অভ্যস্ত নয় হাসান, বারবার বমি করছে। পাম্পের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে শামিমকে, তার কোন ক্লান্তি নেই। বারোটার পর ফিশ-হোল্ডে নেমে এল রানা। 'ব্রিফিং,' বলল ও। 'তোমরা রেডি?'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল শামিম। হাসানও ঝাঁকাত, কিন্তু তাতে শক্তিক্ষয় হয়, সে তার শক্তি সঞ্চয় করছে সত্যিকার প্রয়োজনে কাজে লাগাবার জন্যে।

রানা বলল, 'আমরা একটা বে-তে ঢুকেছি। খোলা সাগরের দিকে একটা পাহাড়-প্রাচীর আছে। মোবারক বলে গেছে, ওটা বেয়ে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। তার মানে ইসরায়েলি সৈন্যরা ওদিকে নজর রাখবে না। অন্তত আশা করতে দোষ নেই।'

নিস্তব্ধতার ভেতর শুধু এঞ্জিনের একঘেয়ে শব্দ আর দূর থেকে ভেসে আসা পাথরের ওপর ঢেউ আছড়ে পড়ার গুরু-গম্ভীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'সন্ধের পরপরই ডিঙিতে চড়ব আমরা,' বলল রানা। 'শাফি, নাসের আর লায়লা আলবিদা নিয়ে হারবারে চলে যাবে। জেলেদের অভিনয় করবে, বোট মেরামত করতে চাইবে। দায়ান দায়ান হারবারের দিকটায় ইসরায়েলি সৈন্যদের ডিফেন্স সিস্টেম খুব শক্তিশালী হবার কথা। সাগরের দিকটায় যতদূর দেখতে পাচ্ছি, তেমন কোন আয়োজন নেই ওদের। কারণটা ওই খাড়া পাহাড়। আমরা পাহাড়ে চড়ব

রাতে।'

'যে পাহাড়ে চড়া সম্ভব নয়…'

'আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করতেই এসেছি,' হাসানকে থামিয়ে দিল রানা। 'আমাদের কিছু ইউনিফর্ম দরকার হবে, রিয়াজের প্যাকে যদি পাওয়া না যায়। হাসান, ইকুইপমেন্ট চেক করার কাজটা তোমার। ভাল কথা, সবাই দাড়ি কামিয়ে নাও। কোন প্রশ্ন?'

'ডিঙি থেকে পাহাড়ে আমরা চড়ব কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল হাসান। 'একের পর এক ঢেউ এসে আছাড় খাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে।'

টেবিলের ওপর চার্টের ভাঁজ খুলল রানা। 'ঢেউ আসছে পশ্চিম দিক থেকে। ওখানে একটা গুহার কাছাকাছি বা মুখে আড়তদার পারভেজের ভাঙা বোট এখনও নাকি আছে। শাফি আমাকে জানিয়েছে, জাহাজটা ওখানে থাকার ফলে ঢেউ বাধা পায়, ফলে পানির সারফেস মাঝে মধ্যে সমান থাকে।'

'মাঝে মধ্যে।'

'জোয়ার শুরু ও শেষ হবার মাঝামাঝি সময়। লগ্নটা আসবে আজ রাত একুশ ঘণ্টায়।'

শামিম বলল, 'একুশ ঘণ্টায় অন্ধকার পুরোপুরি গাঢ় হবে না।'

'সাড়ে একুশে হবে।'

'অনেক কথা হয়েছে, এবার আপনাদের পেটে কিছু পড়া দরকার, তারপর খানিক বিশ্রাম,' বলল লায়লা। 'আমি দেখছি খাওয়ার কি ব্যবস্থা করা যায়।'

'তুমি ক্লান্ত,' ঝট করে সিধে হলো নাসের। 'খাওয়ার ব্যবস্থা আমি করছি।'

স্বামীর দিকে কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লায়লা। ক্ষীণ একটা সন্দেহ জাগল, নাসের কি তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না? সবার দিকে পিছন ফিরল সে, দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল। গ্যালিতে চলে গেল নাসের।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকতে হাসান শুতে চলে গেল। লায়লাকে নিয়ে ডেকে উঠে গেছে নাসের, ওদের সঙ্গে শাফিও আছে। রানা আর শামিম নিচু গলায় কথা বলছে।

'কি ভাবছ, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল শামিম, ইঙ্গিতে টেবিলে পড়ে থাকা চার্টটা দেখাল।

'হেলাল জাললু সাবমেরিন লুকিয়ে রাখার জন্যে আদর্শ জায়গা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'পেট্রল বোটটা এখানকার সিকিউরিটি সিস্টেমের অংশ ছিল?' জানতে চাইল শামিম।

'শাফি কি বলল, শোনোনি? ক্যাপটেন পেরেজ বাদে বাকি সব সৈন্যরা নতুন, আগে তাদেরকে গানবোটে ডিউটি দিতে দেখা যায়নি।'

'তবে,' বলল শামিম, 'ওটা রুটিন পেট্রল ছিল।'

'বেগ ইয়োর পার্ডন?'

'নির্দিষ্ট কোন ইনফরমেশন পেয়ে আসেনি ওরা।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় নেই।'

'তা ঠিক।'

'সঙ্গী সবাইকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি?' কয়েক মুহূর্ত পর শামিমই আবার মুখ খুলল।

প্রশ্নটা নিয়ে রানাও চিন্তা করছিল। শাফি স্মাগলার, দু'নম্বরী ব্যবসায় সে অভ্যস্ত। নাসের অত্যন্ত সাহসী, শিক্ষিতও বটে, কিন্তু তার আচরণ সব সময় যৌক্তিক মনে হয়নি ওর। আর লায়লা–যেহেতু কয়েকবার ইসরায়েলি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েছিল, তাকে নিজেদের কাছে রাখাই সবদিক থেকে নিরাপদ। 'উপায় নেই, এদের সাহায্য নিয়েই কাজ উদ্ধার করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল শামিম।

অকস্মাৎ দড়াম করে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল হাসান, চেহারায় রক্ত নেই। রানার প্রথমে সন্দেহ হলো, হাসানকে গুলি করা হয়েছে। কিন্তু না, আলবিদার দুলুনি সত্ত্বেও হাঁটতে তার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। তার হাতের বাক্সগুলোর দিকে তাকাল রানা, তামার পাত দিয়ে মোড়া। ওগুলোয় প্রচুর এক্সপ্লোসিভ আর ফিউজ আছে। 'আগে তোমার ঘুমিয়ে নেয়া দরকার, হাসান, তারপর ইকুইপমেন্ট চেক করবে।'

মাথা নাড়ল হাসান। কথা বলছে না। যেন এমন কিছু ঘটেছে, বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। টেবিলের ওপর পাশাপাশি বাক্সগুলো নামিয়ে রাখল সে। ল্যাচ খুলে ঢাকনি তুলল, ইঙ্গিতে তাকাতে বলল ভেতরে।

মেহগনি কাঠের বাক্স দুটোয় ইসরায়েলি তিনটে সাবমেরিনকে ধ্বংস করার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিস্ফোরক ছিল। ভেতরে চোখ পড়তেই মুখ শুকিয়ে গেল রানার। ছ'ঘণ্টা অতীতে ফিরে গেল ও। মোবারকের বাড়ি থেকে নাহিদকে গোলাঘরে রেখে ফিরে এল হাসান, তার একটু পরই মোবারকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানের পাঁচিল টপকায় ওরা, সমতল পাহাড় চূড়া অর্থাৎ খেত ধরে এগোয়। চূড়ার কিনারা থেকে নিচের জেটি আর সেন্ট্রিদের ওপর নজর রাখছিল, এই সময় দলবল নিয়ে ওখানে হাজির হয় হিযবুল্লাহ মিলিশিয়ার সাবেক কমান্ড্যান্ট খলিল আহমেদ। রানা তাকে নির্দেশ দেয়, গোলাঘর থেকে রিয়ারগার্ড-এর দায়িত্ব পালন করতে হবে, মেজর নাহিদের নেতৃত্বে। তখনই হাসানের চাপা গলা শুনতে পায়–'এই, এই, সাবধান! সরে এসো ওখান থেকে।' রানা দেখতে পায়, কমান্ড্যান্টের কয়েকজন সঙ্গী স্তূপ করা ইকুইপমেন্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে কি সব নাড়াচাড়া করছে।

সন্দেহ নেই, তখনই বাক্স থেকে এক্সপ্লোসিভ আর ফিউজগুলো সরিয়ে ফেলে ওরা।

যেন পাঁচ সেকেন্ড নয়, পাঁচ বছর পর নিস্তব্ধতা ভাঙল শামিম, 'হায় খোদা! এখন যদি ঘুমাতে না যাই, হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে।'

'আমারই ভুল,' অপরাধ স্বীকার করল হাসান। 'ইকুইপমেন্টে ওরা হাত দিয়েছে দেখার পর চেক করা উচিত ছিল।'

রানা শুধু বলল, 'আমাদের কাছে গ্রেনেড আছে।' তবে জানে, আর মাত্র দশটা আছে। দশটা গ্রেনেড দিয়ে তিনটে সাবমেরিন ধ্বংস করার চিন্তা কোন পাগলও করবে না।

'মাত্র চারটে,' বলল হাসান. রানাকে আরেকটা ধাক্কা দিল। 'পেট্রল বোটে আটটা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু গ্রেনেড দিয়ে কিছুই হবে না, সাবমেরিনের প্রেশার হাল ভাঙা গ্রেনেডের কাজ নয়।'

হাসানের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। আশা করছে সমস্যার একটা সমাধান সেই বের করবে।

'মোবারক কি বলেছিল, মনে আছে, মাসুদ ভাই?' হাসানের ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি। 'দুর্গে একটা ম্যাগাজিন অর্থাৎ গোলাবারুদের গুদাম আছে। মাঝে মধ্যে ওদেরকে লঞ্চার আর টিউবে মিসাইল ও টর্পেডো লোড করতে হয়, তাই না? ওগুলো সাবমেরিনের বেশিরভাগ জায়গা দখল করে ফেলে, কাজেই মেরামত করার সময় সাবমেরিনে রাখা সম্ভব হয় না।' হাত দুটো বুকে ভাঁজ করল সে। 'তাই বলছি, বিস্ফোরক নিয়ে চিন্তার কিছু নেই তাছাড়া, এঞ্জিনও তো আছে, তাই না? হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড, ফুয়েল অয়েল, ওয়াটার। হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড বড় ইন্টারেস্টিং জিনিস।' বাঙ্ক হেডে হেলান দিয়ে চোখ বুজল সে। 'গন্ধটা পেলে মনে হবে কোন হেয়ারড্রেসার-এর পার্লারে রয়েছ।' চোখ বুজল সে।

রানা জানতে চাইল, 'হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড সম্পর্কে কি বলতে চাইছ তুমি?'

কিন্তু হাসান ঘুমিয়ে পড়েছে।

ত্রিশ সেকেন্ড পর রানাও ঘুমিয়ে পড়ল।

সারাটা বিকেল জুড়ে আবার মেঘ জমতে শুরু করল আকাশে। ডেকে বেরিয়ে আসার পর গাঙচিলের চিৎকারে কান ঝালাপালা হয়ে গেল রানার। বে থেকে আবার সাগরে বেরিয়ে এসেছে আলবিদা। কালো মেঘের ছাদে ম্লান দেখাচ্ছে সূর্যটাকে। সূর্যাস্তের আরও বিশ মিনিট বাকি, অথচ লাল বলতে যেন কিছুই নেই ওটায়। ধাতব একটা প্রকাণ্ড চোখের মত পানির দিকে তাকিয়ে আছে, মেঘ যেন শুষে নিয়েছে সমস্ত রঙ–আলবিদাকে কালো দেখাচ্ছে, সাগরের পানি ধূসর বাদামী, পাহাড়-প্রাচীর বিবর্ণ স্লেট।

পাহাড়-প্রাচীরের রেখা অকস্মাৎ উঁচু হয়ে কুঁজ-এর আকৃতি পেল, কিনারাগুলো খাড়া। একদিকে কিনারা থেকে পাঁচিলটা সরাসরি সাগরে নেমেছে। কাঠামোটা দেখতে অনেকটা হেলমেটের মত। হেলমেটের ঠিক মাঝখানে মোটা ও সাদা পেন্সিলের মত কিছু একটা রয়েছে, আকাশের দিকে তাক করা। লাইটহাউস। লাইটহাউসের মাথায় ডান দিক ঘেঁষে একটা টাওয়ার। দুর্গের জন্যে এরচেয়ে আদর্শ জায়গা আর হয় না, হেলাল জাললু হারবারকে কাভার করছে। চোখের বিনকিউলার রিজ-এর শিরদাঁড়ার ওপর স্থির করল রানা।

একটা কাঠামো দেখা গেল, কিন্তু ঠিক চিনতে পারল না–পেনিনসূলার গলায় তৈরি করা হয়েছে। চিনতে না পারলেও আন্দাজ করল রানা। পাথরের একটা পাঁচিল, সম্ভবত একটা ব্যাটলমেন্ট ও পানি ভরা পরিখা। সন্দেহ নেই, দুর্গটাকে সুরক্ষিত করার জন্যে ইসরায়েলিরা বেড়া আর ট্রেঞ্চও তৈরি করেছে।

বোটের সামনে চলে এল রানা। হুইলে রয়েছে শাফি। 'হেলাল জাললুতে

তোমার পরিচিত কেউ আছে?'

'তারা সবাই স্মাগলার,' জবাব দিল শাফি।

'তা হোক। রিপেয়ারে কত খরচ পড়বে হিসেব করো।' হুইলহাউসের রেডিও সেটটা ইঙ্গিতে দেখাল রানা। 'ওটা কাজ করছে?'

শাফি হাসল 'স্মাগলারদের রেডিও সব সময় কাজ করে।'

'সুইচ অন করে রাখো। তারপর চলো তীরে ভিড়ি।'

'তীরে আপনারা যাচ্ছেন কিভাবে?' শাফি জিজ্ঞেস করল।

'দেখি কিভাবে যাওয়া যায়।' অপারেশনের এই পর্যায়ে প্রয়োজন না থাকলে কাউকে কিছু না জানানোই ভাল। হাতঘড়ির দিকে তাকাল রানা। বিশ ঘণ্টা পনেরো মিনিট। 'কাল পনেরো ঘণ্টায় তোমাদের কাছে ফিরে আসব আমরা। জেলেদের জেটির কাছে থাকবে। বোটে চড়া মাত্র রওনা হয়ে যাব আমরা।'

'গন্তব্য?'

'এখনও জানি না,' রানার নির্লিপ্ত জবাব।

দায়ান দায়ান পাহাড় চূড়ার দিকে তাকাল শাফি। 'আল্লাহ সহায়,' বিড়বিড় করল সে

আলবিদা ঘুরে গেল। সূর্য ইতিমধ্যে দ্রুত নামতে শুরু করেছে। খানিক পরই অন্ধকার হয়ে এল চারদিক।

সাত

এক ঘণ্টা পর ডিঙি নিয়ে রওনা হয়ে গেল রানা, শামিম ও হাসান; ভূমধ্যসাগরের সাত ফুট উঁচু ঢেউ ওটাকে নিয়ে খেলছে। আলবিদার এঞ্জিনের শব্দ দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে পুব দিকে। ডিঙিতে ওদের সঙ্গে তার ভরা ক্লাইম্বিং রোপ আছে দুই প্রস্থ, নিখুঁতভাবে কুণ্ডলী পাকানো প্রতিটি। উজির সঙ্গে আছে অতিরিক্ত পাঁচটা করে স্পেয়ার ম্যাগাজিন আর আছে গ্রেনেডগুলো। সাধারণ ইসরায়েলি সৈনিকের ইউনিফর্ম পরে নিয়েছে, ক্যামোফ্লেজ শার্ট ও ট্রাউজার, মাথায় স্টীল হেলমেট। আলবিদা থেকে দুর্গের কিনারায় এই ড্রেস পরা সৈনিকই দেখেছে ওরা। রানার সঙ্গে পিটন আছে, পাহাড়ে চড়ার সময় কাজে লাগবে। বাকি যা দরকার হবে, সব ওদেরকে সংগ্রহ করতে হবে দায়ান দায়ান থেকে।

বোটের বোতে বসে আছে হাসান, হাঁটু জোড়া কানের কাছাকাছি, হাতে মেশিন পিস্তল একনাগাড়ে বৈঠা চালাচ্ছে শামিম, তাকে একটা মেশিন বললেই হয়, ক্লান্ত হতে জানে না। সামনে তাকিয়ে ফেনার সাদা একটা রেখা দেখতে পেল, তৈরি হচ্ছে বিরতিহীন ঢেউ পাথরে আছড়ে পড়ায়।

হাত তুলল রানা, 'ওইদিকে।'

সাদা রেখার মধ্যে একটা ফাঁক দেখা গেল, ঢেউ যেখানে ফণা নামাতে বাধ্য হচ্ছে। পাহাড়ের জলমগ্ন পাঁচিলের কাছে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বোল্ডারগুলোর

মাঝখানে মাছের আড়তদার পারভেজের বোট এখনও আটকে আছে। হাসান ভাবল, পাহাড় বেয়ে সত্যি যদি ওপরে ওঠা সম্ভব হয়, ইসরায়েলিদের দারুণ একটা চমক দেয়া হবে। তবে আমরা যদি বাঁচি, এরচেয়ে বড় চমক আমাদের জীবনে আর ঘটবে বলে মনে হয় না।

বড় একটা ঢেউ-এর মাথায় চড়ল বোট, নিচে নেমে প্রায় সমতল পানিতে পড়ল। বৈঠা দিয়ে গভীরতা মাপতে গিয়ে সাগরের তলায় পড়ে থাকা বোল্ডারের অস্তিত্ব টের পেল শামিম। পরমুহূর্তে জলমগ্ন একটা বোল্ডারে ধাক্কা খেলো বোটের তলা। বো থেকে ছিটকে পড়ে গেল হাসান, একটা ঢেউ ওকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে ভারী অস্ত্র রয়েছে, ডুবেই যাচ্ছিল সে। হঠাৎ তার কলার ধরে টান দিল কেউ। একটা জলাবর্তের মধ্যে পড়তে যাচ্ছিল হাসান, কলারে টান পড়ায় বেঁচে গেল। 'তীরে পৌঁছে তোমার প্রথম কাজ এখন অস্ত্রগুলো চেক করা, গলাটা শামিমের, সে-ই তাকে টেনে তুলেছে।

পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায় চূড়া আর ফাটল থেকে খসে পড়া জলমগ্ন বোল্ডার ছড়িয়ে আছে। এই বোল্ডারে ধাক্কা খেয়েই ভেঙে গিয়েছিল ফিশিং বোটটা, কিন্তু ডোবেনি, ঢেউয়ের ধাক্কায় পানির ওপর জেগে থাকা বোল্ডারের দুটো স্তূপের মাঝখানে আটকে আছে।

ওদের ডিঙি ভেঙে গেছে, অন্ধকারে সেটার কোন হদিস নেই। আড়তদারের বোটের ডেক এত পিচ্ছিল আর কাত হয়ে আছে যে, রেইলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হিমশিম খেয়ে গেল ওরা। এরইমধ্যে নিজের উজিটা শামিমের হাতে ধরিয়ে দিল রানা, কাঁধে তুলল কুণ্ডলী পাকানো একপ্রস্থ রশি, তারপর নিকষ কালো পাহাড়-প্রাচীরের দিকে এগোল। বুটের তলায় স্পাইক লাগানো আছে, তা নইলে এই ডেকে হাঁটা সম্ভব হত না।

প্রথম দশ ফুট বোল্ডার, শ্যাওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে, তবে খাড়া নয় সাবধানে, দ্রুত উঠে এল রানা, হাতে নরম ও সচল কি যেন ঠেকল—শ্যাওলা নয়, জোঁক তারপর বালির ওপর গজানো কিছু ঘাস বা গুল্ম ঠেকল আঙুলে। ওগুলোকে ছাড়িয়ে পাথরের গায়ে ফাঁক-ফোকর খুঁজছে রানা। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না, তবে আঙুলের চাপ খেয়ে পাথরের ছাল খসে পড়াটা অনুভব করতে পারল দূর থেকে দেখে নিরেট মনে হলেও, আসলে তা নয়।

খুব সাবধানে, একটু একটু করে উঠছে রানা। পাহাড়-প্রাচীরের গা পচা পনিরের মত নরম, অন্তত বাইরের আবরণটুকু। গায়ে গর্ত বা ফাটল আছে, কিন্তু সবগুলোই শ্যাওলা বা গুল্মে ভরা, হাত ঢোকাবার জন্যে আঙুল দিয়ে প্রথমে সেগুলো পরিষ্কার করতে হচ্ছে গর্তগুলো এত ছোট, ভেতরে কব্জি পর্যন্ত ঢোকে না। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে উঠছে রানা, প্রতি মুহূর্তে ভয় পাচ্ছে গর্তের কিনারা এই বুঝি আলগা হয়ে গেল। তা যদি যায়, সরাসরি নিচের বোল্ডারে পড়বে ও—একটা হাড়ও আস্ত থাকবে না

দশ মিনিট পর একটা ছন্দ এসে গেল, সেটাকে প্রায় স্বয়ংক্রিয়ই বলা চলে পাহাড়ে চড়ার সময় যা সাধারণত ঘটে আর কি—প্রতি মুহূর্তে গর্ত খোঁজা, পাওয়া গেলে কিনারা পরিষ্কার করে ভেতরে আঙুল ঢোকানো, মনে মনে প্রার্থনা করা কিনারা

যাতে খসে না পড়ে বা গুঁড়ো না হয়ে যায়। রানা ঠিক ক্রল করছে না, অনেকটা সাঁতরানোর ভঙ্গিতে উঠছে।

সত্তর ফুট ওঠার পর সাগরের হুঙ্কার কমে এল, কিন্তু বাতাসের গর্জন বেড়ে গেল। এখনও অন্ধের মত উঠছে রানা। হঠাৎ নিজেকে আর অন্ধ মনে হলো না। অন্ধকার থেকে আলোয় উঁচু হলো একটা হাত, পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা ছাড়িয়েছে। মাথা আরেকটু তুলতে আকাশ দেখতে পেল রানা, তা-ও কালো, তবে গাঢ় নয়, দু'একটা তারাও জ্বলছে, মেঘের আড়ালে এক চতুর্থাংশ চাঁদও ম্লান আলো ছড়াচ্ছে।

পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা ধরে ঝুলে আছে রানা, এক পাশ থেকে কে যেন কাশি দিল। পাথরের গায়ে পাথর হয়ে গেল ও। টকটকে লাল আলো জ্বলল ওর কাছ থেকে চার কি পাঁচ গজ দূরে, জ্বলেই নিভে গেল। টর্চ নয়, সিগারেট। তারপর হুড লাগানো একটা টর্চ জ্বলল, সেটাও জ্বলেই নিভে গেল। অন্ধকারের ভেতর সেই আলোতেই ইঁট গাঁথা একটা কাঠামোর খানিকটা আভাস পেল ও। কংক্রিট বা পাথরের তৈরিও হতে পারে, অর্ধচন্দ্র আকৃতির। একটা স্ট্রংপয়েন্ট।

মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। কাঠামোটা নতুন নয়, প্রাচীন বলে মনে হলো। চাঁদের আলোয় কি যেন চকচক করছে, কাত করা ছোট একটা চিমনির মত। চিনতে পারল রানা—লাইট মেশিন গান।

খাপ থেকে ছুরিটা বেরিয়ে এল হাতে। সিগারেটের আগুন দূরে সরে গেছে। পাহাড়ের চূড়ায় নয়, কার্নিসে উঠে এল রানা। ক্রল করে এগোচ্ছে, থামছে, কান পাতছে, তাকাচ্ছে চারদিকে, তারপর আবার ক্রল করছে। পাথরে গাঁথা পাঁচিলের গোড়ায় এসে ধীরে ধীরে সিধে হলো। জুতো আর মোজা খুলে ঝুলিয়ে নিল গলায়। দুশো ফুট নিচে গর্জাচ্ছে সাগর। পাঁচিলের মাথায় বুট পরা একজোড়া পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে—চার কদম ডানে এগোয়, থেমে ঘোরে, চার কদম বামে এগোয়।

অপেক্ষা করছে রানা। বুটের আওয়াজটাকে ডান দিকে চার কদম এগোতে দেবে, কিন্তু বাম দিকে মাত্র দু'কদম।

বড় করে শ্বাস টানল রানা। দশ ফুট উঁচু পাঁচিল বেয়ে এত দ্রুত উঠল, যেন ছুটন্ত একটা মাকড়সা।

ইসরায়েলি সেন্ট্রির চওড়া পিঠ ওর সামনে। লোকটা দাঁড়িয়ে পড়েছে, সিগারেট ধরাচ্ছে আরেকটা। ছুরির হাতলটা রানার দাঁতে চাপা ছিল, চলে এল হাতে।

একসঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল। এক পা সামনে বাড়ল রানা, পায়ের তলায় চাপা পড়ল একটা গিরগিটি। আঁতকে উঠে পা তুলতেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল, পাঁচিলের কিনারা থেকে শরীরটা খসে পড়ছে নিচে। আর ঠিক তখনই, চাঁদটাও সময় পেল না, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আবার।

পাঁচিলের কিনারায় একটা হাত, ঝুলে আছে রানা, তাকিয়ে আছে একজন নয়, দু'জন ইসরায়েলি সৈনিকের হাঁ করা মুখের দিকে। গাধা গাধা গাধা, নিজেকে তিরস্কার করছে রানা; সেই সঙ্গে অনুভব করছে পাঁচিলের পিচ্ছিল কিনারা থেকে হড়কে নেমে যাচ্ছে আঙুলগুলো। শরীরের ভার ধরে রাখতে পারছে না হাতটা, পেশীতে টান পড়ছে। অপেক্ষা করছে, রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঙুলগুলো থেঁতলে দেয়া হবে, চিৎকার করে গ্যারিসনের বাকি সব ইসরায়েলিদের সাবধান করে দেয়া

হবে…

ইসরায়েলি দু'জন এতটাই হতভম্ব, সমস্যার সহজ সমাধান ভুলে গেছে। রানার হাতে রাইফেলের বাড়িও মারছে না, বুট দিয়ে আঘাতও করছে না। চিৎকার করলে গ্যারিসনের পাঁচশো সৈন্যকে সাবধান করে দেয়া যায়, সেটাও ভুলে গেছে।

মাথায় এবার বুদ্ধি খেলল। হিব্রু ভাষায় সাহায্য চাইল রানা, 'হেলপ!'

বাচনভঙ্গিতে কোন ত্রুটি নেই, ফলে ইসরায়েলি দু'জন দ্বিধায় পড়ে গেল–এ তো কোন শত্রু নয়, বিপদে পড়া নিজেদের লোক…

'হাতটা ধরো,' আবার বলল রানা। 'তা না হলে পড়ে যাব নিচে।'

ইতস্তত ভাব কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল একজন সৈনিক, রানার হাত ধরল হাতটা ধরতেই লাফ দিল রানা, পাঁচিলে উঠেই সৈনিকের চোখের ভেতর দিয়ে মগজে ঢুকিয়ে দিল ছুরির ফলাটা। দ্বিতীয় লোকটা পিছনে ছিল, তারপরও সঙ্গীকে ঝাঁকি খেতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিল। হাঁ করছে, চিৎকার করবে। ইতিমধ্যে প্রথম সৈনিকের চোখ থেকে ছুরি বের করে এনেছে রানা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পাঁচিলের নিচে ফেলে দিয়েছে শরীরটা। লোকটার চিৎকার থামানো সম্ভব নয়, কারণ চার-পাঁচ হাত দূরে রয়েছে সে। ছুরিটা ছুঁড়ে মারা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। চাঁদের আলোয় ঝিক করে উঠল রক্তে ভেজা লম্বা ফলাটা, দ্বিতীয় সৈনিকের গলায় গেঁথে গেল হাতল পর্যন্ত। গলায় বিঁধে আছে ছুরিটা, তারপরও এগিয়ে আসছে লোকটা, পিছনে লম্বা হয়ে আছে এক প্রস্থ রশি। লোকটা চিৎকার করতে পারছে না, তবে চোখ দুটো বিস্ফারিত ও নিষ্পলক। একেবারে শেষ মুহূর্তে ঝাঁপ দিল সে। তখনই রানা খেয়াল করল, লোকটার কোমরে কুণ্ডলী পাকানো রয়েছে রশিটা।

একেবারেই প্রস্তুত ছিল না রানা, ওকে নিয়ে পাঁচিলের নিচে খসে পড়ল দ্বিতীয় সৈনিক। খসে পড়ার সময় পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আছে ওরা। নিচের দিকে তাকিয়ে সরু কার্নিসটা দেখতে পেল না রানা। ত্রিশ ফুট নেমে এল, তারপর প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো জোড়া লাগা দুটো শরীর। আহত সৈনিকের কোমরে বাঁধা রয়েছে রশির একটা প্রান্ত, অপরপ্রান্তটা পাঁচিলের মাথায় কোন গোঁজ বা পিটনের সঙ্গে আটকানো।

শূন্যে রশির শেষ প্রান্তে ঝুলছে ওরা। লোকটার গলা থেকে ছুরিটা টান দিয়ে বের করল রানা, এক হাতে রশিটা ধরে আছে। সেটা মোটা, তবে তার জড়ানো নয়। তবু রশি নয়, লোকটার কোমরের বেল্ট কাটল রানা। পাহাড়-প্রাচীরের দেয়াল ঘেঁষে সৈকতে, স্তূপ হয়ে থাকা বোল্ডারের দিকে খসে পড়ল লোকটা।

'সব ঠিক আছে তো, আহরাম?' পাঁচিলের মাথা থেকে নতুন একটা গলা ভেসে এল।

'সব ঠিক,' গলা চড়িয়ে বলল রানা, তারপর রশির কুণ্ডলী খুলে নামিয়ে দিল নিচে।

পাঁচ মিনিট পর রশি বেয়ে ওর পাশে উঠে এল শামিম আর হাসান। ইতিমধ্যে আবার কার্নিসে ফিরে এসেছে রানা। রশিটা গুটিয়ে নিয়ে কুণ্ডলী পাকাল, জিজ্ঞেস করল, 'রেডি?'

চাঁদের আলোয় ওদের হেলমেট ঝাঁকি খেতে দেখল রানা। হাতঘড়ির দিকে

তাকাল। বাইশ ঘণ্টা পনেরো মিনিট। 'ঠিক মাঝরাতে জেনারেটরগুলোর কাছে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। রিপেয়ার শেডের সেন্ট্রিদের পালাবদল খেয়াল করবে, শামিম। হাসান, তোমার কাজ অ্যামিউনিশন ডিপো চিনে রাখা।'

বয়সে ছোট হলেও কৌতুক করে হাসান বলল, 'ইয়েস, বস্!'

'তোমরা এবার উঠে পড়ো,' নির্দেশ দিল রানা।

কার্নিস থেকে পাঁচিলের মাথায় উঠে কাউকে দেখতে পেল না ওরা। নিচের দিকে ঝুঁকে তাকাতে রানাকেও দেখতে পেল না, অন্ধকারের ভেতর কালো পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে লেপ্টে আছে। পথ দেখাল শামিম, পাঁচিলের শেষ মাথায় লোহার ধাপ বেয়ে সাবধানে উপরে উঠছে ওরা। প্রায় পঞ্চাশ ফুটের মত উঠতে হলো, চূড়ায় নিচু একটা পাঁচিল, কয়েকটা ধাপ বেয়ে মাথায় উঠতে হবে। প্যারাপিট বা পাঁচিলের মাথায় উঠল শামিম, হাতে এখন উজি, ইউনিফর্ম নোংরা হয়ে আছে। একটু কুঁজোমত হলো সে, জানে রানা যাদের খুন করেছে তাদের তুলনায় কাঠামোটা তার বড়। তবে ভরসার কথা হলো লোহার ধাপ বেয়ে যে লোকগুলো বিপজ্জনক পাঁচিলে নেমে গিয়েছিল, যে পাঁচিলের নিচে পাহাড়-প্রাচীরের খাড়া গা আর সাগর ছাড়া আর কিছু নেই, সেখান থেকে ওই লোকগুলোই ফিরে আসবে, অন্য কেউ নয়—অন্তত প্যারাপিটে যে বা যারা রয়েছে তারা সেটাই ধরে নেবে। বিশুদ্ধ হিব্রুতে সে বলল, 'ভাইরে, নিচে যে কি ঠাণ্ডা!'

দশ গজ চওড়া একটা টেরেসের কিনারা তৈরি করেছে প্যারাপিটটা, আরও এক প্রস্থ ধাপ অন্য একটা পাচিল ঘেরা লেভেল থেকে নেমে এসেছে। মরচে ধরা প্রাচীন এক সারি কামান দেখা গেল একদিকে। কামান সারির শেষ প্রান্তে একজোড়া ছায়ামূর্তি, সামনে একটা মেশিন গান। তাদের একজন জবাব দিল, 'শালার শীত এখানেই কি কম!'

প্রাইভেট, সাধারণ সৈনিক, বুঝতে পারল শামিম। আশা করা যায় কোন সমস্যা হবে না। 'কফি,' বলল সে

'পালা বদলের সময় হলে বাঁচি, দ্বিতীয় লোকটা বলল। 'মাঝরাতের জন্যে আরও এক ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করতে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল শামিম কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল একবার রানাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না 'জলদি করো, কি বললাম!'

টেরেসে পৌঁছুল হাসান।

'কফি নিয়ে নিচে নেমে যাব আমরা, শামিমের গলায় কর্তৃত্বের সুর, দুই ইসরায়েলি সৈনিকের কানে স্পষ্ট ভাবেই বাজল সেটা। শামিম আশা করছে, তাকে একজন অফিসার বলে মনে করুক ওরা। অফিসারের কথায় যুক্তি থাকে, সব সময় সে যুক্তি ব্যাখ্যা করা হয় না।

'মার্চ!' নির্দেশ দিল শামিম।

সামনে থাকল হাসান, পাথুরে ধাপ বেয়ে টেরেস থেকে টপ লেভেলে উঠে এল ওরা। 'রাইট টার্ন!' নির্দেশ দিল শামিম।

সমতল একটা বিশাল চাতাল ধরে মার্চ করছে ওরা, পাথরের তৈরি, চাঁদের আলো রূপালি লাগছে। ওদের ডান দিকে রেইলিং বা নিচু পাঁচিল, কিনারা নির্দেশ

করছে। সামনে ও বাম দিকে জমিন ঢালু হয়ে নেমে গেছে কালো গহ্বরে. আরও অনেক দূরে হেলাল জাললুতে অল্প কিছু হলদেটে আলোর ক্ষীণ আভাস। বাম দিকে, খুব কাছে গার্ডহাউস, জানালার কাঁচগুলো নিখুঁতভাবে ঢাকা হয়নি, আলোর রশ্মি বেরিয়ে আসছে। ওদের সরাসরি পিছনে প্রাচীন একটা ব্যাটলমেন্ট, মাথার ওপর আধুনিক কাঁটাতারের বেড়া, সম্ভবত শহরের দিকে মুখ করা গোটা পাহাড়-প্রাচীর জুড়ে বিস্তৃত

দুর্গের ভেতর ঢুকে পড়েছে ওরা। তবে হাঁটছে বিপজ্জনক খোলা জায়গায়।

গার্ডহাউসের ভেতর থেকে একটা বেল বেজে উঠল, সেই সঙ্গে শুরু হলো এক লোকের কমান্ড। প্যারেড-গ্রাউন্ডে জড়ো হবার তাগাদা? নাকি ইমার্জেন্সী ওয়ার্নিং? অকস্মাৎ আলোর বন্যায় ভেসে গেল চারদিক। জ্যাকবুট পরা লোকজন একের পর এক দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে আসছে, চাতালে দাঁড়াচ্ছে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে। দরদর করে ঘামতে শুরু করল হাসান। পাঁচশো ইসরায়েলি সৈন্যের মাঝখানে পড়ে গেছে ওরা।

শামিম নির্দেশ দিল, 'হল্ট!' স্থির হয়ে গেল হাসান।

দুর্গের ভেতর ঢুকেছে ওরা ঠিকই, তবে পুরোপুরি নয়। ফ্লাডলাইটের আলো জ্বলে ওঠায় এতক্ষণে দ্বিতীয় বেড়াটা দেখতে পাচ্ছে ওরা, দেয়ালের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় এগিয়েছে, পনেরো ফুট উঁচু, ইনসুলেটর-এর মাঝখানে কাঁটাতার, পাহাড়ি-প্রাচীরের কিনারা থেকে হারবারের কালো পানি পর্যন্ত বিস্তৃত। দুই বেড়ার মাঝখানে প্রতিটি ইঞ্চি, প্রতিটি কাঁকর, একশো কি একশো পঁচিশজন ইসরায়েলি সৈন্যের প্রতিটি বোতাম আর বাকল, মেইন গেটের দু'ধারে বসানো বালির বস্তার ভেতর একজোড়া মেশিনগান পোস্ট দিনের উজ্জ্বল আলোর মত পরিষ্কার। হাসানের কপালের পাশ থেকে ঘাম গড়াচ্ছে। তার পাশে বিশাল শরীর নিয়ে স্থির হয়ে আছে শামিম।

ভেতর দিকের বেড়ার মাঝামাঝি জায়গায় আরেকটা গেট। সেটা খোলা দু'ধারে আরও বালির বস্তা, তার আড়ালে মেশিনগান। মেশিনগানের পাশে চকচক করছে হেলমেট।

'মার্চ!' চাবুকের মত সপাং করে উঠল শামিমের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বুকের ওপর উজি দুটো আড়াআড়ি ভাবে চেপে ধরে চাতালের ওপর দিয়ে এগোল দু'জন। সামনে ঝুলে রয়েছে প্রকাণ্ড গেট, ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। বালির বস্তার আড়াল থেকে মেশিনগানগুলো ওদের দিকে তাক করা, সরাসরি না তাকিয়েও অনুভব করতে পারছে হাসান। আড়চোখে তাকাতে দেখল, শামিমের হেলমেট একদিকে সামান্য কাত হয়ে আছে, ক্যামোফ্লেজ ড্রেসে রাজ্যের আবর্জনা। যে-কোন মুহূর্তে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠবে, সেই ভয়ে কান খাড়া করে আছে সে। নিশ্চয়ই কেউ ইসরায়েলি সৈন্যদের সতর্ক করে দিয়েছে কামান সারির কাছে বসা লোক দু'জনই হবে। ইচ্ছা করেই দুর্গের অভ্যন্তরে ওদেরকে ঢুকতে দিয়েছে তারা, টেলিফোনে খবর পাঠিয়েছে নোংরা ইউনিফর্ম পরা দু'জন টেরেস থেকে চাতালে আসছে।

হাসান হেঁটে চলেছে পা উঠতে চাইছে না, হাঁটু দুর্বল, তবু থামার কথা ভাবতে পারছে না। ক্ষীণ একটা আশার আলোও উঁকি দিচ্ছে মনের কোণে। কই, কেউ তো এখনও কিছু বলছে না! কে জানে, এখানে এই মুহূর্তে যা ঘটছে তা হয়তো রুটিন

এক্সারসাইজ।

গেটের দু'ধারের বালির বস্তার কাছে চলে এল। সামনে কালো গেট। ওদের পিছনে কেউ একজন চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে। ডান দিকে তিনজন প্রাইভেট আর একজন ক্যাপটেন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে অ্যাটেনশন হয়ে আছে ক্যাপটেনের চোখের মণি উঁচু-নিচু হতে দেখল হাসান। চোখের এই নড়াচড়ার কি অর্থ, জানে সে–বুটে ময়লা আছে কিনা, লেদার স্ট্র্যাপ-এর পালিশ ঠিক আছে কিনা, দেখছে।

গেট পেরিয়ে অন্ধকারের ভেতর ঢুকে পড়ল শামিম। এই অন্ধকারেই ডক আর সাবমেরিনগুলো থাকার কথা, অপেক্ষা করছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে, হারবার থেকে বেরিয়ে গিয়ে সৌদি আরব আর কুয়েতের ওপর মিসাইল ছুঁড়বে।

গেট পেরিয়ে বেশ অনেকটা দূরে চলে এসেছে ওরা। হাসানের হেলমেটে ফ্ল্যাডলাইটের আলো এখন প্রায় লাগছেই না। উফ্, বিপদ তাহলে কেটে গেছে!

অকস্মাৎ অন্ধকার থেকে ধাতব শব্দ ভেসে এল। সামনে আর বাম দিকে যেন সূর্য উঠেছে। একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ইংরেজিতে বলল, 'হাতের অস্ত্র যেন না নড়ে। আপনাদেরকে ঘিরে ফেলা হয়েছে।'

আলোর দিকে ঘাড় ফেরাল হাসান। চোখ ধাঁধিয়ে গেল, কিছুই দেখতে পেল না। ওদিকে একজনও থাকতে পারে, আবার একশোজনও।

'হাতের অস্ত্র ফেলে দিন!'

উজি ফেলে দিল ওরা। আলোর পিছন থেকে লোকজন এগিয়ে এল। ইউনিফর্মই বলে দিল, এরা সবাই মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর সদস্য। চারজন সামনে চলে এল, শামিম আর হাসানকে সার্চ করল দু'জন।

'স্বাগতম, ইরাকী বন্ধুগণ,' মিলিটারি পুলিসের একজন ক্যাপটেন এগিয়ে এসে ইংরেজিতে বলল। 'আমরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আসুন।'

ছোট একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে মার্চ করিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে ওদের। কুঁড়েগুলো কাঠের। বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা কংক্রিট বিল্ডিংকে পাশ কাটাল, ভেতর থেকে ডিজেল এঞ্জিনের ভোঁতা আওয়াজ বেরুচ্ছে–জেনারেটর শেড। এ-সব তথ্য জেনেও আর কোন লাভ নেই, ধরা পড়ে যাওয়ায় কোন কাজে লাগানো যাবে না। বাম দিকে, খানিকটা নিচে, আরেকটা শেড, হাতুড়ি পেটা সহ অন্যান্য আওয়াজ শুনে বোঝা গেল যন্ত্রপাতি মেরামত করা হচ্ছে, অন্ধকারে ঝলসে উঠল আর্ক ওয়েল্ডারের চোখ-ধাঁধানো আলো। একটা কারখানা। অস্ত্র এবং সাবমেরিনের যন্ত্রপাতি মেরামত করা হয়।

'হল্ট!' ক্যাপটেন আদেশ করল।

একটা ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, সামনে পাথরের তৈরি পাঁচিল, আর একটা গেট; গেটটা লোহার বোল্ট দিয়ে আটকানো পাঁচিলের মাথায় ব্যাটলমেন্ট। গেটের গায়ে ছোট একটা দরজা খুলে গেল, সামনে এগিয়ে গেটকীপারকে পাস দেখাল ক্যাপটেন। গেট হাউসে ঢুকে টেলিফোন করল লোকটা। বেরিয়ে এসে খুলে দিল গেট। হাসানের কিডনিতে মেশিন পিস্তলের খোঁচা লাগল। ভেতরে ঢোকার পর পিছনে বন্ধ হয়ে গেল গেট।

একটা উঠানে রয়েছে ওরা। ব্যাটেলমেন্টে তিনটে মেশিনগান 'সিকিউরিটি খুব টাইট,' বিড়বিড় করল হাসান।

'ইসরায়েলিদের এটা একটা বড় গুণ।'

'কথা নয়!' হিব্রু ভাষায় গর্জে উঠল ক্যাপটেন।

'বুঝলাম না,' বলল শামিম।

'হিব্রু জানা নেই,' হাসানও বলল।

দু'জনেই সামান্য হলেও তৃপ্তি বোধ করল, শত্রুর হাতে বন্দী হলেও এখনও ওদের আস্তিনে একটা কিছু লুকানো আছে

একটা নয়, দুটো। ওদের লীডার রানা এখনও ধরা পড়েনি।

একটা সেলে ভরা হলো ওদের। কৌতুক করে কিছু বলতে চেষ্টা করায় মেশিন পিস্তলের বাড়ি খেলো হাসান কাঁধে। সেলের ছাদ গম্বুজ আকৃতির। দেয়ালে দুশো পাওয়ারের বালব জ্বলছে। ইস্পাতের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে, করিডরে, বুট পরা প্রহরীরা টহল দিচ্ছে।

এগারোটা একত্রিশ মিনিটে পাঁচজন লোক ঢুকল ভেতরে। চারজন মিলিটারি পুলিস, একজন মোসাড এজেন্ট। এজেন্ট বাদে সবাই ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম পরা মোসাড এজেন্টের বয়স ত্রিশ-এর মত হবে। নীল স্যুট, গাঢ় নীল টাই। নাকে রুমাল চেপে ধরল সে। 'ইস, এরচেয়ে তো নরকও ভাল!' চারদিকে চোখ বুলাল। 'চেয়ার।' বন্দীদের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমি শ্যানন ফেকা, মোসাড এজেন্ট।'

সেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে একজন মিলিটারি পুলিস একটা চেয়ার নিয়ে এল। পায়ের ওপর পা তুলে তাতে বসল শ্যানন ফেকা। শামিম আর হাসান দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, পা দুটো লম্বা করে রেখেছে।

'আমি আপনাদেরকে পালাবার কথা ভুলে যেতে বলব না,' শুরু করল মোসাড এজেন্ট 'কারণ, আশা করি নিজেরাই উপলব্ধি করতে পেরেছেন তা সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে, সে চেষ্টা করব না আমরা,' বলল শামিম।

'আপনাদের মিশনটা কি ছিল, তাও আমরা জানি,' বলল ফেকা। 'কাজেই সে-ব্যাপারেও কোন প্রশ্ন করব না। মাত্র দুটো প্রশ্ন আছে আমার। আমরা কী প্ল্যান করেছি, আপনারা তা জানলেন কিভাবে? ব্যাপারটা এতই গোপন, বাইরের কারও জানার কথা নয়। কিভাবে খবর পেলেন?'

'প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে গেল না?' হাসছে হাসান। 'আপনার বস্ আপনাকে কোন অ্যাসাইনমেন্ট দিলে ব্যাখ্যা করে বলেন গোপন তথ্যগুলো তিনি কোত্থেকে পেয়েছেন? তথ্যটা যদি জানতে চান, আমাদের বসকে বাগদাদ থেকে হাইজ্যাক করে আনুন।'

ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল শ্যানন ফেকা। তারপর বলল, 'আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনাদের সঙ্গী। সে কোথায়?'

হাসান আর শামিম পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর শামিম বলল, 'নিশ্চয়ই কোথাও ভুল বোঝাবুঝির কোন ব্যাপার ঘটেছে। আমরা এই দু'জনই, সঙ্গে আর কেউ নেই বা ছিল না।'

'কি বলতে চাও তুমি?' শামিমের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল হাসান। 'কি

ভেবেছ, অ্যাঁ? মিথ্যে কথা বলে এদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে?'

অকস্মাৎ হাসানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শামিম. 'শালা বলে কি! নিশ্চয়ই ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে···'

'আমি বাঁচতে চাই!' চিৎকার করছে হাসান 'আমি ওদেরকে যা জানি সব বলে দেব···'

দু'জন এমন মারামারি শুরু করল. পারলে যেন খুন করে ফেলে।

এম.পি-রা ওদেরকে ছাড়িয়ে দিল। শামিমকে মেশিন পিস্তল দিয়ে তিন-চারটে বাড়ি মারল একজন।

ছাড়া পেয়ে হাসান নিরাপদ দূরত্বে সরে যাচ্ছে, বলছে. 'আমি স্বীকার করছি, আমাদের সঙ্গে আরও একজন ছিল। সে মারা গেছে।'

'সত্যি কথা বলো, তা না হলে কিন্তু···'

'আমি বাঁচতে চাই। সত্যি কথাই বলছি।' হাসান গম্ভীর।

শ্যানন ফেকার চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। 'কিভাবে মারা গেল সে?'

'পাহাড়ে ওঠার সময় নিচে পড়ে গিয়ে

'পাহাড়ে কি করছিল সে?'

'লুকাবার জন্যে উঠছিল।' দ্রুত চিন্তা করছে হাসান। আলবিদা এখনও সম্ভবত হারবারে আছে শাফি বা অন্যান্যদের কথা ফাঁস করা যাবে না। 'মেইনল্যান্ড থেকে এখানে আসার প্ল্যান করে আমাদের লীডার। রশি ছুঁড়ে পাহাড় চূড়ায় আটকায়। অনেকটা উঠতেও পারে, তারপর পড়ে যায় পাহাড়-প্রাচীরের নিচে খোঁজ নাও, লাশটা পেয়ে যাবে।' একটু থেমে আবার বলল. 'তারপর আমরা ধরা পড়ে যাই।'

'ধরা তো পড়বেই,' বলল মোসাড এজেন্ট। 'ওদিক দিয়ে আসাই তো বোকামি হয়েছে। পাহাড়ে ওঠার সময় প্রচুর শব্দ করেছ তোমরা। চেয়ার'

চেয়ারটা সেল থেকে বের করে নিয়ে গেল একজন এম.পি. গার্ড তার পিছু নিয়ে বাকি সবাইও বেরিয়ে গেল।

একটু পরই অন্ধকার হয়ে গেল সেল

শামিম আর হাসানকে দুর্গের ভিতরটা রেকি করতে পাঠিয়েছে রানা। সাগরের দিকটা, বিশেষ করে টাওয়ারটা নিজে দেখার ইচ্ছে ওর। ওরা চলে যাবার পর পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে ঝুলে থাকল, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখতে চায় কিছু ঘটে কিনা

মেঘের ভেতর সেঁধিয়ে গেল চাঁদ। আড়াআড়িভাবে একপাশে সরে আসতে শুরু করল রানা একশো গজের মত এগিয়েছে, ওপর দিক থেকে কয়েক ধরনের আওয়াজ ভেসে এল। প্রথমে একটা বেল বাজল, তারপর কমান্ডের আওয়াজ। জোড়া বুটের ভারী শব্দও ঢুকল কানে। শামিমের গলা পেল, 'মার্চ!'

বুটের আওয়াজ থেমে গেল। তারপর আর কোন শব্দ নেই। তবে বুঝতে অসুবিধে হলো না, খারাপ কিছু ঘটেছে। কান খাড়া করে অপেক্ষা করছে কখন গুলি হবে। তা অবশ্য হলো না।

গুলি হলো না, তবে খানিক পর প্যারাপিটের ওপর কালো আকাশ ফ্লাডলাইটের

আলোর আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আলো মানেই বিপদ, শামিম আর হাসান সম্ভবত ধরা পড়ে গেছে। ওপরে না উঠে নিচের দিকে নামতে শুরু করল রানা। ধীরে ধীরে একটা ঝুল-পাথরের নিচে এসে লুকিয়ে থাকল, মাথার ওপর প্যারাপিট, বাম দিকে টাওয়ার।

আরও খানিক পর ফ্লাডলাইট নিভে গেল।

যা ঘটার ঘটে গেছে। শামিম আর হাসানের কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করে এখন কোন লাভ নেই। যা করার একাই করতে হবে ওকে।

গলা থেকে নামিয়ে জুতো পরল রানা, জুতোর ওপর মোজা পরল তারপর পকেট থেকে বের করল স্পাইক আর লেদার মোড়া হাতুড়ি। বাম দিকে যেতে হবে ওকে, টাওয়ারটা সেদিকেই, কিন্তু সরাসরি টাওয়ারের নিচে পৌঁছুতে হলে পাহাড়ের গায়ে তৈরি একটা কোণ পার হতে হবে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন মনে হওয়ায় ঝুল-পাথর বেয়ে ওপরে ওঠার সিদ্ধান্ত নিল ও, ওটার ওপর ওঠার পর বাম দিকে যাবে।

নিজেকে রানা অধৈর্য বা উত্তেজিত হতে দিচ্ছে না, কোন রকম তাড়াহুড়োও করছে না। স্পাইক গেঁথে প্রথমে পরীক্ষা করছে শরীরের ভার সহ্য করতে পারবে কিনা, তারপর সেটায় হাত বা পা রাখছে। ঝুল-পাথরের মাথায় উঠতে অনেক সময় লেগে গেল। কিন্তু ওঠার পর হতাশায় ছেয়ে গেল মন—সামনে আরও চওড়া একটা ঝুল-পাথর পথ আগলে রেখেছে এবার রানা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারল না। ঝুল-পাথরটা এত চওড়া, এটাকে পাশ কাটানো সম্ভব নয়। দম ফিরে পাবার অপেক্ষায় ঝুলে থাকল ও, এই সময় একটা দুর্গন্ধ ঢুকল নাকে। পরবর্তী স্পাইকটা গাঁথার জন্যে মাথার ওপরটা হাতড়াচ্ছে, কোন গর্ত বা খাঁজ দরকার। হাতে নরম কি যেন লাগল। এই তরল পদার্থই গন্ধটা ছড়াচ্ছে। হঠাৎ সমস্ত ক্লান্তি ও হতাশা দূর হয়ে গেল। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ, ইসরায়েলিদের পয়ঃনিষ্কাশন ফ্যাসিলিটি ওর নাগালে চলে এসেছে। প্রাসঙ্গিকভাবেই মনে পড়ে গেল, এই স্যানিটেশন পদ্ধতি আরবদেরই আবিষ্কার, পরে ইউরোপীয়দের সভ্য করে তুলতে অবদান রাখে।

তরল আবর্জনা একটা গা খোলা চিমনির ভেতর দিয়ে নেমে আসছে। ওপরে ওঠার কাজে চিমনিটাকে ব্যবহার করল রানা, ওটার খাঁজে পা রেখে ওপরে উঠতে প্রায় কোন সমস্যাই হচ্ছে না।

এক সময় মাথার হেলমেট ঠুকে গেল পাথরে অর্থাৎ চিমনিটা এখানেই শেষ। এরপর শুরু হয়েছে ইঁটের গাঁথুনি। ভাগ্য ভাল, ইঁটের গা থেকে প্লাস্টার খসে পড়েছে অনেক জায়গায়, সেখানে স্পাইক গাঁথতে কোন সমস্যা হলো না। মাথার ওপর টাওয়ারটা এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। পাথরের তৈরি পাঁচিল, অর্ধবৃত্তাকার। প্রায় চূড়ায় উঠে এল ও। কানের পাশে শোঁ-শোঁ করছে বাতাস। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আরেকটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। বুট পরা পায়ের হাঁটাহাঁটি। কেউ একজন পায়চারি করছে। বৃষ্টি ধরে এল, তারপর আবার শুরু হলো জোরে।

ধৈর্য ধরতে মন চাইছে না, জোরে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় সাহসও বেড়ে গেছে। ওপরে পাহারা আছে জানে, তারপরও উঠতে শুরু করল আবার। প্যারাপিট টপকে এল ও, ব্যাটলমেন্টের ভেতর পাথুরে ডেক-এ দাঁড়িয়ে আছে, পায়ে জুতো আর মোজা, ঘন ঘন নাড়াচাড়া করে আঙুলের আড়ষ্ট ভাব দূর করছে আশপাশে কাউকে

দেখা যাচ্ছে না, বৃষ্টি শুরু হবার পর কোথাও মাথা গুঁজেছে সেন্ট্রি।

এক প্রস্থ সিঁড়ি সহ টারিট ছাড়া টাওয়ারের মাথাটা সমতল। দরজাটা বাতাসের উল্টোদিকে। টারিটের মাথায় চিমনি রয়েছে, ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরুতে দেখা গেল, আর আছে রেডিওর চারটে এরিয়াল।

ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে গেছে রানা, খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠায় শরীরটা আর চলতে চাইছে না। বুটের ওপর মোজা পরায় পাথুরে মেঝেতে কোন শব্দ হলো না। টারিটের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল, দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে আশপাশটা দেখে নিচ্ছে। দরজার ভেতর থেকে একজন লোক কাশল। কী-হোল থেকে সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। সেন্ট্রি সম্ভবত একা।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকল রানা। এক সময় বৃষ্টি ধরে এল।

তালা খোলার আওয়াজ হলো। ফাঁক হলো দরজার কবাট। কি ঘটল বোঝার আগেই বুকে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে জ্ঞান হারাল সেন্ট্রি। লাশের গায়ে ছুরির ফলা মুছল রানা। হাতে চলে এল লোকটার উজি আর একজোড়া স্পেয়ার ক্লিপ পকেট হাতড়ে পেবুক পেল শুধু। লাশটা টেনে এনে টাওয়ারের কিনার থেকে ফেলে দিল নিচে।

বুট থেকে মোজা খুলল রানা। বৃষ্টির পানিতে ওর ইউনিফর্মের বেশিরভাগ ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে গেছে। তালুর চামড়া ছড়ে গেছে, উজিটা চেক করার সময় ব্যথা পেল। চৌকাঠ পেরিয়ে দরজাটা ভেতর থেকে নিঃশব্দে বন্ধ করল, সাবধানে নেমে যাচ্ছে প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে।

চোদ্দটা ধাপ নামার পর খিলান আকৃতির একটা দরজা দেখা গেল। লোহার গেটে লেখা রয়েছে—গার্ডরুম। সেটাকে পাশ কাটিয়ে আরও কয়েকটা ধাপ নামল রানা। আরও একটা দরজা। এটার গায়েও কার্ডবোর্ড লটকাচ্ছে, লেখা—রেডিও রুম। ভেতর থেকে লোকজনের গলা ভেসে আসছে। আরও নিচ থেকে টেলিফোনের আওয়াজ ভেসে আসছে, চিৎকার করে কথা বলছে লোকজন, হাঁটাচলা করছে।

সত্যি যদি দুপুর একটায় রওনা হয় সাবমেরিন, ধরে নিতে হয় শেষ মুহূর্তের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে সবাই। গম্ভীর হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। খানিকটা বুদ্ধি খাটিয়ে এই ব্যস্ততাকে গোলযোগে রূপান্তরিত করতে পারে ও, তারপর সেই গোলযোগের সুযোগ নিতে পারে।

সিঁড়ির শেষ বাঁকটা ঘুরল ও। ধাপ বেয়ে নেমে এল নিচে। ওর সামনে একটা করিডর। করিডরের এক দিকে পাশাপাশি অনেকগুলো দরজা, আরেকদিকে শুধুই জানালা। জানালার বাইরে অন্ধকার উঠান। করিডরে আলো খুব কম, মাত্র একটা বালব হলদেটে আলো ছড়াচ্ছে একজন সেন্ট্রির মাপা পদক্ষেপ অনুকরণ করে হাঁটছে রানা। প্রতিটি দরজায় কার্ডবোর্ড, সেগুলোয় লেখা—নেভী অফিস, ডক অফিস, স্টোরস ইত্যাদি। ভেতরে কাগজের স্তূপ, হুমড়ি খেয়ে রয়েছে লোকজন, সিগারেট ফুঁকছে, কথা বলছে টেলিফোনে, ল্যাম্পের আলোয় খসখস করে কি সব লিখছে।

দু'জন সৈনিক, ম্লান চেহারা, বগলে ফাইল, পাশ কাটাল ওকে। একজন নাক সিটকে বলল, 'কিসের গন্ধ রে বাবা!' চেহারা নির্লিপ্ত করে রাখল রানা। চলে গেল তারা।

করিডরের মাথায় আরেকটা সিঁড়ি। কোথায় যাচ্ছে রানা জানে না। কি খুঁজছে তাও পরিষ্কার নয়। যে-কোন একটা সুযোগ বা সূত্র পেলেই চলে ওর। পরবর্তী ইতিকর্তব্য স্থির করতে এক পলকও লাগবে না। কিন্তু শত্রুপক্ষের দুর্গের ভেতর একা ঘোরাঘুরি করার সময় সূত্র বা সুযোগ পাওয়া সহজ নয়। এখনও যে ধরা পড়ে যায়নি, সেটাই আশ্চর্য।

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে দেখে ওপরে উঠছে ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীর একজন ক্যাপটেন। কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে হেলমেটে হাত ঠেকিয়ে স্যালুট করল রানা। ক্যাপটেন ওর দিকে না তাকিয়েই ক্যাপ স্পর্শ করল, চলে গেল পাশ কাটিয়ে। ইউনিফর্ম দেখে কোন সন্দেহ করেনি। রানা ভাবল, ব্যাটার নিশ্চয়ই সর্দি হয়েছে, তা না হলে গন্ধটা ঠিকই পেত। কিংবা হয়তো গন্ধটা পাচ্ছে বলেই সবাই তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

দামী তামাকের গন্ধ ঢুকল নাকে। সুযোগ যদি নাও হয়, এটা অবশ্যই একটা সূত্র। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে খুব দামী হাভানা চুরুটের গন্ধ। নিঃশব্দ পায়ে গন্ধ অনুসরণ করল রানা, ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে।

সিঁড়ির নিচে আরেকটা করিডর, হুবহু প্রথমটার মত, পার্থক্য শুধু করিডরের মাঝখানে একটা দরজা। কালো ওক কাঠের কবাট, লোহার কব্জাগুলো জলপাই শাখার আদলে নকশা করা। শুধু যে দেখতে সুন্দর, তা নয়, এই দরজা বুলেট ঠেকাবার কাজেও উপযোগী। রানা ধারণা করল, ভেতরের কামরা থেকে হারবার দেখা যায়। এটা নিশ্চয়ই কমান্ড্যান্ট-এর অফিস কামরা। হাভানা চুরুটের সুগন্ধ এখানে আরও কড়া।

দরজার দিকে এগোচ্ছে রানা, হঠাৎ খুলে গেল কবাট দুটো। নৌ-বাহিনীর একজন অফিসার বেরুল, একবার মাত্র তাকাল রানার দিকে, দরজাটা ঠেলে দিয়ে করিডর ধরে এগোচ্ছে–চেহারায় ব্যস্ত ভাব, হাতে এক গাদা কাগজ-পত্র। কামরার ভেতর থেকে কয়েকটা শব্দ যেন তাড়া করল লোকটাকে, 'মনে থাকে যেন, এক ঘণ্টার মধ্যে!' আওয়াজটার মধ্যে এমন কিছু আছে, রানার সন্দেহ হলো গলায় ঘা থাকতে পারে, কিংবা হয়তো ঠাণ্ডায় বসে গেছে।

'ইয়েস জেনারেল!' এডিসি বিড়বিড় করল, নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে

কবাট ঠেলে ফাঁক করল রানা, ঢুকে পড়ল ভেতরে।

আট

সামনে করিডর, শেষ মাথায় খিলান আকৃতির জানালার বাইরে গাঢ় অন্ধকার। মার্বেল পাথরের মেঝে বেশিরভাগটাই মরোক্কান কার্পেটে ঢাকা। ভেতরের বাতাস গরম, চুরুটের গন্ধ ভুরভুর করছে। আলো আসছে বিশাল এক ঝাড়বাতি থেকে। একদিকের দেয়ালে নাম করা শিল্পীদের তৈলচিত্র। করিডরের দু'দিকে দুটো করে চারটে দরজা। তিন জোড়া কবাট বন্ধ। একজোড়া খোলা।

কামরাটা বিশাল, চল্লিশ ফুট লম্বা। এক সেট সোফা, দুটো আর্মচেয়ার, একটা টেবিল। বড় আকৃতির ফায়ারপ্লেস। শেষ মাথায় খিলান আকৃতির জানালা। জানালার সামনে ডেস্ক, তাতে একজোড়া টেলিফোন, ইন্টারকম, বেল, অ্যাশট্রে ইত্যাদি। ওই অ্যাশট্রে থেকেই চুরুটের ধোঁয়া উঠছে। ডেস্কের পিছনে বসা ব্যক্তির মাথা খানিকটা ছুঁচাল, শুধু মাঝখানে টাক, টাকের চারপাশে আধ-পাকা চুল ছোট করে ছাঁটা।

কামরায় কোন সেন্ট্রি নেই দেখে একটু অবাক হলো রানা। তারপর ভাবল, দুর্গে কেউ যদি ঢুকতেই না পারে, সেন্ট্রি থাকার দরকারই বা কি? লজিক ঠিক আছে।

কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ডেস্কের পিছনে বসা সামরিক অফিসার মুখ তুলে তাকালেন না। ইউনিফর্মে আটকানো ইনসিগনিয়াগুলো বলে দিচ্ছে, তিনি একজন পুরোদস্তুর জেনারেল। ডেস্কে ফেলে রাখা ক্যাপটাও তাই বলে। সরু আঙুলগুলো অ্যাশট্রের দিকে এগোল। দাঁত দিয়ে চুরুট আটকে ধোঁয়া গিললেন, তারপর উদ্গিরণ করলেন। এতক্ষণে চোখ তুলে রানার দিকে তাকালেন।

পানি রঙা চোখ, চোয়ালের উঁচু ও ফুলে থাকা হাড়ের ওপর বসানো; মুখে মাংস নেই বললেই চলে, চিবুক ছুঁচাল। গলায় নড়ে উঠল কণ্ঠা। কণ্ঠায় কোন সমস্যা আছে। বাম দিকে একটা গর্ত—শুকনো ক্ষতের চিহ্ন। গর্তটার ভেতর আঙুলের অর্ধেকটা ঢুকে যেতে পারে। 'কি?' প্রশ্ন করলেন জেনারেল। কর্কশ, ঘড়ঘড়ে আওয়াজ। চুরুটটা বাম হাত থেকে ডান হাতে নিলেন। রানা লক্ষ করল, ডান হাতটা কৃত্রিম, শক্ত রাবার দিয়ে তৈরি।

নিহত সেন্ট্রির পেবুকটা পকেট থেকে বের করে সামনে বাড়াল রানা, বাড়িয়ে ধরল জেনারেলের দিকে। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে হাত ঝাপ্টা দিয়ে সেটা সরিয়ে নেয়ার ইঙ্গিত দিলেন জেনারেল, হঠাৎ দুর্গন্ধ পেয়ে নাক কোঁচকালেন। প্রাইভেট সোলজার নর্দমায় গড়াগড়ি খেয়ে নিজের পরিচয় দেয়ার জন্যে জেনারেলের কামরায় ঢোকে না। এই বেকুবটা এখানে কি মনে করে ঢুকেছে? রাবারের আঙুল বেল বাজাবার জন্যে বোতামের ওপর স্থির হলো।

মুখে বোকা বোকা হাসি ফুটিয়ে জেনারেলের হাতটা বোতামের ওপর থেকে ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা। ওর দিকে এবার বিস্ময় মেশানো কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন জেনারেল। গলার দু'দিকে রশির মত মোটা দুটো রগ ফুলে উঠল। পেবুকটার দিকে তাকালেন না, চিৎকার করতে যাচ্ছেন।

পেবুক ধরা হাতটা জেনারেলের দিকে আরও এগোচ্ছে। জেনারেল সেটাকে গ্রাহ্য করছেন না। তিনি রানার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। রাগ তো হচ্ছেই, তারচেয়ে বেশি বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন, সেই সঙ্গে অজানা একটা ভয়ও জাগছে মনের কানাচে। পেবুকটা থামল না, বরং হঠাৎ সেটা তীব্র আঘাত করল জেনারেলের কণ্ঠায়। প্রায় একই সঙ্গে অপর হাত দিয়ে জেনারেলের নাকে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল রানা।

চেয়ার সহ কার্পেটের ওপর পড়ে গেলেন জেনারেল। ডেস্ক টপকে তাঁর বুকের ওপর পড়ল রানা। ধস্তাধস্তি না করে স্থির হয়ে থাকলেন জেনারেল, কর্কশ গলায় জানতে চাইলেন, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?'

'এই দুর্গে সম্ভবত একা আমিই পাগল নই,' বলল রানা।

'তুমি…তুমি ইসরায়েলি সেনা নও,' বললেন জেনারেল।

'না।'

জেনারেলের জন্যে অসম্মানজনক হয়ে যাচ্ছে, কথাটা মনে হতেই তাঁর বুক থেকে নেমে পড়ল রানা, হোলস্টার থেকে হাতে বেরিয়ে এল মেশিন পিস্তলটা।

জেনারেলের গলায় দ্রুত ওঠা-নামা করছে কণ্ঠাটা। 'তুমি আমাকে গুলি করলে করতে পারো, কিন্তু ট্রিগার থেকে আঙুল সরাবার আগেই দশজন সশস্ত্র লোক ভেতরে ঢুকে পড়বে। তখন কি করবে?'

'আমার নয়, নিজের কথা ভাবুন, জেনারেল,' বলল রানা। 'আমার কথা শুনলে আপনাকে মরতে হবে না।'

জেনারেল হাসলেন। রানার অনুমতি না চেয়েই কার্পেটের ওপর উঠে বসলেন একটু পিছিয়ে এল রানা। 'যদি বলি, আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম?'

'চালাকি হচ্ছে, না?' বলল রানা। 'ব্যাখ্যা করুন।'

'ইসরায়েলি জেনারেল প্রশ্নের উত্তর দিতে অভ্যস্ত নয়, বললেন জেনারেল 'তুমি উত্তরটা না পেয়েই মারা যাবে।'

হাই তুলল রানা। 'মাফ করবেন, বলল। তারপর জানতে চাইল, 'ওরা কোথায়? আমার দু'জন লোককে আপনারা আটকে রেখেছেন।'

জেনারেলের মুখের পেশীতে ঢিল পড়ল। রানা ওর একটা দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছে। এবারও অনুমতির ধার না ধেরে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন তিনি, দাঁড়াবার সময় খাড়া করলেন চেয়ারটা, তারপর বসলেনও তাতে–তবে ডেস্কের দিকে নয়, রানার দিকে মুখ করে। 'ওরা যেখানে আছে সেখানে তোমাকেও পাঠানো হবে,' বললেন তিনি। চেয়ারের পাশে আধ হাত দূরে বেলের বোতাম। 'কেন এসেছ তোমরা? কি করতে চেয়েছিলে?'

'এটা,' বলেই মেশিন পিস্তলের ব্যারেলটা দিয়ে জেনারেলের অক্ষত হাতের কনুইয়ে বাড়ি মারল রানা।

হাতটা বুকে টেনে নিলেন জেনারেল, ব্যথায় নীল হয়ে গেল চেহারা। কনুইয়ের হাড় নির্ঘাত ভেঙে গেছে। 'এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাকে। মরার আগে এমন কষ্ট পাবে…'

'প্রশ্নের জবাব দিতে শিখুন। আমার সঙ্গীরা কোথায়?'

ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছেন জেনারেল। বসে থাকতে পারলেন না, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সামান্য টলছেন। চিৎকার করে কাউকে ডাকতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু গলা থেকে আওয়াজ বেরুবে না বলে ভয় পাচ্ছেন। ইচ্ছে হচ্ছে বেলের বোতামটায় চাপ দেন, কিন্তু আরেকটা হাড় ভাঙার ঝুঁকি নিতে সাহস পাচ্ছেন না এডিসি ফিরবে এক ঘণ্টা পর। তার আগে আর কেউ কি কোন কাজে তাঁর কাছে আসবে? তিনি জানেন না। এতসব কথা ভাবছেন রানার দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন। চেহারাটা তিনি চেনেন। 'তুমি ইরাকী নও! অথচ আমরা জানি ইরাকী ইন্টেলিজেন্স-এর একদল লোক স্যাবোটাজ করতে আসছে। তুমি তাহলে কে?'

রানা কিছু বলল না

'এত সাহস...প্যারাস্যুট নিয়ে ইসরায়েলে নামো...মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, সেনাবাহিনী, মোসাড–এদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়ো আমাদের সুরক্ষিত একটা ঘাঁটিতে...কে তুমি?'

রানা তবু কিছু বলছে না।

কি যেন মনে করতে চাইছেন জেনারেল। কোন একটা ফাইলে এই লোকের ফটো দেখেছেন তিনি। সত্যি দেখেছেন? দেখে থাকলে নামটা মনে পড়ছে না কেন? 'তুমি...তুমি কি মাসুদ রানা? বিসিআই এজেন্ট? মোসাডের এক নম্বর শত্রু?'

'আমার সঙ্গীরা কোথায়?' রানার সেই একই প্রশ্ন।

'তোমরা তিনজন একসঙ্গে মারা যাবে,' জবাব দিলেন জেনারেল।

মনে মনে স্বস্তি বোধ করল রানা। শামিম আর হাসান এখনও বেঁচে আছে। 'প্লীজ, জেনারেল, ইউনিফর্ম খুলে ফেলুন। তাড়াতাড়ি।'

'না,' বলেই হাত লম্বা করলেন জেনারেল, বোতামটায় চাপ দেবেন।

সাপের মত ছোবল মারল মেশিন পিস্তলের ব্যারেল, হাড়ের মত সাদা জেনারেলের টাক চুরমার হয়ে গেল চোখ উল্টে গেল, দ্বিতীয় বার চেয়ার সহ পড়ে গেলেন কার্পেটে, তারপর আর নড়লেন না।

ডেস্কে মেশিন পিস্তল রেখে চুরুটটা অ্যাশট্রেতে নেভাল রানা। তারপর দরজার সামনে চলে এসে বোল্ট লাগাল। ফিরে এসে পালস দেখল। জেনারেল মারা গেছেন।

ইউনিফর্ম আর বুট খুলে দ্রুত পরে নিল রানা। পরিত্যক্ত ইউনিফর্ম এখনও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখল সেটা। জেনারেলের ইউনিফর্ম ওর গায়ে পুরোপুরি ফিট করেনি, তবে এত আঁটসাঁট নয় যে দৃষ্টিকটু বলা যাবে। যতটা সম্ভব ছায়ার ভেতর থাকতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল।

ডেস্ক থেকে ক্যাপটা নিয়ে মাথায় পরল রানা, কামরাটা ঘুরেফিরে দেখছে। একটা দরজা খুলতে ভেতরে টেবিলের ওপর শর্টওয়েভ রেডিও দেখা গেল। বাথরুমে ঢুকে হাত ধুলো ও। রেজার-এর ব্লেড বদলে দাড়ি কামাতে শুরু করল। ভাবছে। প্যারাস্যুট নিয়ে নামার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে আলো জ্বলে উঠেছিল। দুর্গে ওঠার পরপরই ধরা পড়ে গেছে শামিম আর হাসান জেনারেল বলে গেলেন, তোমার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছিলাম।

দাড়ি কামিয়ে রেডিও রুমে ফিরে এল, সামান্য খোঁড়াচ্ছে–বুট জোড়া ওর পায়ের তুলনায় একটু ছোট। রেডিও অন করে আলবিদার ফ্রিকোয়েন্সিতে ডায়াল ঘোরাল। 'ইস্রাফিল,' পাস কোড উচ্চারণ করল শুধু।

যান্ত্রিক গুঞ্জন ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না। তারপর ক্ষীণ একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'আফলাতুন!' যান্ত্রিক গুঞ্জন সত্ত্বেও নাসেরের গলা চিনতে পারা গেল।

রানা বলল, 'মেইন গেটে প্রচুর এক্সপ্লোসিভ বসিয়ে রেখেছি। যোগাযোগ করা হয়েছে তিনদিক থেকে। রিইনফোর্সমেন্ট আশা করছি।'

'হোয়াট!' নাসের হতভম্ব।

প্রেস-টু-টক সুইচ অন করল রানা। 'যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন,' বলল ও। 'পরবর্তী সমস্ত রেডিও কমিউনিকেশন ভুয়া বলে ধরে নেবেন। মেইন ফোর্স-এর

আসার অপেক্ষায় থাকবেন—এক ঘণ্টা। অ্যাকনলেজ।' সুইচ থেকে আঙুল তুলে নিল।

নাসের সাড়া দিচ্ছে না। হয় ওর নির্দেশ সে বুঝতে পারেনি, তা না হলে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে সময় নিচ্ছে, কিংবা এ স্রেফ বিশ্বাসঘাতকতার লক্ষণ।

'অ্যাকনলেজ,' আবার বলল রানা।

'আই অ্যাকনলেজ,' এবার জবাব দিল নাসের।

অফিস কামরায় ফিরে এল রানা। খুব সাবধানে বোল্ট খুলল দরজার। ফিরে এসে জেনারেলের লাশটা লুকিয়ে রাখল পর্দার আড়ালে। ডেস্কের ওপর চুরুটের বাক্স রয়েছে, একটা চুরুট নিয়ে ধরাল, তারপর জানালার সামনে এসে দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকল।

জানালার বাইরেটা অন্ধকার। পাঁচ মিনিট কাটল। হঠাৎ করে বাম দিকের আলো আরও সাদা হয়ে উঠল, যেন অনেকগুলো বালব জ্বলে উঠেছে। ডেস্কের একটা বোতামে চাপ দিয়ে আবার জানালার সামনে চলে এল রানা। ওর পিছনে খুলে গেল দরজা। একটা গলা পেল ও। 'জেনারেল?'

জানালার কাঁচে তরুণ এক অফিসারের প্রতিচ্ছবি, আড়ষ্টভঙ্গিতে অ্যাটেনশন হয়ে আছে। জেনারেলের বিকৃত গলা যতটুকু সম্ভব অনুকরণ করে রানা বলল, 'গেটে কোন সমস্যা আছে বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। ব্যাপারটা কি?'

'শত্রুর তৎপরতা সম্পর্কে রিপোর্ট পেয়েছি আমরা, জেনারেল।'

'মানে?'

'ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট, জেনারেল। বিস্তারিত আমাকে কিছু জানানো হয়নি।'

রানা বলল, 'ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করো। তুমি নিজে। কি ঘটছে সব জানার পরই শুধু ফিরে আসবে। কোন সমস্যা হয়ে থাকলে আমাকে যেন জানানো হয় সেটার সমাধান করা হয়েছে। গোটা ফোর্স নিজের কর্তৃত্বে নাও। প্রয়োজন হলে, গোটা গ্যারিসন।'

'কিন্তু, স্যার, জেনারেল· অ্যাডমিনিস্ট্রেশন···ভোরে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি···'

রানার মনে হলো ওর হার্টবিট থেমে গেছে। 'সময়টা বলো। কখন?'

'ভোরে, জেনারেল,' তরুণ অফিসার বলল, উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। 'স্যারের নিশ্চয়ই মনে আছে···স্যারই নির্দেশটা দিয়েছিলেন···'

'ভোরের কোন সময়, ইডিয়ট!' ধমক দিল রানা।

'জ্বী, আচ্ছা, বুঝেছি,' অফিসার তোতলাতে শুরু করল। 'মাপ করবেন, স্যার। ও-ফাইভ-ও-ও, জেনারেল।'

'কাজেই জেনারেল অ্যালার্ম বাজাবে তুমি,' বলল রানা। তারপর গেটের দিকে প্রসিড করবে।'

'কিন্তু, স্যার, জেনারেল···

'সাইলেন্স!' গর্জে উঠল রানা 'শুধু সেন্ট্রিদের রেখে যাও, আর মাত্র একজন লোক বন্দীদের ইন্টারোগেশন করব আমি। আমার এসকর্ট দরকার হবে। বাকি সবাই গেটে থাকবে। নির্দেশ মত কাজ না হলে ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে আমি দায়ী

করব।'

'কিন্তু…'

'উপায় নেই, বৃষ্টির মধ্যেই বেরুতে হবে তোমাকে,' বলল রানা। 'এবং শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে। আমার কাছে খবর আছে, ওরা রিইনফোর্সমেন্ট সহ আসছে–শুধু ইরাকী ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট নয়, সঙ্গে বিসিআই এজেন্ট আছে। শান্তি মিশন নিয়ে আসছে ওরা।'

বুট ঠুকে স্যালুট করল তরুণ অফিসার। 'ইয়েস, স্যার,' আড়ষ্ট, আহত কণ্ঠে বলল। তার দৃষ্টি পথ ঢেকে রেখেছে জেনারেলের ইউনিফর্ম।

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসকর্ট পাঠাও,' বলল রানা। 'ডিসমিস।'

আবার বুট ঠোকার আওয়াজ শুনল রানা। দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। একটু পরই অ্যালার্ম বেল বাজতে শুরু করল, বিরতিহীন। ঘুরল রানা, নতুন আরেকটা চুরুট ধরাল।

পাঁচটায়। সাবমেরিনগুলো আট ঘণ্টা আগে রওনা হচ্ছে। অথচ শান্তি মিশনের সদস্যরা ওগুলোকে এখনও চোখের দেখাও দেখেনি, কাজ শুরু করা তো দূরের কথা।

বাইরের করিডরে অনেক বুটের আওয়াজ, অফিস রুম কাঁপিয়ে দিল জেনারেলের স্টাফ ওরা, নির্দেশ পেয়ে গেটের দিকে ছুটছে। বুটের ভারী আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল। দু'বার নক হলো দরজায়। জানালার দিকে ফিরল রানা। 'এসো!' ধমকের সুর।

নার্ভাস একটা কণ্ঠস্বর, 'স্যার, জেনারেল!'

'বন্দীদের জেরা করব আমি,' বলল রানা। 'পথ দেখাও।'

'পথ দেখাব, স্যার?'

'সামনে থাকো,' রানার সুর কঠিন। 'আমি অনুসরণ করব। অ্যাবাউট টার্ন!'

আধ পাক ঘুরল সৈনিক ঘুরল রানাও, হাতদুটো পিছনে এক করা। করিডরে বেরিয়ে এসে চিবুকটা কলারে ডুবিয়ে রাখল ও, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে অনুসরণ করছে প্রাইভেটকে। কেউ যদি দেখে এখন, দেখবে জেনারেলের ক্যাপ চোখের ওপর নেমে আছে, গভীর চিন্তায় মগ্ন, রাউন্ড দিতে বেরিয়েছেন। তবে দেখার মত কেউ নেই, কেরানীরা ছাড়া। অ্যালার্মের আওয়াজ শুনে অ্যাসেম্বলি পয়েন্টে চলে গেছে সবাই। ওখান থেকে তরুণ অফিসারের নির্দেশে পেনিনসুলার র‍্যামপার্ট-এ পজিশন নেবে তারা।

এসকর্টের বুট সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে রানার, এরইমধ্যে ফোস্কা পড়ে গেছে পায়ের চামড়ায়।

আলবিদায় ভুয়া মেসেজ পাঠিয়েছে ও। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেই মেসেজ পৌঁছে গেছে অস্থায়ী গ্যারিসনে।

আলবিদায় কেউ একজন বিশ্বাসঘাতক আছে।

লায়লা দীর্ঘ একটা সময় ইসরায়েলের ভেতর ছিল, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। মোসাড এজেন্ট আর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স কয়েকবার তাকে জেরা করেছে। সে যদি দলবদল করে থাকে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই নাসেরকেও রানা

পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। লায়লাকে ইসরায়েলিরা বারবার ধরার পরও ছেড়ে দিয়েছে, তার স্বামী ওদের পক্ষে তথ্য পাচারের কাজ করছে বলেই কি? তারপর শাফির কথাও ভাবল রানা। ইসরায়েল সম্পর্কে সমস্ত তথ্য তার জানা। নিয়মিত স্মাগলিং করত তাকে দিয়ে কাজ করানো ইসরায়েলিদের জন্যে সহজ। সন্দেহের তালিকা থেকে কাউকেই বাদ দেয়া যায় না।

তবে এখন এসব নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে।

সোলজার দাঁড়িয়ে পড়ল। 'জেনারেল।'

লম্বা একটা করিডরে রয়েছে ওরা, দু'পাশে ইস্পাতের দরজা। সিলিং থেকে সাদা আলো আসছে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। গুমোট, ভ্যাপসা একটা গন্ধ বাতাসে কাছাকাছি দরজার পাশে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়ানো সেন্ট্রি খুক করে একবার কাশল রানা বলল, 'চাবি।'

আবার কাশল সেন্ট্রি।

'চাবি!' ধমক দিল রানা, হাত পাতল।

'ইয়েস, স্যার!' বলে বেল্ট হাতড়াতে শুরু করে রানার হাতের দিকে তাকাল সেন্ট্রি

রানার গায়ের চামড়া অকস্মাৎ বরফ হয়ে গেল। ওর বাড়ানো হাতের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে সেন্ট্রি। ডান হাত ওটা। রক্ত-মাংসের অকৃত্রিম হাত। অথচ জেনারেলের ডান হাত বাদামী রাবার দিয়ে তৈরি। 'স্যার, জেনারেল,' বলল সেন্ট্রি, মুখের ভাব দেখে সন্দেহ হলো এখুনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। 'আপনার হাত…আপনি জেনারেল নন!'

'চাবি,' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। ক্যাপের কিনারা থেকে দেখতে পেল লোকটার হাত মেশিন পিস্তলের দিকে এগোচ্ছে।

সেলটা আগের মতই অন্ধকার। ঠাণ্ডা আর দুর্গন্ধ আগের চেয়ে বেড়েছে যেন। পকেট হাতড়ে সিগারেট পেল হাসান, শামিমকে একটা দিল। প্রায় দু'ঘণ্টা পর প্রথম কথা বলল শামিম, 'ক'টা বাজল বলো তো?'

হাসান বুঝতে পারল, অপারেশনের কথা এখনও ভুলতে পারছে না শামিম। হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রেখে বলল, 'বারোটা পাঁচ।'

'এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে কিছু একটা ঘটবে।'

আরও ত্রিশ সেকেন্ড নিঃশব্দে কাটল। কিছুই ঘটল না। তারপর সেলের বাইরে অকস্মাৎ মেশিন পিস্তল গর্জে উঠল। তিন সেকেন্ড পর ধাতব শব্দ তুলে খুলে গেল দরজা। অন্ধকারে বিস্ফোরিত হলো উজ্জ্বল আলো। আলোর সামনে একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে। পা দুটো যথেষ্ট ফাঁক করা, গায়ে আঁটসাঁট ইউনিফর্ম, হাত দুটো কোমরে। শামিম আর হাসান নিঃশব্দে হাসতে শুরু করল। ওরা ওদের হিরোকে চিনতে পেরেছে।

রানার গলা শুনতে পেল ওরা, 'আমি ভাবলাম এখানে থাকতে তোমাদের ভাল লাগছে না, তাই নিতে এলাম।'

মুহূর্তে নীরবতা। শুধু করিডর থেকে চাপা গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে

শামিম বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারলে তোমার সঙ্গে নরকে যেতেও আমার আপত্তি নেই।'

হাসান বলল, 'ইউনিফর্মটা গায়ে ফিট করেনি।'

'কি আর করা, ব্যাটা আমার চেয়ে রোগা ছিল,' হাসি চেপে বলল রানা। বেরিয়ে এল করিডরে। মেঝেতে দু'জন লোক পড়ে আছে। 'ওদের ইউনিফর্ম পরে নাও, পকেট থেকে বের করো পেবুক,' নির্দেশ দিল ও। লোক দু'জনকে টেনে সেলে ঢোকাল শামিম। বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা।

'এখন কি করব আমরা?' জানতে চাইল হাসান।

'তোমাদের কি দরকার তাই বলো।'

হাসান তার বিস্ফোরক ফেরত পেতে চায়। কিন্তু চাইলেই তো পাবে না। 'যা পাব তাই দিয়েই কাজ সারতে হবে,' বলল সে। 'এখানে সাবমেরিন থাকলে মিসাইল আর টর্পেডোও আছে। টর্পেডোর সাহায্যে মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটানো যায়। আমি ম্যাগাজিনটা দেখতে পেলে খুশি হতাম।'

শামিম কিছু বলল না, শুধু মাথা ঝাঁকাল।

পাঁচ মিনিট পর জেনারেল দু'জন এসকর্টকে নিয়ে মেইন গেট পেরুল। এসকর্টদের একজন যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, আরেকজন লম্বা ও একহারা, দু'জনেই আড়ষ্টভঙ্গিতে যে যার মেশিন পিস্তল বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে ধরে আছে। গেটের সেন্ট্রিরা স্যালুট করল। জেনারেল স্যালুটের জবাব দিলেন বাম হাতে; কৃত্রিম ডান হাত শরীরের পাশে সেঁটে আছে।

পরিখার ওপর ব্রিজটা পেরিয়ে এসে ডান দিকে ঘুরল ওরা, প্রশস্ত এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছে। চারদিকে আরও লোকজন দেখা যাচ্ছে। হারবারের আকাশ ওয়েল্ডিং টর্চের নীলচে আলোয় ঝলসে উঠছে মাঝে মধ্যে। সিঁড়ির নিচে, হেডল্যান্ডের কাঁধে, গভীর একটা গর্তের মত জায়গাটা। গর্তের মাঝখানে ভোঁতা চেহারার একটা কংক্রিট বাঙ্কার, কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা।

কোথাও থেকে ট্রাক এঞ্জিনের ভারী আওয়াজ ভেসে আসছে। লোহার ওপর হাতুড়ি ঠোকার শব্দও পাচ্ছে ওরা। একটা ট্রাক দেখা গেল, লোকজন ভর্তি। অস্থায়ী গ্যারিসন খালি করে চলে যাচ্ছে সবাই। কিন্তু মেইন গেটে এখনও সশস্ত্র লোকজন রয়েছে।

বাঙ্কার এরিয়ায় ঢুকতে হলে একটা গেট পেরুতে হবে। সেদিকে এগোল রানা। কাছাকাছি এসে দেখা গেল, ঠিক বাঙ্কার নয়, পাঁচিল ঘেরা একটা সুরক্ষিত জায়গা, ফুলে থাকা জমিনের ওপর তৈরি করা হয়েছে। প্রবেশপথে ইস্পাতের দরজা। এটাই ম্যাগাজিনে ঢোকার পথ।

গেটে দাঁড়ানো সৈনিক নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে। 'পাস?'

জেনারেলের কর্কশ গলা অনুকরণ করল রানা, 'গেট খোলো।'

'কিন্তু, স্যার, জেনারেল...'

'নিয়ম রক্ষার জন্যে জেনারেলকে চ্যালেঞ্জ করা, ভেরি গুড,' বলল রানা। 'তোমার তো পদোন্নতি হওয়া উচিত। কিন্তু আশ্চর্য, কাল রাতে তোমার ফাইলে যে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট দেখলাম, তাতে তো তোমার কোর্ট মার্শাল করার সুপারিশ করা

হয়েছে—নানা ধরনের অনাচার আর কর্তব্যে গাফলতির জন্যে। ব্যাপারটা কি?'

'আমার ফাইল···জেনারেল···

'এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে তুমি পরে দেখা কোরো। এখন কি দরজাটা খুলবে?'

গেট খুলে দিল সেন্ট্রি, ভেতরে ঢুকল ওরা। সেন্ট্রি নিশ্চয়ই কোন বোতামে চাপ দিয়েছে, কারণ ইস্পাতের দরজা হাইড্রলিক-এর আওয়াজ তুলে বন্ধ হয়ে গেল ওদের পিছনে। সামনে এক প্রস্থ প্যাঁচানো সিঁড়ি, সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায়, একপাশে একটা হয়েস্ট বা লিফট, ওটার সাহায্যেই দুর্গের মেশিনগানে অ্যামিউনিশন পাঠানো হয়। সঙ্গীদের দিকে তাকাল রানা। ম্লান চেহারা, নির্লিপ্ত, ক্লান্তও বটে, তবে ক্লান্তির সঙ্গে নতুন যোগ হয়েছে উত্তেজনা। ইস্পাতের দরজা বন্ধ হওয়াটাই কারণ

ওরা এখন ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এখানে কোন বালির বস্তা নেই যে লুকানো যাবে। গা ঢাকা দেয়ার মত কোন ছায়াও নেই। পাঁচশো শত্রুসেনার চোখকে ধুলো দেয়ার জন্যে একমাত্র সম্বল ইউনিফর্ম আর ইনসিগনিয়া। রানা শুধু একা নয়, শামিম আর হাসানও এই মুহূর্তে নিজেদেরকে খুদে ও দুর্বল রক্ত মাংসের মেশিন বলে ভাবছে। সঙ্গে অস্ত্র আছে, কিন্তু পাঁচশো সৈন্যের বিরুদ্ধে তা কি কাজেই বা লাগবে? ওই অস্ত্র আর খালি হাত দিয়ে ইস্পাতের তৈরি তিনটে প্রকাণ্ড মেশিন ধ্বংস করতে হবে ওদেরকে। অনুভূতিটা ভীতিকর, নিজেদের নগ্ন ও অসহায় লাগছে, যেন একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর ঘটছে সবকিছু ।

কিন্তু এ নির্জলা বাস্তব। নিজেদেরকে এই বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। রানা ভাবছে, এই সিঁড়ির নিচে টুলস আছে, সেগুলো দিয়ে ওদেরকে কাজ সারতে হবে। হাসানকে পৌঁছে দিতে হবে বিস্ফোরকের কাছে। হাসানের ওপর আস্থা রাখা যায়, বিস্ফোরক পেলে খালি হাতেই পাঁচশো সৈন্যকে পরপারে পাঠিয়ে দিতে পারে সে। নিজেকে অভয় দিল রানা, সব ভালভাবেই সমাধা করা যাবে

প্যাঁচানো সিঁড়ি একটা টানেলে নেমে এসেছে, পাহাড়ের নিচে একটা গহ্বরে। সেলগুলো নাহয় হয়েস্ট-এর সাহায্যে বহন করা সম্ভব, কিন্তু মিসাইল আর টর্পেডো? ওগুলো আকারে বড়, ওজনও খুব বেশি, স্থানান্তর করতে হয় লম্বালম্বিভাবে, খাড়া করে সম্ভব নয়। ম্যাগাজিনের মেঝে সাবমেরিন ভেড়ার প্ল্যাটফর্মের মেঝের সঙ্গে একই লেভেলে থাকতে হবে।

সিঁড়ির গোড়ায় একটা ফ্ল্যাশপ্রুফ দরজা। ধাক্কা দিয়ে সেটা খুলল হাসান। ম্যাগাজিনে ঢুকল ওরা। ছাই রঙের বিশাল এক কংক্রিট কমপার্টমেন্টে, ওদের সামনে থেকে বহু দূর বিস্তৃত, সাদা বাল্কহেড লাইটের আলোয় দিনের মত আলোকিত হয়ে আছে। শেল রাখা হয়েছে কন্টেইনারে চাকা লাগানো বিশাল আকৃতির ট্রলির জন্যে একটা জায়গা আলাদা করা, এগুলোতে করেই ডকে নিয়ে যাওয়া হয় মিসাইল ও টর্পেডো, সাবমেরিনে তোলার জন্যে

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা। তিনটে পঁয়তাল্লিশ ও আল্লাহ!

তিনজনই ওরা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে, চারদিকে চোখ বুলানো শেষ করে ম্যাগাজিন-এর সেন্ট্রাল আইল-এর দিকে তাকাল। ওখানেই সাবমেরিন ধ্বংস করার উপকরণগুলো থাকার কথা! কিন্তু সমস্যা হলো শেল রাখার কন্টেইনার আর টর্পেডো ও মিসাইল রাখার ট্রলিগুলো, সব মিলিয়ে পাঁচশোর কম নয়, একদম খালি

পড়ে আছে। কয়েকজন লোক একটা ইলেকট্রিক মোটর খুলতে ব্যস্ত। ওই লোকগুলো ছাড়া ম্যাগাজিন ফাঁকা। ওখানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছে ওরা। এতদূর এসেও মিশন ব্যর্থ হতে চলেছে। টুলস না থাকায় কাজটায় ওরা হাতই দিতে পারবে না।

এক মিনিট পর ম্যাগাজিনের মেঝে ধরে হাঁটতে শুরু করল রানা। একটা রেইলিং-এর দিকে যাচ্ছে, এই রেইলিং হয়েই মিসাইল ও টর্পেডোগুলো ডকের দিকে যায়।

হেলাল জাললু ডকইয়ার্ডের দেয়াল ঘেঁষে নোঙর ফেলা কয়েকটা মাছ ধরার নৌকার পিছনে ঢেউয়ের দোলায় দুলছে আর্লবিদা। ডকইয়ার্ডের পিছনে পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘরের মাঝখান থেকে কয়েকটা কুকুর বৃষ্টির মধ্যে সারাক্ষণ ঘেউ ঘেউ করছে। লায়লাকে নিয়ে বোটের নিচে রয়েছে নাসের ভেঙে ক্ষতবিক্ষত হবার পর হুইলহাউসের যে-টুকু অবশিষ্ট আছে, তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে শাফি, দু'আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট তার পাশে রেডিওটা জ্যান্ত, কিন্তু কোন সঙ্কেত আসছে না। তবে সে কোন সঙ্কেত আশাও করছে না।

হারবারের কালো পানির উল্টোদিকে দায়ান দায়ান। বেশ কিছুক্ষণ আগে ফিশ ফ্যাক্টরি থেকে অ্যাঙ্গেল-গ্রাইন্ডার আর ওয়েল্ডার-এর আলো ঝলসাতে দেখেছে সে, এখন আর দেখা যাচ্ছে না। পরিবেশ-পরিস্থিতি বলছে, ওখানকার সব কাজ প্রায় শেষ। মাঝে মধ্যে ওপর দিকের আকাশে সচল ক্রেনের মাথা আলোকিত হয়ে উঠছে সব কিছু লোড করা হচ্ছে। আর বেশি সময় নেই হাতে, ভাবল শাফি।

হারবারেও তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। লঞ্চ আর লাইটার-এর যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে আসছে। পাঁচ হাজার টনী একজোড়া জাহাজ ডকইয়ার্ড থেকে আধ মাইল দূরে খোলা সাগরে অপেক্ষা করছে, সেদিকেই যাচ্ছে ওগুলো। দুর্গে ওদের কাজ শেষ হতে চলেছে, তাই ফিরে যাচ্ছে সবাই, ভাবল শাফি। কেউ জানে না গোটা ব্যাপারটা কিভাবে শেষ হবে।

'তুমি বড় ধীর,' বলল রানা। 'সময়ের মূল্য দিতে শেখোনি।'

ম্যাগাজিন স্টোর খালি করার দায়িত্বে রয়েছে লেফটেন্যান্ট। রাগে ও অপমানে মুখ গরম হয়ে উঠল তার। কিন্তু সে জানে একজন জেনারেলের কথায় রাগ করলে নিজের বিপদ ডেকে আনা হবে। 'ইয়েস, স্যার, জেনারেল!'

'এখন আমি ম্যাগাজিন ইন্সপেক্ট করতে চাই,' বলল রানা।

'জ্বী? জেনারেল?'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'তুমি হিব্রু জানো না?'

'ইয়েস, জেনারেল!' লেফটেন্যান্ট হতভম্ব। এটা কি ইন্সপেকশনের সময়? তাতে কি কাজ দ্রুত সারা যাবে? কিন্তু জেনারেল জেনারেলই, তাঁর কথার অবাধ্য হওয়া চলে না। 'এই যে, স্যার, শেলগুলো এখানে ছিল। সব পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, আপনার নির্দেশে। আর এখানে ছিল মিসাইল ও টর্পেডো। ওগুলোও চলে গেছে।' হাত তুলে ডকইয়ার্ডের দিকে যাবার টানেলটা দেখাল, হেঁটে চলে এল খালি

র‍্যাকগুলোর পাশে। মেঝেতে বাদামী রঙের বাক্সের একটা স্তূপ। 'এখানে ছিল স্মল আর্মস। মাত্র অল্প কিছু রয়ে গেছে। গ্রেনেড, মর্টার বম্ব। ডকইয়ার্ডে বার্জটা ফিরে এলেই শেষ কনসাইনমেন্ট রওনা হয়ে যাবে।'

'তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছ,' কর্কশ গলার প্রশংসা ব্যঙ্গাত্মক শোনাল, চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে রানা ডাকল, 'শামিম?'

ওই ডাকটাই নির্দেশ। লেফটেন্যান্টের মাথায় মেশিন পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে ধাম করে একটা বাড়ি মারল শামিম।

লোকটা পড়ে যেতে রানা বলল, 'লুকিয়ে ফেলো ওকে। হাসান, গ্রেনেডের বাক্স।'

একটার ওপর আরেকটা বাক্স রাখল হাসান, প্রতিটি বাক্সে দশটা করে গ্রেনেড, দু'পাশে ধরার জন্যে রশি আছে।

টানেলের দিকে এগোল রানা। 'চলো দেখি ডকইয়ার্ড বা প্ল্যাটফর্মে কি ঘটছে।'

নয়

টানেলটা পঞ্চাশ গজ লম্বা, আলোয় ভেসে যাচ্ছে। দু'পাশে রেললাইন, এই রেললাইন ধরেই ট্রলিগুলো টর্পেডো আর মিসাইল নিয়ে যায়। টানেল ধরে অনেক লোক আসা-যাওয়া করছে, সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত। রানার ইউনিফর্মে চোখ পড়ামাত্র দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছে তারা। জনপ্রিয় ব্যক্তি, ভাবল হাসান।

বিশ গজ এগিয়েছে ওরা, পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হল্ট!'

রানার হৃৎপিণ্ড ডাঙায় তোলা কৈ মাছের মত লাফ দিল। ডান হাতটা টিউনিকের ভেতর ভরল ও। শামিমের হাত এত সাবধানে নড়ল, ওটা যেন একজন পকেটমারের হাত, মেশিন পিস্তলের গ্রিপে পেঁচিয়ে গেল একটা আঙুল। বাক্সের রশি ধরা হাসানের হাতের তালু ঘামতে শুরু করল। আধপাক ঘোরার সময় পায়ে ব্যথা পেল রানা। 'কি?'

ইউনিফর্ম আছে, কিন্তু ব্যাজ নেই, চশমা পরা খাটো এক লোক, হাতে একটা খাতা। জেনারেলের ইউনিফর্ম সে গ্রাহ্য করছে না। 'রিকুইজিট ফর্ম পূরণ করাটা জরুরী, স্যার,' বলল সে। 'ম্যাগাজিন থেকে কিছু নিয়ে যেতে হলে সেটাই নিয়ম।'

'তুমি ইনভেনটরি ক্লার্ক?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইয়েস, জেনারেল।'

'ঠিক আছে, কর্পোরাল,' বলল রানা 'খাতাটা দাও, আমি সই করছি।'

মাথা নাড়ল ক্লার্ক। 'শুধু সই করলে হবে না, স্যার। গ্যারিসন ডিউটি অফিসারের সই করা রিকুইজিশন ফর্ম থাকতে হবে আপনার কাছে।'

রানার গলার আওয়াজ ভাঙা কাঁচের ঘষা খাওয়ার মত শোনাল 'তুমি জানো আমি কে?'

রানার ইউনিফর্মের ওপর চোখ বুলাল ক্লার্ক। 'ইয়েস, স্যার। আপনি গ্যারিসন কমান্ডার, স্যার।'

'আর রিকুইজিশন ফর্ম কে সই করে?'

'ডিউটি অফিসার, স্যার।'

'কার নির্দেশে?'

'আপনার নির্দেশে, স্যার।'

'তো?'

ক্লার্ক বলল, 'আমার ওপর নির্দেশ আছে, স্যার। ডিউটি অফিসারকে অবশ্যই রিকুইজিশন ফর্ম সই করতে হবে।'

সময় দেখল রানা। চারটে পাঁচ। আর পঞ্চান্ন মিনিট পর সাবমেরিনগুলো রওনা হয়ে যাবে। 'ঠিক আছে, কর্পোরাল। ডিউটি অফিসার ডকইয়ার্ডে, চলো তার কাছেই যাই।'

'কিন্তু, স্যার...'

'অর্ডার!' চাপা গলায় গর্জে উঠল রানা। ক্লার্ক সঙ্গে থাকলে সুবিধেই হবে, ভাবছে ও, ওদের ওপর থেকে সন্দেহের মাত্রা খানিকটা হলেও কমবে। 'পথ দেখাও!'

পথ দেখাল ক্লার্ক। টানেলের মুখ পাঁচিল তুলে দু'ভাগ করা। একদিকে চলে গেছে রেলপথ, আরেক দিকে একটা গেট, ভেতরে লোকজন চলাচলের রাস্তা। গেটের পাশে চওড়া একটা সেন্ট্রি বক্স। ভেতরে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর ইউনিফর্ম পরা গার্ড বসে আছে।

আড়চোখে রানা দেখল, মেশিন পিস্তলের গ্রিপ থেকে আঙুলটা এখনও সরায়নি শামিম। ভাবল, ওর সঙ্গেও একটা মেশিন পিস্তল থাকলে ভাল হত। কিন্তু আছে শুধু একটা ল্যুগার, আর ইনসিগনিয়া ও পদক সহ জেনারেলের ইউনিফর্ম। এতেই অবশ্য কাজ চলে যাচ্ছে—এখন পর্যন্ত। তবে, ক্যাপ-এর নিচে মুখটা আসল নয়।

ক্যাপটা চোখের ওপর আরও একটু নামিয়ে আনল রানা।

সেন্ট্রি বক্সে বসা লোক দু'জনের ইউনিফর্মের ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে, বেল্টে দাগ পড়েছে, জুতোয় তুষারের মত লবণ জমে আছে। দু'জোড়া চোখ তীক্ষ্ণ, অস্থির। জেনারেলের ইউনিফর্ম দেখে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হলো তাদের। চেয়ার ছেড়ে দ্রুত দাঁড়াল, স্যালুট করল কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে, চেহারায় ফুটে উঠল গর্ব।

স্যালুটের জবাবে ক্যাপ স্পর্শ করল রানা, পরমুহূর্তে ওদের দিকে পিছন ফিরে গেটের দিকে ফিরল। 'খোলো!'

গেট খুলে দিল একজন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স গার্ড। স্যালুট করল আবার। রানার পিছু নিয়ে শামিম আর হাসান গেট পেরুল, ওদের সবার সামনে রয়েছে ম্যাগাজিন ক্লার্ক। লোকটা এই মুহূর্তে খুশি, কারণ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার এই সুযোগ সব সময় পাওয়া যায় না। গুরুত্বপূর্ণ অফিশিয়াল একটা কাজে সে-ও অংশগ্রহণ করছে। মনে মনে লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা। ম্যাগাজিন ক্লার্ক সার্টিফিকেট হিসেবে ভূমিকা রাখছে। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর গার্ড দু'জন তাকে চেনে।

গেট পেরুতে যাচ্ছে ওরা। ডান হাতটা ইউনিফর্মের ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছে রানা, মাথা নত, যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। মেরুদণ্ড বেয়ে ঘামের ধারা নামছে, অনুভব করছে ও।

'জেনারেল!' গার্ডরুম থেকে ভেসে এল আওয়াজটা। শব্দটা বিস্ময়সূচক প্রশংসা, নাকি হতবিহ্বল হয়ে ডেকে ওঠা, বোঝা গেল না।

শুনেও না শোনার ভান করে আরও এক পা এগোল রানা।

'স্যার, জেনারেল, প্লীজ থামুন,' এবার স্পষ্ট, দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

'শান্ত থাকো,' ইংরেজিতে ফিসফিস করল রানা। তারপর জেনারেলের বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাও?'

'জেনারেল যদি দয়া করে তাঁর পাস দেখান, প্লীজ।'

মৃদু, বিরক্তিসূচক আওয়াজ করল রানা। 'ক্লার্ক,' বলল। 'ওদেরকে তোমার পাস দেখাওনি?'

চশমার ভেতর চকচক করছে ক্লার্কের চোখ, পকেট হাতড়াতে শুরু করল।

'জলদি!' ধমক দিল রানা। 'সময় নষ্ট হচ্ছে।'

মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স গার্ড ক্লার্কের পাসে একবার চোখ বুলিয়েই ফেরত দিল। 'এবার, স্যার, জেনারেল, আপনার পাস।'

অনুভূতিটা আরামপ্রদ নয়, রানার তলপেট যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। লোকটার কথায় ঠাণ্ডা ক্ষুরের ধার।

সকৌতুক ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে গ্রেনেডের বাক্সগুলো মেঝেতে নামাল হাসান, মেশিন পিস্তলের গ্রিপ ধরা হাত ঘামে ভেজা। অস্ত্রটা ঘোরাল অন্যমনস্কতার ভান করে, তাক করল যে গার্ড কথা বলছে না তার দিকে। প্রথম গার্ড, যে কথা বলছে, তার চেহারা অদ্ভুত দেখাচ্ছে—বিহ্বল তো বটেই, কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠে দুঃসাহসী হয়ে ওঠার চেষ্টাও আছে। কি ঘটছে, বুঝতে পারল হাসান। প্রথম গার্ড জেনারেলকে নিশ্চয়ই ভালভাবে চেনে। ইউনিফর্ম দেখে অচেনা লোককেই চেনা বলে ধরে নিয়েছিল। সন্দেহ হওয়ায় ডেস্কের পিছনে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে।

মারাত্মক কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

প্রথম গার্ড নিচের ঠোঁট চুষল। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, জেনারেল, আপনার নাম?' ডেস্ক লেভেলের নিচে নেমে গেছে তার ডান হাত। ওখানে নিশ্চয়ই একটা অ্যালার্ম বাটন আছে।

মেশিন পিস্তলের সিলেক্টর সিঙ্গেল শট-এ সরাল হাসান, ট্রিগারে শক্ত করল আঙুল। লক্ষ করল, শামিম কাঁধে ঝোলানো মেশিন পিস্তল থেকে হাত সরিয়ে রেখেছে।

হাত দুটো সামান্য উঁচু করে দু'দিকে মেলে দিল শামিম। 'ফর গড'স সেক, তোমরা জানো না কার সঙ্গে কথা বলছ?'

এম.পি. সেন্ট্রি জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলল। তবে কোন আওয়াজ বেরুল না। কারণ দু'দিকে হাত মেলে দেয়ার ভঙ্গি করে শামিম আসলে হামলা চালিয়েছে। প্রথম গার্ডের মুখে লাগল ডান হাতের ঘুসি, নাকের ঠিক নিচে, ভাঙা হাড় সরাসরি মগজে সেঁধিয়ে গেল। অপর তালুতে ছিল খুদে ছুরিটা, সেটা ছুটে গিয়ে বিঁধে গেছে

দ্বিতীয় গার্ডের বুকে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলল সেটা শামিম. তারপর আবার গাঁথল। একজোড়া হেলমেট কংক্রিটের মেঝেতে ধাতব শব্দ তুলল।

তারপর দীর্ঘ নিস্তব্ধতা, সম্ভবত এক সেকেন্ড স্থায়ী হলো। পরক্ষণে কি যেন পাশ কাটাল হাসানকে। চশমা পরা লোকটা, ক্লার্ক। একটা পা বাড়াল হাসান। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। কংক্রিট মেঝেতে ঘষা খেয়ে দূরে সরে গেল চশমা। হাসানের দিকে মুখ তুলল সে, কিন্তু সবই ঝাপসা দেখছে। ফিসফিস করল, 'প্লীজ!'

ক্লার্কের দিকে তাকাল রানা। লোকটা এম.পি. নয়, এমনকি যোদ্ধাও নয়–গোবেচারা কেরানী মাত্র।

কিন্তু এই লোক ওদের মিশন ব্যর্থ করে দিতে পারে

মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল রানা।

থ্যাচ্ করে একটা শব্দ হলো। আবার যখন চোখ ফেরাল রানা, স্থির হয়ে গেছে ক্লার্ক, মাথার একপাশ মেঝের সঙ্গে লেগে আছে, তবে নিঃশ্বাস ফেলছে।

মেশিন পিস্তলের ব্যারেলের দিকে তাকাল শামিম। 'ভয় হচ্ছিল, এটা না বেঁকে যায়।'

দু'জন গার্ড আর ক্লার্ককে সেন্ট্রি বক্সের একপাশে ফেলা ডেস্কের পিছনে টেনে আনল ওরা। ক্লার্ক তখনও নিঃশ্বাস ফেলছে। ওখান থেকে বেরিয়ে লোডিং প্ল্যাটফর্মে চলে এল ওরা

মোবারক তার কিচেন টেবিলে বসে চার্টের পাশে একটা ম্যাপ এঁকেছিল, সেই ম্যাপে চিহ্নিত উপকূল রেখায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। বিশাল প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করা হয়েছে গ্র্যানিট ভেঙে। প্ল্যাটফর্ম আসলে একটা নয়, চারটে। কোনটা ডকিং ফ্যাসিলিটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, কোনটা লোড করার কাজে। ম্যাগাজিনে প্রবেশ করার পথটা তৈরি করা হয়েছে শেষ প্রান্তের প্ল্যাটফর্মে, নিচু একটা পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে। বাকি তিনটেও একই সমান্তরাল রেখায় তৈরি। পাকা চাতালের ওপর রেললাইন আছে। এক সময় এই রেলপথ মাছ পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হত। এই মুহূর্তে কোন প্ল্যাটফর্মেই মাছ ধরার কোন ট্রলার বা বোট নেই। তার বদলে কয়েক সারি ক্রেনের নিচে লম্বা, চকচকে ও পিচ্ছিল দর্শন তিনটে সাবমেরিনের কনিং টাওয়ার দেখা যাচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের এখানে সেখানে বৃষ্টির পানি জমেছে। মুখে সিগারেট নিয়ে সেই পানির ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে তিনজন লোক। পরনে ঢোলা ওভারঅল, চেহারায় উদ্বেগ বা সতর্কতার ছিটেফোঁটাও নেই। রানা বা ওর সঙ্গী গার্ডদের দিকে ভাল করে তাকালও না। তাদের কাজ শেষ, যে যার ডেরায় ফিরে যাচ্ছে।

সবচেয়ে কাছের সাবমেরিনে একদল লোক কাজ করছে। কয়েকটা বাক্সে সম্ভবত অক্সি-অ্যাসেটিলিন ওয়েল্ডিং গিয়ার ভরা হচ্ছে। ক্রেনগুলো সচল, রসদ ভরার কাজ এখনও শেষ হয়নি। সবুজ শাক-সব্জি ভরা ট্রে আর দুধের ক্যান দেখতে পেল রানা।

নীল ওভারঅল পরা আরও কিছু লোক প্ল্যাটফর্ম ধরে এগোচ্ছে। ওদিকে একটা বিল্ডিং রয়েছে, বিল্ডিঙের নিচে টানেল, ভেতর থেকে তেলে ভাজা পিঁয়াজের গন্ধ ভেসে আসছে ওটা ক্যানটিন, বোঝা গেল। হাতে টুলবক্স নিয়ে ক্যানটিনে যাচ্ছে

ডক-কর্মীরা। ওখানে তারা খাওয়াদাওয়া সারবে, নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র বুঝে নেবে। হারবারের দূর প্রান্ত থেকে ভোরের বাতাসে ভর করে ভেসে আসছে লঞ্চ এঞ্জিনের আওয়াজ। ডকইয়ার্ড কর্মীদের পৌঁছে দিচ্ছে খোলা সাগরে নোঙর ফেলা জাহাজে। দুটো জাহাজ, দুটোর মাস্তুলেই পতপত করে পতাকা উড়ছে।

আরও দু'জন ডক-কর্মী ওদেরকে পাশ কাটাল। সচেতনভাবেই ওদের চোখের দিকে তারা তাকাল না। দু'জনের একজন প্রকাণ্ডদেহী, প্রায় শামিমের মতই। এরকম একটা সুযোগ পাবার অপেক্ষাতেই ছিল রানা 'এই যে, তোমরা!'

স্কুল পালানো কিশোরদের মত অপরাধী লাগল লোক দু'জনকে। একজন তাড়াতাড়ি হাতের সিগারেট ফেলে দিল, বুটের নিচে পিষে আগুন নেভাল। বিশালদেহী লোকটা সিগারেট ফেলেনি। তবে সেটা এখনও ধরায়নি সে।

'ভয় পাবার কোন কারণ নেই। তোমরা কোন অপরাধ করোনি,' বলল রানা।

লোক দু'জন একদম নড়ছে না। কথাও বলছে না।

'ইচ্ছে হলে সিগারেট খেতে পারো,' বলল রানা ওদের দিকে আরও একজন লোক হেঁটে আসছে, একা। বাম হাতে জেনারেলের লাইটার বের করে দীর্ঘদেহীর সিগারেটটা ধরিয়ে দিল ও। 'ছোট্ট একটা কাজ আছে,' বলল। 'এই, তুমি!'

নিঃসঙ্গ লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। ম্যাগাজিন টানেলের দিকে হাত তুলল রানা। 'ওদিকে চলো।' ঘুরে টানেলে ঢুকে পড়ল ও।

বাইরে ভোরের ম্লান আলো ফুটছে, টানেলের ভেতর বয়ে যাচ্ছে আলোর বন্যা। রাত জাগা ডক-কর্মীদের চোখ লাল ও ঢুলু ঢুলু, ক্লান্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে, হাই তুলছে একটু পরপরই। পেটে কিছু দিয়ে জাহাজে উঠতে চায় তারা, তারপর একটানা লম্বা ঘুম দেবে। দীর্ঘদেহী নড়ল না, জানতে চাইল, 'কি? কেন?'

'আগে এখানে এসো তো,' জেনারেলের কর্কশ গলা।

সবাই টানেলে ঢুকছে দেখে দীর্ঘদেহী লোকটাও ঢুকল এবার। দেয়ালে ইস্পাতের কয়েকটা দরজা, ভেতর থেকে তাজা রক্তের গন্ধ ভেসে আসছে। একটা দরজা দেখিয়ে রানা বলল, 'এখানে এসো।'

ঘুরে রানার দিকে তাকাল দীর্ঘদেহী। 'কেন?' প্রশ্ন করার পর ব্যাপারটা লক্ষ করল সে। একজন বডিগার্ড তার দুই চোখের মাঝখানে মেশিন পিস্তল তাক করে আছে। কথা না বাড়িয়ে সামনে এগোল লোকটা। তার পিছু নিয়ে বাকি দু'জনও।

'ওভারঅল খুলে ফেলো,' বলল রানা।

'প্রয়োজন থাকলে নিজে খুলে নিন,' দৈত্যাকার লোকটা বলল। সে ক্লান্ত, কিন্তু চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র নেই।

রানা কিছু বলতে যাবে, হঠাৎ হাত চালাল লোকটা। ইচ্ছে ছিল রানার বুকে দুই হাতের ধাক্কা মারবে, তারপর বেরিয়ে যাবে টানেল থেকে। কিন্তু হাত দুটো রানার নাগালই পেল না, তার আগে সে নিজেই আক্রান্ত হলো। আঘাতটা কোত্থেকে এল, টেরই পায়নি। শুধু অনুভব করল কেউ তার মাথায় কামান দেগেছে।

কাজটা শামিমের লোকটার মাথায় মেশিন পিস্তলের বাড়ি মেরেছে।

বাকি দু'জন লোক হাঁ করে তাকিয়ে থাকল–লোকটার নিঃসাড় শরীর থেকে ওভারঅল খুলে ফেলল শামিম, মেঝেতে ছড়িয়ে পড়া টুলগুলো বাক্সে ভরে রাখল।

'কাপড় খোলো,' বলল রানা।

লোক দু'জন তাড়াতাড়ি হাত চালাল।

'দরজা,' বলল রানা।

দরজার সামনে চলে এল রানা। বাইরে থেকে বন্ধ ওটা, ল্যাচ দিয়ে। ভেতরে একটা লকার পাওয়া গেল, রঙের কৌটা সাজানো, দশ ফুট লম্বা।

'ঢোকো,' বলল রানা

একজন জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু পরে আমরা বেরুব কিভাবে?' আতঙ্কে নীল হয়ে আছে চেহারা।

জবাব না দিয়ে রানা প্রশ্ন করল, 'সাবমেরিনে তোমরা ওঠো কিভাবে?'

'আমাদের সঙ্গে পাস আছে।'

'দেখাও।'

ভাঁজপড়া একটা কার্ড বের করল লোকটা, তেলের দাগ লাগা।

'আর কিছু?'

'না। আপনারা...এ-সবের মানে কি?'

লোকটার নাকের সামনে চোখ সরিয়ে এনে হিসহিস করে বলল রানা, 'মানেটা শুধু আমি জানি। অজ্ঞ থাকাই তোমাদের জন্যে মঙ্গল। আমরা সাবমেরিনে উঠব। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চাই। আমরা যদি ধরা পড়ি, তোমাদের সম্পর্কে একটা কথাও কাউকে বলব না—আর মনে রেখো, এই দরজা সাউন্ডপ্রূফ। অর্থাৎ একটাই কাজ করার আছে তোমাদের, যদি বাঁচতে চাও।'

বিরতি নিল রানা, দরদর করে ঘামছে। শামিম আর হাসান ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। রানার মত তারাও জানে খুব বেশি হলে আর আধ ঘণ্টার মত সময় আছে। 'তোমরা যদি সত্যি কথা বলো, ভয় পাবার কোন কারণই নেই। আর যদি সত্যি কথা না বলো, এই লকারই হবে তোমাদের কবর।'

লোকটা ঢোক গিলে বলল, 'তাহলে...সত্যি কথাই বলি...একটা শব্দ আছে।'

'বাহ্, এই তো!' অভয় দিয়ে হাসল রানা।

'বেনিন,' গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না, ফিসফিস করল লোকটা। 'গ্যাঙওয়ে সেন্ট্রিকে এই কোডওয়ার্ড বেনিন না বললে...'

'বুঝেছি। কিন্তু তোমার এই কথা যদি মিথ্যে হয়, এই আন্ডারপ্যান্ট পরেই মারা যেতে হবে।'

'স্যার, আমি সত্যি কথা বলছি।'

'তোমার ওভারঅল, বলল রানা লোকটার জুতোর দিকে তাকাল। 'ওটার সাইজ বলো।'

'বিয়াল্লিশ।'

'ওগুলোও আমার দরকার।'

পাঁচ মিনিট পর তিনজন ডক-কর্মীকে প্ল্যাটফর্ম ধরে ফেরীর দিকে হাঁটতে দেখা গেল, হাতে নীল এনামেল করা টুলবক্স, মুখে সিগারেট। ফেরী ওদেরকে জাহাজে তুলে দেবে, জাহাজ হাইফা হয়ে তেল আবিবে ফিরে যাবে, অর্থাৎ দায়ান হারবারে

বিশেষ একটা কাজ সেরে নিজেদের স্থায়ী কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছে ওরা। বিশেষ দায়িত্ব পালন করায় এক হপ্তা ছুটি পাওনা হয়েছে ওদের, কাজেই আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠার কথা ওদের। কিন্তু তা না, তিনজনকেই বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের বেশ অনেকদূর পর্যন্ত মাথার ওপর ছাদ আছে, ছাদের বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। মুখ তুলে আকাশ দেখল রানা। বাতাসের ঝাঁটা খেয়ে সমস্ত মেঘ বিদায় নিয়েছে, আকাশের রঙ পাখির ডিমের মত নীলচে। চারদিকে প্রচুর লোকজন আর ব্যস্ততা, তাসত্ত্বেও নতুন ভোর ভারি সুন্দর লাগল ওর চোখে। সাবমেরিন, ক্রেন, লোকজন ইত্যাদির ওপর চোখ বুলিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ও। কোন কারণ নেই, বিনা প্ররোচনায়, যুদ্ধ বাধিয়ে হাজার হাজার কিংবা হয়তো লাখ লাখ মানুষকে খুন করার আয়োজন চলছে এখানে।

আজকের এই সুন্দর সকালটা হয়তো রক্তাক্ত হতে যাচ্ছে। তবে তার প্রয়োজন আছে। শামিম আর হাসানের দিকে তাকাল রানা। দু'জনের চেহারাই গম্ভীর, চোখে প্রত্যয়ের ছাপ। তারাও ওর মত একটা অন্যায় কাজকে ঠেকাবার জন্যে প্রয়োজনে আত্মত্যাগ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

শান্ত গলায় শামিমকে রানা বলল, 'আলবিদাকে দরকার হবে আমাদের।'

'সে-ব্যবস্থা আমার ওপর ছেড়ে দাও, মাসুদ ভাই,' জবাব দিল শামিম।

গ্র্যানিট-এর প্রথম আঙুলটার দিকে তাকাল রানা, প্ল্যাটফর্ম থেকে হারবারের দিকে বিস্তৃত, দু'পাশে নিস্তরঙ্গ পানি। পানির দুই দুই গলিতে সাবমেরিনের বেলুন আকৃতির প্রেশার হাল আর সরু স্টীল ডেক দেখা যাচ্ছে। ওদিকে গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক দুটো, একটা বাম দিকে চলে গেছে, আরেকটা ডান দিকে। সাবমেরিন দুটোয় পৌঁছানোর এটাই একমাত্র পথ। প্রতিটি গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের গোড়ায় একজন করে নাবিক দাঁড়িয়ে আছে, কাঁধে রাইফেল, ক্যাপের রিবন ঘাড়ের কাছে ভোরের বাতাসে দোল খাচ্ছে।

গ্রেনেড নিয়ে এই বাধা টপকাতে হবে। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা।

'প্যারোক্সাইড,' বলল হাসান, বাতাস শুঁকছে।

'সরি?'

'হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড। সাবধান, গায়ে যেন না লাগে। জিনিসটা ক্ষার, লোহা পর্যন্ত খেয়ে ফেলে।'

'মনে হচ্ছে তোমার কোন সুপারিশ আছে,' চাপা কণ্ঠে বলল রানা।

'আছে,' বলে রহস্যটা ব্যাখ্যা করল হাসান।

'অদ্ভুত।' বড় করে শ্বাস নিল রানা। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে জানাল, 'আমি ডান দিকে যাচ্ছি, তুমি বাম দিকে যাও।'

শামিম বলল, 'গুড লাক।'

মাথা ঝাঁকাল রানা ভাগ্য বলে একটা কিছু তো অবশ্যই আছে, তবে সেটা ওদের চেয়ে শামিমেরই বেশি দরকার। টুলবক্স ভর্তি গ্রেনেড নিয়ে সাবমেরিনে চড়তে হবে ওদেরকে, কিন্তু শামিমের কাজটা আরও বেশি বিপজ্জনক।

ওরা যে গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এসেছে, কোনভাবেই তা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এড়িয়ে যাবার কোন ইচ্ছাও ওদের কারও মনে জাগেনি মৃত্যুকে ওরা থোড়াই গ্রাহ্য করছে পরপারে যেতে হয় যাবে, কিভাবে যাবে সেটার কোন গুরুত্ব

নেই।

রানা মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করছে না। পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবছে।

ভিড়ের সঙ্গে মিশে ফেরীর দিকে রওনা হয়ে গেছে শামিম। প্ল্যাটফর্ম ধরে সেন্ট্রিদের দিকে এগোল রানা ও হাসান। হাসান হাত দুটো পকেটে ভরে রেখেছে, ঠোঁট সরু করে শিস দিচ্ছে।

ছোকরার প্রশংসা করতে হয়, ভাবল রানা। উদ্বিগ্ন হয়ে লাভ কি!

হাসান ভাবছে হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড-এর কথা। প্রথমত বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল সে, তার ওপর দীর্ঘদিন বিস্ফোরক নিয়ে পড়াশোনা ও কাজ করেছে, সেই সূত্রে জানে হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইডের ক্যাটালিস্ট হলো ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড। ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড অক্সিজেন থেকে হাইড্রোজেনকে আলাদা করলে যে বিস্ফোরণ ঘটবে, তার তুলনায় গ্রেনেড বিস্ফোরণের আওয়াজটাকে মনে হবে কেউ আঙুল মটকাল।

কাজেই ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড দরকার তার। কিন্তু সমস্যা হলো, এই জিনিস এখানে-সেখানে ফেলে রাখে না কেউ।

গ্যাংওয়ের নিচে নেমে এসেছে সে। সেন্ট্রির দিকে তাকিয়ে ঠোঁট মোড়া হাসি উপহার দিল, পকেট থেকে বের করে বাড়িয়ে দিল পাসটা। 'বেনিন,' সহজ সুরে বলল, টুলবক্সটা ঝাঁকিয়ে। 'ল্যাভাটারিতে সমস্যা মাত্র দু'মিনিটের কাজ।'

সেন্ট্রি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'তাহলে তো ভাই তোমাকে ধন্যবাদ দিতে হয়

গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক ধরে উঠে যাচ্ছে হাসান।

ভিড় ঠেলে প্ল্যাটফর্মের ঠোঁটে এসে থামল শামিম। মানুষ লাইন দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু শৃঙ্খলার বড় অভাব। প্ল্যাটফর্মের নিচে নেমে গেছে চারটে লোহার সিঁড়ি, প্রতিটি সিঁড়ির নিচে একটা করে লঞ্চ। প্রতিটি সিঁড়ির মাথায় হাতে ক্লিপবোর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর একজন করে অফিসার লাইনের প্রথম লোকটা তার সামনে পৌঁছুলে প্রথমে সে আইডেনটিটি কার্ড পরীক্ষা করছে, কার্ডের ফটোর সঙ্গে খুঁটিয়ে মেলাচ্ছে লোকটার চেহারা, তারপর তালিকা থেকে খুঁজে বের করছে তার নাম সব কিছু ঠিকঠাক মিলে গেলে লোকটাকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে দিচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের গা থেকে রওনা হয়ে সরাসরি জাহাজ দুটোর দিকে ছুটছে লঞ্চগুলো, সে-দুটো হারবারে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করছে। ওগুলো আসলে ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীর ভাড়া করা জাহাজ, প্রতিটি ডেকে বালির বস্তা দিয়ে আড়াল তৈরি করা হয়েছে, প্রতিটি আড়াল থেকে বেরিয়ে আছে মেশিন গানের ব্যারেল।

সাবধানতা অবলম্বনে কোন ত্রুটি রাখা হয়নি।

শামিমের ওভারঅল আর আইডেনটিটি কার্ড-এর মালিক বেন দাহু। ফটোয় যতই তেলের দাগ লাগুক, দাহু আর শামিমের শারীরিক গঠন প্রায় একই রকম হলেও, লালচে চুল আর নীল চোখ ঝাপসা হয়নি। তাছাড়া, তেলআবিবগামী কোন জাহাজে ওঠার ইচ্ছেও শামিমের নেই।

ভিড়ের মধ্যে ঘুরল শামিম, বিড়বিড় করে নিজেকে গাল-মন্দ করছে লোকজনকে ঠেলে ফিরে আসছে সে, ভাবটা যেন ভুলে কিছু ফেলে আসায় আনতে

যাচ্ছে সেটা।

লাইনের গোড়ায় ফিরে এসেছে শামিম, এই সময় একটা সাবমেরিনের ডিজেল এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল, বোঝা গেল এগজস্ট থেকে কালো মেঘের মত ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে দেখে। রাহাত খান ব্রিফিং করার সময়ই আভাস দিয়েছিলেন, ইসরায়েলিরা সৌদি আরব আর কুয়েতে মিসাইল ছোঁড়ার জন্যে যে সাবমেরিন ব্যবহার করবে সেগুলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার হবারই বেশি সম্ভাবনা বিসিআই-এর কাছে রিপোর্ট আছে, জার্মানী আর রাশিয়ার কাছ থেকে পুরানো বেশ কয়েকটা সাবমেরিন অনেক আগেই কিনেছে তারা। দেখতে নতুন আর চকচকে হলেও, ওগুলো আসলে পুরানোই।

শামিমের ধারণা সাবমেরিনগুলোয় এমন সব পরিবর্তন আনা হয়েছে, দৈবাৎ আন্তর্জাতিক জলসীমায় দেখা গেলে ওগুলোকে ইসরায়েলি বলে প্রমাণ করা সহজ কাজ হবে না।

এঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার অর্থ যে-কোন মুহূর্তে সাবমেরিনটা রওনা হয়ে যাবে সময় দেখল শামিম। ঘড়ির কাঁটা ধরে রওনা হলে আর মাত্র আঠারো মিনিট পর। অবশ্যই ঘড়ির কাঁটা ধরেই কাজ শুরু করবে ওরা।

হারবারের মুখ থেকে উল্টোদিকে, হেলাল জাললু শহরটার দিকে তাকাল শামিম, ভোরের ম্লান আলোয় ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে। বাড়ি-ঘরের জানালা এখনও খোলেনি, একটা মসজিদ থেকে মুসল্লীদের বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। হারবারের মুখে এক সারি অয়্যারহাউস, তারই পাশে জেলে-নৌকার ভিড়। আলো কম হওয়া সত্ত্বেও আলবিদার কালো খোল চিনতে পারল সে, লাল পাল তুলে রেখেছে।

চারশো গজ দূরে। ভাল সাঁতার জানা থাকলে এটা কোন দূরত্বই নয়। কিন্তু এই চারশো গজ খোলা সাগর আর হারবারের মধ্যে একটা সরু গলা তৈরি করেছে, ফলে স্রোত আর ঢেউ দুটোই খুব তীব্র। এখন ভাটার সময়, প্ল্যাটফর্মের নিচে পানির সারফেস দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে। গম্ভীর হলো শামিম দূরত্বটুকু পেরুনো কঠিনই হবে।

ধীরে ধীরে, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে, ওভারঅলের পকেট থেকে পেন্সিল আর নোটবুক বের করল শামিম। সর্বশেষ প্রান্তের প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোচ্ছে। তাকিয়ে আছে সবচেয়ে দূরের সাবমেরিনটার দিকে। গ্যাঙওয়ের নিচে দাঁড়ানো সেন্ট্রিকে পাশ কাটাল। কেউ তার দিকে তাকিয়ে নেই। কেন থাকবে? নীল ওভারঅল পরা বিশালদেহী একজন ইন্সপেক্টর সে, ভুরু কুঁচকে প্ল্যাটফর্মের পরিবেশ-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে, কোথাও অপরিচ্ছন্নতা বা অনিয়ম দেখলে নোটবুকে টুকে নিচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় পৌঁছে ঝুঁকে লোহার ধাপগুলোর দিকে তাকাল। কেউ তাকিয়ে থাকতেও পারে, তাই পেন্সিলটা কানে গুঁজে ঠোঁট কামড়াল, মাথা নাড়ল এদিক ওদিক। তারপর ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল নিচে।

প্ল্যাটফর্মের লেভেল থেকে নিচে নেমে আসায় এখন আর তাকে কেউ দেখতে পাবে না, দু'চারজন সেন্ট্রি ছাড়া। আর মাত্র ষোলো মিনিট সময় আছে, আশা করা যায় দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদেরকেও প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। এই গ্যারিসন বা হারবার বিশেষ একটা উদ্দেশে এই প্রথমবার ব্যবহার করছে ইসরায়েলিরা,

সাবমেরিনগুলো রওনা হয়ে গেলে এখানে নৌ বা সেনাবাহিনীর কোন সদস্য থাকবে বলে মনে হয় না।

নিচের ধাপে নেমে এসে নোটবুক আর পেন্সিল পানিতে ফেলে দিল শামিম। গা থেকে ওভারঅল আর পা থেকে বুট খুলে ফেলল. এক আন্ডারপ্যান্ট ছাড়া বাকি কাপড়ও শরীরে রাখল না। তারপর লাফ দিয়ে পড়ল পানিতে।

'বেনিন,' গ্যাঙওয়েতে দাঁড়ানো সেন্ট্রিকে বলল রানা হাসান যে গ্যাংওয়ে ধরে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেটার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও।

তাকালও না. কার্ডটা ফেরত দিয়ে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল সেন্ট্রি। গ্যাংওয়ে ধরে উঠে এল রানা, সাবমেরিনের স্টীল ডেকে দাঁড়াল, টুলবক্সের এনামেল হ্যান্ডেল পিচ্ছিল হয়ে আছে মুঠোর ভেতর। সামনে একটা খোলা হ্যাচ। ও জানে, মিসাইল ও টর্পেডো রুম সামনের দিকে। এত বড় আকৃতির সাবমেরিন, একটা গ্রেনেড তেমন কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবু. হাসান বলেছে. গ্রেনেড ব্যবহার করতে হবে একটা ফিউজ বা একটা প্রাইমার হিসেবে. টন টন হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড বিস্ফোরিত করার জন্যে। তাতে নাকি সাবমেরিন ধ্বংস হয়ে যাবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ওটার সঙ্গে বাকি সবাইও। রানা ভাবল. আমি?

হ্যাচ-এর দিকে এগোল। ডেকে থাকা স্বস্তিকর। নিচে নামলে দম বন্ধ হয়ে আসবে। সাবমেরিন মানে ইস্পাতের একটা শেল. এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে পানির তলায় ডুব দেবে।

সহজ হোক বা কঠিন. কাজটা করতে হবে।

হ্যাচ থেকে ইস্পাতের ধাপ নেমে গেছে. নিচে হলদেটে আলো। ধাপ বেয়ে প্রায় নিচে নেমে এসেছে রানা, এক লোক মুখ তুলে তাকাল। মুখটা সরু. চোখা দাড়ি আছে. চোখের নিচে কালো পুঁটলি। পেটি অফিসার। 'তুমি এখানে কেন? কি চাও?' জানতে চাইল সে।

'টয়লেট চেক করব,' এক গাল হেসে বলল রানা. যেন নিরীহ বোকাসোকা সরল সাধাসিধে মানুষ।

'টয়লেটে কোন সমস্যা আছে বলে তো শুনিনি. বলল পেটি। 'যাও, ক্যাপটেনের সঙ্গে আগে দেখা করো।'

'ক্যাপটেন কোথায়?' ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করছে, কল্পনা করল রানা।

'কনিং টাওয়ারে। তাড়াতাড়ি করো!'

ডেকে ফিরে এসে ধাতব ধাপ বেয়ে কনিং টাওয়ারে চড়ল রানা, সেখান থেকে টাওয়ারের ভেতর নামল। নিচে তেল আর ঘামের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে। আরও একটা গন্ধ পেল—প্যারোক্সাইড। লেদার জার্সি পরা এক লোক আরেক লোকের সঙ্গে তর্ক করছে। দু'জনেরই দাড়ি আছে. একজনের মাথায় নারকেলের আধখানা খোল আকৃতির টুপি। আরেকজনের মাথায় ক্যাপ খুক করে কেশে রানা বলল. 'আমি টয়লেট মেরামত করতে এসেছি।'

ক্যাপ মাথায় লোকটা, ক্যাপটেন. ঝট করে ঘুরল। 'এখন? আর সময় পেলে না? তাছাড়া. আমার তো জানা নেই টয়লেটে সমস্যা আছে কিনা। ভাগো. নেমে যাও

আমার বোট থেকে!'

'আমাকে অর্ডার করা হয়েছে, ক্যাপটেন,' বলল রানা। হ্যাচ থেকে দিনের আলো নেমে আসছে।

'আমি ক্যাপটেন...'

'কিন্তু জেনারেল আমাকে অর্ডার দিলেন...'

'ও, আচ্ছা, জেনারেল! তাই বলো! কিন্তু...আচ্ছা, ঠিক আছে–যাও, দেখো টয়লেটের কি অবস্থা। কিন্তু শুনে রাখো, দশ মিনিট পর রওনা হচ্ছি আমরা। তখনও যদি তুমি সাবমেরিনে থাকো, তোমাকে আমি টর্পেডো টিউবে ঢোকাব।'

'তার কোন প্রয়োজন হবে না,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল রানা। তবে ইতিমধ্যে দ্বিতীয় লোকটার সঙ্গে আবার তর্ক জুড়ে দিয়েছে ক্যাপটেন, একজন ডক-কর্মীর পিছনে নষ্ট করার মত সময় নেই তার।

এঞ্জিন পিছনে। টর্পেডো আর আন্ডারওয়াটার মিসাইল লঞ্চার সামনে। কাজেই সামনে যেতে হবে রানাকে।

পেরিস্কোপকে পাশ কাটিয়ে ধাপ বেয়ে নামল। করিডর ধরে হাঁটছে। ক্রুদের মেসরুমকে পাশ কাটাল। র‍্যাকে সাজানো রয়েছে টর্পেডো আর মিসাইল। চারদিকে হলদেটে আলো। প্রচুর লোকজন। ভিড় ঠেলে এগোতে হচ্ছে। কোন পোর্টহোল বা জানালা নেই, নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা। পানির সারফেস থেকে নিচে রয়েছ তুমি।

আজেবাজে কথা ভাববে না! এখনও প্ল্যাটফর্মের পাশে রয়েছে সাবমেরিন।

খোলা হ্যাচের তলা দিয়ে এগোল। ওর দিকে তাকাল পেটি অফিসার, চোখ ফিরিয়ে নিল। সামনে একটা গোলাকৃতি দরজা। অর্থাৎ করিডরের এখানেই সমাপ্তি। তবে বাল্কহেড-এর উল্টোদিকে লম্বা একটা চেম্বার দেখা যাচ্ছে, চেম্বারের ডান ও বাম দিকে মোটা টিউব আর লম্বা মিসাইল লঞ্চার। একপাশে টর্পেডো, আরেক পাশে মিসাইল।

ওর ডান দিকে খুদে একটা কমপার্টমেন্ট। টয়লেট।

চারদিকে চোখ বুলাল। পেটি অফিসার লক্ষ করছে ওকে। চোখ মটকে টয়লেটে ঢুকল রানা, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। টুলবক্স ধরা হাতের মুঠো ঘামে ভিজে গেছে। আর বোধহয় পাঁচ মিনিট সময় আছে হাতে।

নতুন একটা শব্দ। কম্পন। এঞ্জিনগুলো স্টার্ট নিয়েছে। কোথাও একটা ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। যা করার এখুনি। পরে আর সময় বা সুযোগ পাওয়া যাবে না।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে কোন দিকে তাকাল না, মাথা চুলকাচ্ছে, করিডর ধরে হেঁটে এসে সোজা ঢুকে পড়ল টর্পেডো রুমে–এটাই কাছে। ভেতরে দু'জন মাত্র লোক, র‍্যাকে তোলা টর্পেডো স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধছে। দু'জনেই সাধারণ নাবিক।

'ধ্যেত,' বিরক্তি প্রকাশ করল একজন। 'বিরক্ত করার আর সময় পেলে না।'

'সীল চেক করব,' বলল রানা। 'দু'মিনিটের কাজ। এগুলোর মধ্যে কোনটা তোমরা প্রথমে টিউবে ভরবে?' ও জানে, নিক্ষেপ করার প্রয়োজন হোক বা না হোক, নিয়ম হলো পানির নিচে সাবমেরিন ডুব দেয়ার পরপরই টিউবে টর্পেডো ঢোকানো হয়। 'ওগুলো,' হাত তুলে দেখাল একজন রেটিং। 'কিন্তু, ভাই, অসময়ে বিরক্ত

কোরো না তো! কাজটা শেষ করতে দাও—একটু পরই টিউবে টর্পেডো ভরতে হবে।'

রেটিং যে টর্পেডোগুলো দেখাল সেগুলো প্রথম র‍্যাকে রাখা হয়েছে। চাকা লাগানো র‍্যাক, সময় হলে গোলাকৃতি দরজার ভেতর দিয়ে টিউবের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। টর্পেডোগুলোর পিছনে চলে এল রানা, লোক দু'জন ওকে দেখতে পাচ্ছে না। সাবমেরিনের ইস্পাতের দেয়ালে একটা রড দেখতে পেয়ে গ্রেনেড-এর হ্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে আসা স্ট্রিং ল্যানিয়ার্ড দিয়ে একটা লুপ বানিয়ে ঝোলাল তাতে। তারপর গ্রেনেডের ক্যাপ খুলল, স্ট্রিং ফিউজ-এর শেষ প্রান্ত থেকে সাবধানে বের করে আনল পর্সলিন বাটনটা, সবশেষে স্ট্রিং ফিউজটা টর্পেডোর প্রপেলারের সঙ্গে বাঁধল।

মাত্র একটার কাজ শেষ হলো।

টুলবক্স থেকে স্প্যানার বের করে রেটিংদের পাশ কাটাল, কমপার্টমেন্টের উল্টোদিকে হেঁটে এসে পোর্টসাইডের নিচের টর্পেডোয় দ্বিতীয় গ্রেনেডটা ফিট করল। পাশ কাটাবার সময় রেটিংরা ওর দিকে তাকায়নি, তবে তার মানে এই নয় যে ও কি করছে দেখার জন্যে উঁকি মারবে না।

যদিও সেরকম কিছু ঘটল না।

তৃতীয় আর চতুর্থ গ্রেনেড ফিট করা হলো পরবর্তী সারির একজোড়া টর্পেডোয়।

রানার মাথার ওপর ইস্পাতের ডেকে বুট পরা লোকজন দ্রুত হাঁটাচলা করছে। এঞ্জিনের শক্তি ক্রমশ বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে কম্পন। 'সব ঠিক আছে, কোথাও কিছু লিক করছে না,' আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল রানা। 'সিউয়েজ পাইপ এদিক দিয়ে না গেলেই ভাল হত।'

রেটিং দু'জন ভাল করে ওর কথা শুনলই না। কমপার্টমেন্ট থেকে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। হ্যাচটা এখনও খোলা। তাজা বাতাসের গন্ধ পাচ্ছে। দু'জন লোককে পাশ কাটিয়ে মইয়ের নিচের ধাপে পা রাখল।

কঠিন একটা হাত ওর কনুই চেপে ধরল। সুরটা কঠিন, জানতে চাইল, 'টয়লেট মেরামত করতে এসে টর্পেডো রুমে কি করছিলে?'

ঘাড় ফেরাল রানা। লোকটা সেই পেটি অফিসার।

'কাস্ট অফ!' ডেক থেকে কেউ একজন হুঙ্কার ছাড়ল।

রানার মাথার ওপর বিকট ধাতব শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচ।

দশ

বিশ গজ দূরে অন্য এক জগতে রয়েছে হাসান। বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ জানে হাতে আর মাত্র সাত মিনিট সময় আছে। সরাসরি কনিং টাওয়ারে পৌঁছায় সে, চার্টের ওপর ঝুঁকে থাকা ক্যাপটেন আর নেভিগেটিং অফিসারকে জানায়, 'টয়লেট দেখতে এসেছি।'

দুঃখ বা ক্ষোভ নেই। উচিত একটা কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুকে বরণ করতে হচ্ছে বলে নিজেকে নিয়ে বরং গর্বিত ও। তবে মরার আগে প্রকৃতিকে একবার দেখে নিতে চায়। সেজন্যেই বাইরে বেরুনো দরকার।

ও শুধু একা নয়, পেটি অফিসারও মারা যাবে, জানে রানা।

মুখ তুলে হ্যাচের দিকে তাকাল। একটা মাথা দেখা যাচ্ছে। 'নামছি এবার,' ওপর থেকে চিৎকার ভেসে এল। অদৃশ্য হয়ে গেল মাথাটা। রানার হাত ছিল পিছনে, শিরদাঁড়ার কাছে; কোমরে, বেল্টের সঙ্গে আটকানো খাপ থেকে ছুরিটা বের করে আনল, এনেই ঘ্যাচ করে ঢুকিয়ে দিল পেটি অফিসারের বুকে। হাতলটা ছাড়েনি রানা, পেটি অফিসারকে ঠেলে বাঙ্কের ওপর ফেলে দিল, একটা চাদর টেনে ঢেকে দিল লাশটা। তারপর, যেন কিছুই হয়নি, চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে মই বেয়ে ওপরে উঠছে।

রানা উঠে আসতেই হ্যাচের ঢাকনি বন্ধ করে দিল ডেকে দাঁড়ানো লোকটা। একজন স্টিভিডর লাইন খুলে দিয়েছে। সাবমেরিন আর প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে চওড়া হচ্ছে সবুজ পানি। কনিং টাওয়ার থেকে কেউ একজন গর্জে উঠল, 'জাম্প!'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। ক্যাপটেনকে দেখতে পেল। লোকটার চেহারায় অকারণ আক্রোশ, আর্মার প্লেটের ওপর উঁচু হয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'ডক-কর্মীদের পছন্দ করেন না,' বো লাইন হাতে বলল লোকটা। 'আমিও করি না,' পা উঁচু করে রানার কোমরে ধাক্কা দিল সে।

লাথিটা এড়িয়ে যেতে পারত রানা, মর্যাদা রক্ষার খাতিরে লোকটার পা ধরে ভেঙে দিতেও পারত। কিন্তু এই মুহূর্তে মর্যাদা নয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাবমেরিন থেকে নেমে যাবার তাগিদ রয়েছে ওর।

লাফ দিল ও। সাবমেরিনের প্রেশার হাল-এ লেগে ধাতব শব্দ তুলল টুলবক্স। গভীর পানিতে ডুবে যাবার সময় নীল বাক্সটা যেন চোখ মটকাল ওকে। ওটার ভেতর তিনটে গ্রেনেড রয়ে গেছে এখনও।

পরমুহূর্তে নাকে-মুখে পানি ঢুকল, প্ল্যাটফর্মের দিকে সাঁতরাচ্ছে। শুনতে পেল গলা ছেড়ে হাসছে ক্যাপটেন, তবে সেদিকে মনোযোগ দিল না। ভাবছে, তৃতীয় সাবমেরিনটার কি হবে? হাতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে। ওটাকে ধ্বংস করার উপায় কি?

সাঁতার কাটছে শামিমও। চারশো গজ দূরে আলবিদা, এই দূরত্ব পেরুনো তার মত দক্ষ সাঁতারুর জন্যে কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু চ্যানেলে পড়ার পর বিপদ আঁচ করতে পারল। তীব্র স্রোত ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। পানির ওপর শুধু মাথাটা তুলে রেখেছে, তা না হলে ইসরায়েলিরা ওকে দেখে ফেলতে পারে। মাথাটা দেখলে ভাববে একটা সীল। প্ল্যাটফর্ম থেকে খানিক দূরে অ্যান্টি-সাবমেরিন নেট ছিল, একটু আগে সেগুলো জাহাজে তুলে নেয়া হয়েছে।

খরস্রোতা নদীর মত চ্যানেলটা, হারবারের সরু গলা থেকে খোলা সাগরের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে শামিমকে। উজানের দিকে দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে

আলবিদার মাস্তুল। আতঙ্কে অবশ হয়ে আসছে হাত-পা। স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতা সম্ভব নয়।

প্রাণ বাঁচানো অসম্ভব, উপলব্ধি করে মৃত্যু চিন্তা মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলল শামিম। রানা আর হাসানের কথা ভাবছে ও। বিশেষ করে রানার দক্ষতা সম্পর্কে তার ধারণা আছে, বিপদের সময় বা জরুরী মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা রেখে যে-কোন অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা রাখে। হাসানের ওপরও আস্থা আছে তার। মনে মনে প্রার্থনা করল, মরছি তাতে কোন দুঃখ নেই. তবে মরার আগে সাবমেরিনগুলো ধ্বংস হতে দেখলে বড় ভাল লাগত।

আলবিদার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল সে। চিরকালের জন্যে নাগালের বাইরে পিছিয়ে গেছে ওটা। খোলা সাগরে তাকাতে জাহাজ দুটো দেখতে পেল। একজোড়া লঞ্চ এগোচ্ছে ওটার দিকে। কোত্থেকে যেন নতুন শক্তি ফিরে পেল সে, স্রোতের বিপরীতে সাঁতরে জাহাজগুলোর দিকে এগোচ্ছে, দশ ডিগ্রী ডান দিকে থাকছে।

অন্য কেউ হলে তার জন্যে ব্যাপারটা স্রেফ আত্মহত্যা হত।

কিন্তু শামিমের জন্যে কাজটা সম্ভব। শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্রোতের উল্টোদিকে এগোচ্ছে সে, পানির একটা বো-ওয়েভ তৈরি করছে নাক দিয়ে। সাগরে বেরিয়ে আসার পর যে প্ল্যাটফর্ম থেকে পানিতে নেমেছিল, সেটা দৃষ্টি পথের বাইরে হারিয়ে গিয়েছিল। তবে পাঁচ মিনিট অমানুষিক পরিশ্রম করার পর বাম দিকে আবার ওটা দেখা গেল।

দুই জাহাজের মধ্যে যেটা কাছাকাছি. সেটার স্টারবোর্ড সাইডও এখন দেখতে পাচ্ছে শামিম। কিছুই ভাবছে না সে। প্রাণে বেঁচে যাবার আশা আছে, এই চিন্তাটাকেও প্রশ্রয় দিচ্ছে না। শুধু প্রচণ্ড একটা জেদ কাজ করছে। থামা চলবে না, সাঁতরাতে হবে, তাই সাঁতরাচ্ছে। আর মাত্র দুশো স্ট্রোক। সাদা মুকুট পরা খাড়া একটা ঢেউ-এর শিরদাঁড়া পার হয়ে এল। একজোড়া ঢেউ বাঘের থাবার মত চড় কষল মুখে। নাক দিয়ে লোনা পানি ঢুকল ফুসফুসে, বিষম খেলো সে। এতক্ষণে সত্যি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর বোধ হয় পারবে না। এবার তাকে তাকাতে হবে।

তাকাল শামিম।

আলবিদা অনেক অনেক দূরে ছিল, উজানের দিকে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা বিশ কি বাইশ ডিগ্রী ডান দিকে, দূরত্বও অনেক কমে এসেছে।

বিপদ কাটেনি। এখনও খোলা সাগরে রয়েছে সে। তবে কোন সন্দেহ নেই, স্রোতটা এখন তাকে হেলাল জাললু শহরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওদিকের একটা জেটি বা প্ল্যাটফর্মে ভিড় করে রয়েছে ফিশিং বোটগুলো। সেগুলো ক্রমশ কাছে চলে আসছে।

তারপর, প্রায় অকস্মাৎই, পায়ে বালি ঠেকল। ফেলে আসা সাগরের দিকে তাকাল শামিম। ভাটার টানে সরে যাওয়ায় পানির রঙও বদলে গেছে। নিজেকে তিরস্কার করল মনে মনে। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটার ঝুঁকি না নিলেও চলত। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলে হেঁটে চলে আসতে পারত জেটিতে।

অন্য কেউ হলে পাগলের মত হেসে উঠত বা কেঁদে ফেলত। কিন্তু শামিম

অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। কর্তব্যই তার কাছে প্রথম গুরুত্ব। আলবিদায় পৌঁছুতে হবে তাকে–ওয়াটারপ্রুফ হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল সে–চার মিনিটের মধ্যে।

পানি কেটে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল শামিম।

গ্র্যানিট পাথরে গাঁথা লোহার ধাপ বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠছে রানা, কাশির সঙ্গে গলা থেকে পানি বেরুচ্ছে। সাবমেরিন ডকগুলোকে তিনটে বিশাল ফাটলের মত লাগছে দেখতে। ও যে সাবমেরিন থেকে নেমে এসেছে, সেটা সচল হলো।

তৃতীয় সাবমেরিনের কনিং টাওয়ার স্থির হয়ে আছে। প্ল্যাটফর্মের সর্বশেষ ধাপে বিশ্রাম নিচ্ছে রানা, ওটার কনিং টাওয়ার থেকে চোখ সরাচ্ছে না। এত ক্লান্ত, যেন প্ল্যাটফর্মে ওঠার শক্তিও ফুরিয়ে গেছে।

এই সময় ব্যাপারটা খেয়াল করল রানা। তৃতীয় সাবমেরিনের কনিং টাওয়ারে হাসান। ক্যাপ পরা এক লোকের সঙ্গে তর্ক করছে সে, ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা গেল সাবমেরিনে ঢোকার অনুমতি চাইছে। ক্যাপ পরা লোকটা, ক্যাপটেন, মাথা নাড়ছে, অর্থাৎ বলতে চায় সাবমেরিন এখুনি রওনা হয়ে যাবে, কাজেই ভাল চাও তো আমার সাবমেরিন থেকে নেমে যাও।

দূর থেকে ঠিক বোঝা গেল না তর্কে কিভাবে জিতল হাসান, তবে তাকে হ্যাচ গলে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল রানা। তাড়াতাড়ি, ভাই, তাড়াতাড়ি! মনে মনে তাগাদা দিল ও। হাতঘড়ির ওপর দ্রুত চোখ বুলাতে অস্থিরতা আরও বাড়ল। পাঁচটা বাজতে আর মাত্র তিন মিনিট বাকি।

সর্বনাশ, অনেক দেরি করে ফেলেছে!

তারপর, হঠাৎ রানা খেয়াল করল, চারদিক থেকে অ্যালার্ম বাজছে। কখন থেকে বাজছে বলতে পারবে না, বোধহয় বেশ কিছুক্ষণ ধরেই। ক্লান্ত ও অন্যমনস্ক থাকায় এতক্ষণ খেয়াল করেনি। কিন্তু চারদিক থেকে অ্যালার্ম বাজবে কেন? কি এমন ঘটল…

রানার জানার কথা নয়, একজন মেজর রিপোর্ট করতে গিয়ে জেনারেলের লাশ পেয়ে গেছে। সে-ই অ্যালার্ম বাজিয়ে সাবমেরিন ক্যাপটেনদের জানিয়ে দিচ্ছে–ইমার্জেন্সী, এই মুহূর্তে প্ল্যাটফর্ম ত্যাগ করো!

সেই কারণেই তিন মিনিট আগে রওনা হয়ে যাচ্ছে সাবমেরিনগুলো।

কারণ না জানলেও, চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটতে দেখছে রানা। সাবমেরিনগুলো রওনা হয়ে যাচ্ছে, অথচ ওগুলোর একটায় রয়ে গেছে হাসান।

শরীর বা মনে কি যে ঘটল, বলতে পারবে না রানা, এক নিমেষে সমস্ত ক্লান্তি ভোজবাজির মত দূর হয়ে গেল; এক লাফে প্ল্যাটফর্মে উঠল, ছুটছে, চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে সচল কনিং টাওয়ারের ওপর, রাগে চিৎকার করছে। কিন্তু ও যত জোরে দৌড়াচ্ছে, তারচেয়ে কনিং টাওয়ারের গতি অনেক বেশি।

প্ল্যাটফর্মগুলোর শেষ মাথায় টার্নিং বেসিন-এ জড়ো হলো তিনটে সাবমেরিন, প্রকাণ্ড ধাতব তিমির মত দেখতে, ঘুরন্ত প্রপেলার পানিতে বিপুল আলোড়ন তুলছে। ওগুলোর ডেকে ছুটোছুটি করছে লোকজন, খোলা সাগরে বেরিয়ে যাবার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। কনিং টাওয়ারে দাঁড়ানো ক্যাপটেনরা পরস্পরের সঙ্গে কথা

বলছে, ইমার্জেন্সী বেল বেজে ওঠা সত্ত্বেও কাউকে তেমন উদ্বিগ্ন দেখা গেল না, কারণ জানে একশো মিটার পানির তলায় নেমে যেতে পারলে কেউ তাদেরকে ছুঁতে পারবে না।

বেলের আওয়াজে কান ঝালাপালা, প্ল্যাটফর্মের কিনারা থেকে নিচের দিকে তাকাল রানা। ভাঙাচোরা একটা ডিঙি নৌকা রয়েছে ওখানে, সিকি ভাগ পানি ভরা। তবে বৈঠা আর রো-লক আছে। ডুবু-ডুবু হলেও, ভেসেও আছে এখনও।

বোলার্ড-এর সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধা ওটা। রশি বেয়ে নামল রানা, নেমেই রশিটা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলল। মুক্ত হয়ে ছুটল নৌকা। রানা মরিয়া, মাথায় একটা আইডিয়া গজিয়েছে। হয়তো পাগলামি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু জেদ–সাবমেরিনের কাছে পৌঁছুতে হবে ওকে, হাসানকে বের করে আনতে হবে। কিভাবে? রানা জানে না। আগে সাবমেরিনটার পাশে পৌঁছুক তো। দরকার হলে খোলে বৈঠা ঠুকবে, ক্যাপটেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোঝাতে চেষ্টা করবে সাবমেরিনের ভেতর ওর সঙ্গী, একজন ডক মেইট আটকা পড়েছে, তাকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দেয়া হোক।

গায়ে শক্তি ফিরে এসেছে, দ্রুত বৈঠা চালাচ্ছে রানা। প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় পৌঁছে গেল ও। স্রোতের মধ্যে পড়ল নৌকা।

স্রোতের গতি ঘণ্টায় চার নট। বৈঠা চালিয়ে ঘণ্টায় দুই নটের বেশি এগোতে পারত না রানা। কিন্তু সাবমেরিনগুলো চার নট নয়, আরও দ্রুতগতিতে নৌকাটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

হতাশায় ছেয়ে গেল মন। কোন আশা নেই। ধরে নেয়া চলে ইসরায়েলি সাবমেরিনগুলো সাইপ্রাসে পৌঁছে গেছে।

হৃদয়ে চিনচিনে ব্যথা নিয়ে দিক বদল করল রানা, চ্যানেল ধরে আলবিদার দিকে এগোচ্ছে নৌকা। কয়েক মুহূর্ত পর বাতাসে চাবুক মারার মত আওয়াজ উঠল, মৃদু শব্দে কি যেন বিস্ফোরিতও হচ্ছে, আতসবাজির মত। কে যেন ওকে লক্ষ করে চিৎকারও করছে। একজন নয়, অনেক লোক চিৎকার করছে–খোলা সাগরে নোঙর করা জাহাজ দুটো থেকে। ওর চিন্তা ও কল্পনা শক্তি ভোঁতা হয়ে গেছে। অস্পষ্টভাবে ধারণা করল হ্যাচ কাভারের ওপর বালির বস্তা ঘেরা বৃত্ত আছে, বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে আছে মেশিন গানের ব্যারেল। গুলি করছে ওরা। দূরত্ব যত বেশিই হোক, দু'একটা গুলি ওকে লাগতেও পারে।

কিছুই গ্রাহ্য করতে ইচ্ছে করছে না। নিশ্চিতভাবে জানে এখন, হাসানকে চিরকালের জন্যে হারিয়ে ফেলেছে ওরা।

'আমি হুকুমের দাস,' শেষ সাবমেরিনের ক্যাপটেনকে বলল হাসান, রীতিমত চিৎকার করতে হচ্ছে, তা না হলে শুনতে পাবে না। 'আর হুকুমটা আমাকে দিয়েছেন স্বয়ং জেনারেল। অফিসারদের টয়লেট চেক করে তাঁকে রিপোর্ট করতে হবে। সাবমেরিন নিয়ে পাঁচ মিনিট পরে রওনা হন আপনি।'

ক্যাপটেন এত ক্লান্ত যে তর্ক করতে মন চাইল না। পাশে দাঁড়ানো একজন ক্রুকে বলল, 'এই লোককে নিচে নিয়ে যাও। আমরা যখন রওনা হব, তার আগে ওকে যেন প্ল্যাটফর্মে ফেরার সুযোগ দেয়া হয়। দায়িত্বটা তোমাকে দেয়া হলো।'

'ইয়েস, স্যার।' হাসানের দিকে ফিরল ক্রু। 'কি চাও তুমি?'
'এঞ্জিন রুমের টয়লেট।' টুলবক্সটা ঝাঁকাল হাসান।
'এঞ্জিন রুমে কোন টয়লেট নেই।'
'আমি হুকুমের দাস,' বলল হাসান।
'নেই যে, চলো দেখিয়ে আনি,' মই বেয়ে নামতে শুরু করল ক্রু। হাসান তার পিছু নিল।
করিডর ধরে সাবমেরিনের পিছনে চলে এল ওরা। কন্ট্রোল রুমের মাথার ওপর কনিং টাওয়ারের হ্যাচ খোলা থাকায় দিনের আলো গোল থালার আকৃতি পেয়েছে। মই বেয়ে নামতে শুরু করেছে হাসান, মনে হলো কোথাও বেল বাজছে, লোকজন যেন চিৎকারও করছে। তবে সে জানে হাতে এখনও পাঁচ মিনিট সময় আছে। অ্যালার্ম-এর শব্দ তার জন্যে কোন তাৎপর্য বহন করে না। এই মুহূর্তে একটাই চিন্তা মাথায়, ক্রু ব্যাটাকে কিভাবে ভাগানো যায়।
ইতিমধ্যে সাবমেরিনের সেন্ট্রাল করিডর পরিচিত হয়ে উঠেছে–হলুদ আলো, উত্তাপ, ঘর্মাক্ত চেহারা। পরিচিত নয় এঞ্জিনের আওয়াজটা। এ এমন এক গর্জন, বিরতি না নিয়ে ক্রমশ বাড়ছেই শুধু।
ক্রু দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ঘুরে তাকাল হাসানের দিকে। কথা বলে লাভ নেই, কারণ শোনা যাবে না, তবু কিছু বলল সে। হাসান শুধু তার ঠোঁট নড়তে দেখল, কোন শব্দ শুনতে পেল না। তবে ঠোঁট নড়া দেখেই বুঝতে পারল কি বলতে চায়।
বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে ওঠায় ব্যথা অনুভব করল হাসান। ক্রু বলেছে, 'আমরা রওনা হয়ে গেছি।'
বিস্ময়ের আঘাতে নিষ্প্রাণ কাঠের পুতুল হয়ে থাকল হাসান। মাত্র এক সেকেন্ড। তারপর নিঃশব্দে হাসল সে। 'কি আর করা,' জানে শুনতে পাবে না, তবু বলল। 'তবে হাতে এখন প্রচুর সময়, কি বলো?'
এঞ্জিন রুমে ঢুকে ক্রু একটা হাত তুলে চারদিকটা দেখাল। 'নেই,' বলল সে। 'এখানে কোন টয়লেট নেই।'
এখনও হাসছে হাসান, গোবেচারা লোকের বোকা বোকা হাসি। 'হ্যাঁ, তাই তো, সত্যি নেই।'
করিডরের দিকে হাত তুলল ক্রু, ইঙ্গিতে মইটা দেখাল। হাসান বুঝতে পারছে, লোকটা তাকে ক্যাপটেনের কাছে পৌঁছে দিয়ে দায়িত্ব থেকে খালাস পেতে চাইছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে এঞ্জিন রুম থেকে বেরিয়ে এল ও, করিডরে পৌঁছে হঠাৎ ঘুরে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল লোকটাকে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে ডেকের ওপর ছিটকে পড়ল ক্রু।
করিডরে, একটু দূরে, আরও তিনজন লোক রয়েছে। কি ঘটছে দেখছে তারা।
ডেকে পড়ে গোঙাচ্ছে ক্রু, মোচড় খাচ্ছে, তাকে টপকে পিছন দিকে ফিরে এল হাসান, এঞ্জিন রুমে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। ভেতরে দু'জন লোক রয়েছে, একজন অয়েলার, একজন এঞ্জিনিয়ার। এঞ্জিনের আওয়াজ এখন একটা পর্যায়ে স্থির। দরজা বন্ধ করার আওয়াজ লোক দু'জন শুনতে পায়নি। পরস্পরের কাছ থেকে বেশ দূরে রয়েছে তারা, নিজেদের কাজে ব্যস্ত। টুলবক্স ডেকে নামিয়ে রাখল হাসান। চারদিকে চোখ বুলিয়ে একটা র‍্যাক দেখতে পেল, অনেক কিছুর সঙ্গে

তাতে একটা টুলবক্সও রয়েছে। ভেতরে হাত ভরে একটা স্প্যানার বের করল, এগিয়ে এসে দাঁড়াল এঞ্জিনিয়ারের পিছনে।

এঞ্জিনিয়ার কিছুই টের পেল না, ব্যথা পেলেও বেশিক্ষণ ভুগল না, এক সেকেন্ডের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল ডেকে। অয়েলারও তাই, জ্ঞান হারাবার আগে সে-ও টের পায়নি হাসানের উপস্থিতি।

অয়েলার ঢলে পড়ার পর দরজার দিকে চোখ পড়ল হাসানের। বাইরে থেকে ইস্পাতের কবাট খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। খালি হাতে ব্যর্থ হয়ে সম্ভবত স্লেজ হ্যামার ব্যবহার করছে লোকগুলো। হাসি পেল তার। স্লেজ হ্যামার দিয়ে বড়জোর হাতলটা হয়তো ভাঙতে পারবে, কিন্তু দরজা খুলবে না।

নিজের টুলবক্স থেকে দুটো গ্রেনেড বের করল সে। আর ঠিক সেই সময় তামাকের গন্ধ ঢুকল নাকে। সতর্ক চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, একটা ডিজেল ব্লক ঘুরে বেরিয়ে এল লোকটা, মুখে নিষিদ্ধ সিগারেট হাসানকে দেখে হাঁ হয়ে গেল লোকটা, এই নতুন মুখ আগে কখনও দেখেনি সে। দৃষ্টি নেমে এল হাসানের হাতে ধরা গ্রেনেডগুলোর ওপর।

হাসল হাসান, গ্রেনেড দুটো টুলবক্সে রেখে দিল আবার।

লোকটা এঞ্জিনিয়ার। চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেছে। তবে বিপদের গুরুত্ব আঁচ করতে পেরে নিজেকে সামলে নিতে পারল সে। সিগারেট ফেলে দিল, ভোজবাজির মত হাতে চলে এল একটা রেঞ্চ। সাবধানে হাসানের দিকে পা বাড়াল।

লোকটা খাটো, লম্বা-চওড়ায় প্রায় সমান, ইউনিফর্মের ভেতর থেকে পেশীগুলো ফুলে আছে। গায়ের জোরে এই লোকের সঙ্গে সে পারবে না, বুঝতে পারল হাসান। রেঞ্চটা দু'হাতে ধরে ক্রিকেট ব্যাট-এর মত ঘোরাল সে। পিছিয়ে এসেই আবার সামনে বাড়ল হাসান, সে-ও হাতের টুলবক্সটা দিয়ে বাড়ি মারার চেষ্টা করল।

রেঞ্চ দিয়ে টুলবক্স ঠেকাল এঞ্জিনিয়ার। হাসানের হাত থেকে টুলবক্স ছুটে গেল, ডেকে পড়ে খুলে গেল ঢাকনি, টুলস আর গ্রেনেডগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। গড়ানো গ্রেনেডগুলোর দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল হাসান। ওগুলো একটা টানেলের ভেতর ঢুকছে, যেখানে প্রপেলার শ্যাফট আছে। আক্রান্ত হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তড়াক করে লাফ দিয়ে সরে গেল, রেঞ্চটা লাগল স্টীল বাল্কহেডে, এক নিমেষ আগে যেখানে তার মাথাটা ছিল।

দরজার দিকে পিঠ, হাঁপাচ্ছে হাসান, বুকটা ধড়ফড় করছে। হলদেটে আলোয় লোকটার মুখের ঘাম ডিমের কুসুমের মত লাগছে। হঠাৎ তার চোখের পাতা কেঁপে উঠল। কারণটা বুঝতে পারল হাসান। এঞ্জিন থেকে নতুন একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে। যান্ত্রিক এক ধরনের আর্তনাদ। পায়ের নিচে ডেক ধীরে ধীরে কাত হচ্ছে।

যান্ত্রিক আর্তনাদটা ডিজইন্টিগ্রেটার-এর। সাবমেরিন ডাইভ দিচ্ছে, ফলে এঞ্জিনে এখন ফুয়েল-এয়ার-এর বদলে ফুয়েল-ডিকমপোজড হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড সাপ্লাই পাচ্ছে।

রেঞ্চ হাতে লোকটা আবার এগিয়ে এল। রেঞ্চের নিচে মাথা নামিয়ে তার পেটে লাথি মারল হাসান। লাথিটা যেন পাথুরে পাহাড়ে লাগল, একচুল হেলল না এঞ্জিনিয়ার। হাসানকে পিছাতে দেখে আবার এগোল বেঁটে দানব।

দরজার কাছ থেকে ব্যাটাকে সরিয়ে আনতে হবে, ভাবল হাসান। তা না হলে বোল্ট খুলে দেবে, লোকজন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে ভেতরে।

আবার রেঞ্চ চালাল লোকটা। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল হাসান। দরজা বন্ধ থাক বা না থাক, সে মারা গেলে তার মিশন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

লোকটা দরজার কথা ভুলে গেছে। হাসানই তার একমাত্র লক্ষ্য। এঞ্জিন রূমের প্রতিটি বাঁক আর কোণ সে চেনে, কাজেই জানে যতই পিছিয়ে যাক, এক সময় ঠিকই তাকে কোণঠাসা করতে পারবে, তখন খুন করা পানির মত সহজ হয়ে যাবে।

আবার এগোল লোকটা, হাসানের কোমর লক্ষ্য করে রেঞ্চ চালাল। লাফিয়ে সরে গেল হাসান। রেঞ্চটা দেয়ালের একটা পাইপে লাগল, ঠিক জয়েন্টের নিচে।

এঞ্জিন রূমের ভেতর হঠাৎ একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। ওরা যেন একটা হেয়ারড্রেসার-এর সেলুনে রয়েছে।

এঞ্জিনিয়ারের চেহারা বদলে গেল। ভাঙা পাইপটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। চেহারায় রাগ বা আক্রোশ কিছুই নেই এখন। আতঙ্কে বিবর্ণ দেখাচ্ছে তাকে।

হাতে স্প্যানার নিয়ে সাবধানে এগোল হাসান। ভঙ্গি করল লোকটাকে মারবে, কিন্তু মারল পাইপে। পাইপটা আরও খানিক ভাঙল। চিৎকার করে কিছু বলতে গেল লোকটা, হাসানের স্প্যানার নেমে এল সরাসরি কপালে। খুলির হাড় ফাটার শব্দটা শুনতে পেল না হাসান, অনুভব করতে পারল।

লোকটা মারা গেছে।

জলদি!

পাইপ থেকে সগর্জনে প্যারোক্সাইড বেরিয়ে আসছে, এঞ্জিনিয়ারের শরীরের নাগাল পেতেই গলগল শব্দ করে বুদ্বুদ ছাড়তে শুরু করল।

আরও একটা ক্যাটালিস্ট আছে, হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইডকে ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণত করতে পারে। সেই ক্যাটালিস্টের নাম প্যারোক্সাইডেস। জিনিসটা মানুষের রক্তে পাওয়া যায়।

ছুটে এঞ্জিন রূমের পিছন দিকে চলে এল হাসান। প্রপেলার শ্যাফট গ্ল্যান্ড-এর পাশে একটা কাবার্ড দেখতে পেল। ইস্পাতের দরজা লাগানো একটা লকার, গায়ে লেখা—গেইবি-গরম্যান। জলদি! জলদি! নিজেকে জোর তাগাদা দিচ্ছে হাসান।

ডেকের ওপর পড়ে থাকা বেঁটে দানবের সিগারেট এখন শুধুই আগুনের আভা ছড়াচ্ছে না, উজ্জ্বল ও নিরেটদর্শন শিখায় পরিণত হয়েছে।

গুলি লাগায় নৌকার চারপাশে পানি ছলকে উঠছে। বৈঠা হারিয়ে ফেলেছে রানা, স্রোতের টানে পাক খেতে খেতে খোলা সাগরে বেরিয়ে যাচ্ছে নৌকা। সাবমেরিনগুলোও চ্যানেল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রথম সাবমেরিন এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে খোলা সাগরে। ওটাতেই হাসান আছে।

নৌকা পাক খাচ্ছে, দুনিয়াটাকে ঘুরতে দেখছে রানা। হেলাল জাললুর দিকে চোখ পড়তে একটা মাস্তুল দেখতে পেল, মাত্র এক কি দু'সেকেন্ডের জন্যে। চিনতেও পারল, ওটা আলবিদার মাস্তুল। মোবারকের বোট সরাসরি ওর দিকে আসছে।

অকস্মাৎ এক পশলা গুলি লাগল নৌকার গায়ে। পাটাতনের চিহ্নমাত্র থাকল না, পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে রানা। এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। আলবিদা ওর পাশে চলে আসছে। স্রোতের উল্টোদিকে স্থির হবার চেষ্টা করল ও, ঘাড় ফেরাতেই একটা মাথা দেখতে পেল, আলবিদা থেকে পানির দিকে ঝুঁকে আছে। শামিমের মাথা।

শামিমের হাত দুটো লম্বা হলো। রানার কব্জি ধরে একটানে তুলে নিল বোটে। কাঠের একটা রেইল আঁকড়ে ধরল রানা, ভারসাম্য সামলাতে না পেরে আলবিদার নোংরা ডেকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

'ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড,' বলল শামিম। 'হাসান কোথায়?'

জাহাজগুলো থেকে মেশিন-গানের বুলেট ছুটে আসছে। হাত তুলে দেখাল রানা। সামনের সাবমেরিনের বেশিরভাগ পানির তলায় ডোবা, শুধু কনিং টাওয়ারের খানিকটা সারফেসের ওপর এখনও ভেসে আছে।

শামিমের চোখে বা চেহারায় কোন ভাবাবেগ ফুটল না। আশ্চর্য এক অটল ভাব দেখা গেল শরীরে, যেন একটা নিষ্প্রাণ মূর্তি। চোখ দুটো নিষ্পলক, তাকিয়ে আছে সাবমেরিনগুলোর দিকে। একটা একটা করে পানির তলায় ডুব দিচ্ছে ওগুলো।

এক সময় সবগুলো সাবমেরিন অদৃশ্য হয়ে গেল। নোঙর তুলে রওনা হলো জাহাজ দুটোও। খোলা সাগরের মুখে এক আলবিদা ছাড়া আর কোন বোট নেই।

শামিমের মত রানাও তাকিয়ে আছে খোলা সাগরে।

কোন বিস্ফোরণ ঘটছে না। পানিতে কোন আলোড়ন নেই।

'রেডিও?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'মেসেজ পাঠানো হয়েছে?' এখনও খোলা সাগরে তাকিয়ে আছে ও।

মাথা ঝাঁকাল শামিম, 'লেবানন থেকে সাবমেরিন আসছে।'

মনে মনে একটা হিসাব কষছে রানা। জাহাজ দুটো রওনা হয়ে গেছে। ধরে নেয়া চলে ওগুলোর আশপাশেই, পানির নিচে, সাবমেরিনগুলো আছে। এখন যদি সাবমেরিনগুলো বিস্ফোরিত হয়, জাহাজগুলো অক্ষত থাকবে কি?

কিন্তু না, কোন বিস্ফোরণই ঘটছে না।

গ্রেনেডগুলো ওরা দেখে ফেলেছে, ভাবল রানা। গ্রেনেড দিয়ে সাবমেরিন ধ্বংস করবে, এটা আশা করাই তো বোকামি। হাত কাঁপছে, ওর আঙুলে একটা সিগারেট গুঁজে দিল শামিম। লাইটার জ্বেলে ধরিয়েও দিল।

সিগারেটটা দাঁতে ধরা থাকল, রানা ধোঁয়া গিলছে না। অকস্মাৎ ওর চোখের সামনে খোলা সাগরের মুখ বিস্ফোরিত হলো।

প্রথমে পানিতে প্রায় কোন আলোড়নই জাগল না। সারফেস ভেদ করে সাদা শিখার বিশাল একটা স্তম্ভ মাথাচাড়া দিল, যেন আকাশ ছুঁতে চায়। তারপর বিপুল জলরাশি উথলে উঠল। দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য লাগল রানার চোখে। আকাশ থেকে যেন একটা বিরতিহীন জলপ্রপাত নেমে আসছে। ছয়শো গজ দূরে আলবিদার ওপর শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টির প্রথম ধাক্কাটা পার হতে দেখা গেল বোটের মাস্তুল বলে কিছু নেই। কুঠার হাতে রিগিং-এর মাঝখানে চলে গেছে শামিম, মাস্তুলের ভাঙা অংশ কেটে ফেলে দিচ্ছে সাগরে।

ওদের আরও একটু কাছে আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটল, সদ্য নোঙর তোলা দুই

'কেন?' জানতে চাইল ও।

দৃষ্টি ঘুরিয়ে বারবার রানা আর শামিমের দিকে তাকাচ্ছে নাসের। জবাব দিল শামিম, 'স্ত্রী আর বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্যে। ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স কেফার ভিটকিন পর্যন্ত লায়লাকে অনুসরণ করে। নাসের সহ আবার যখন লায়লাকে তারা গ্রেফতার করতে যাচ্ছিল, নাসের তখন তাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসে। ওই সময় তারা আমাদেরকে গ্রেফতার করেনি, তার অনেক কারণ। শুধু আমাদেরকে নয়, গোটা এলাকার হিযবুল্লাহ আর মুসলিম ব্রাদারহুড গেরিলাদের তালিকা চেয়েছিল ওরা নাসেরের কাছে। নাসের সময় চায়। তাছাড়া, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দায়ান দায়ান বা ফিশ ফ্যাক্টরিতে কোনভাবেই আমরা পৌঁছতে পারব না। তবে চাইছিল আমরা যেন চেষ্টা করি, তাহলে হাতেনাতে ধরতে পারবে। কাজেই আমরা দায়ান দায়ান পৌঁছবার পর নাসের তাদেরকে তথ্য পাচার শুরু করে।'

কাঁধ ঝাঁকাল নাসের। 'কাজটা আমি আমার স্ত্রী আর সন্তানের জন্যে করেছি,' বলল সে। মুখ থেকে হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে এল। মারা গেল পরমুহূর্তে।

হ্যাচ থেকে অর্ধেক বেরিয়ে আছে লায়লা। তাকে ক্লান্ত ও বিমর্ষ দেখাচ্ছে। চোখের নিচে কালি। টপ টপ করে পানি পড়ল দু'ফোঁটা। 'যাদেরকে ভালবাসত, তাদের সবাইকে হারিয়েছে ও,' রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে বলল সে। 'থাকার মধ্যে ছিলাম শুধু আমি আর আমার পেটে ওর বাচ্চা। কেউ যদি ভাবেন, নিজের দেশকে ও ভালবাসত না, তাহলে সেটা অন্যায় হবে। আমার স্বামী বলে বলছি না, ওকে চিনি বলে বলছি, এমনিতেও বাঁচত না ও–অপরাধবোধ ওকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করত।'

শাফি বলল, 'যুদ্ধে এরকম হয়। আগেও ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। তবে এ-কথাও ঠিক যে বেঈমান বেঈমানই।'

লায়লা বলল, 'যে যার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি আর অবস্থান থেকে সব কিছুর বিচার করে। শাফি, নাসেরকে তোমার বোঝার কথা নয়। তোমার স্ত্রী আর সন্তান নেই। তোমার স্ত্রী বা সন্তান যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েনি।'

শামিম আর রানা দৃষ্টি বিনিময় করল।

রানার দিকে তাকাল লায়লা। 'নাসের যা করেছে আমি তা সমর্থন করি না। কিন্তু সে আমার স্বামী। আমি তার সন্তানের মা। আমি জানি কেন কাজটা করেছে সে। এখন আপনিই বলুন, নাসেরকে আমি কিভাবে ঘৃণা করব?'

এ-ধনের প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিতে হয় রানার জানা নেই।

দেড় ঘণ্টা পর খোলা সাগর থেকে একটা লেবাননী সাবমেরিন আলবিদা থেকে ওদেরকে উদ্ধার করল।

সাবমেরিনের পাশে ভিড়ল বোট। কনিং টাওয়ারে একজন লেফটেন্যান্ট-কমান্ডার দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পাশে স্যুট পরা সোহেল আহমেদ।

আলবিদা থেকে রানা জানতে চাইল, 'তোদের সঙ্গে স্ট্রেচার পার্টি আছে?'

'কেন, কেউ আহত হয়েছে নাকি?' উদ্বিগ্ন দেখাল সোহেলকে।

'না, ঠিক আহত নয়,' জবাব দিল রানা।

আলবিদার ভাঙাচোরা ডেকে নামল স্ট্রেচার পার্টি। হাত তুলে তাদের বাঙ্করুমটা দেখিয়ে দিল রানা। সাইরেনের মত তীক্ষ্ণ একটা বিরতিহীন চিৎকার ভে আসছে সেদিক থেকে। স্ট্রেচার পার্টির চার্জে রয়েছে একজন পেটি অফিসার, নার্ভ ভঙ্গিতে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে। কথা না বলে হাসল রানা।

লেফটেন্যান্ট-কমান্ডার জানতে চাইলেন, 'লাঞ্চ রেডি করতে বলে দি কেমন? সব মিলিয়ে আপনারা পাঁচজন, তাই না?'

'ছয়,' বলল রানা।

লেফটেন্যান্ট-কমান্ডার ভুরু কোঁচকালেন। 'কিন্তু আপনাদের শেষ রেডি মেসেজে জানিয়েছেন একজনকে পাওয়া যায়নি বা হারিয়েছেন।'

'মানুষ মরে,' জবাব দিল হাসান। 'আবার মানুষ জন্মায়ও।'

বাঙ্করুম থেকে বেরিয়ে এল স্ট্রেচার। ওটার পিছনে শাফিকে দেখা যা স্ট্রেচারে শুয়ে রয়েছে লায়লা, স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। তার বুকে, ক কম্বল দিয়ে জড়ানো, ছোট্ট একটা পোঁটলা। ওই পোঁটলার ভেতর থেকে সাইরেনের আওয়াজ আসছে।

লেফটেন্যান্ট-কমান্ডার একা নয়, সোহেলও কনিং টাওয়ারের রেইলিং আঁকড়ে ধরল। ভদ্রলোক বললেন, 'ও, এতক্ষণে বুঝলাম!'

'সময়ের আগে চলে এল,' ক্ষীণ, সলজ্জ হেসে বলল লায়লা; তবে গ ভাবটুকু গোপন করতে পারল না। 'আশা করি আপনাদের ঝামেলায় ফেললাম না

'কি যে বলেন! আমরা খুশি। খুশি কি, আনন্দে আত্মহারা!'

সুন্দর রঙ করা সাবমেরিনের ডেকে হেঁটে এল ওরা। একজন লেফটেন্যা ওদেরকে ছোট, তবে পরিচ্ছন্ন ওয়ার্ডরুমে নিয়ে এল। সোহেল নিজের হাতে ওদে সবাইকে ধূমায়িত কফি পরিবেশন করল। তারপর রানার হাতে একটুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে বলল, 'বস্ মেসেজ পাঠিয়েছেন।'

চোখ বুজল রানা, কাগজটা ফেরত দিল সোহেলকে। 'তুই পড়।'

সোহেল পড়ল, 'শান্তি মিশন সফল হওয়ায় তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন এই সাবমেরিন লেবাননে ফিরবে না, সরাসরি বঙ্গোপসাগরে চলে আসবে। ঢাকায় ফিরেই রিপোর্ট কোরো। আরও একটা জরুরী অ্যাসাইনমেন্ট। রাহাত খান।'

'কি? আরও একটা...' কথা শেষ করতে পারল না, চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

***